বংশ-পরিচয়

-:*:-

[অষ্টম খণ্ড]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

পৌষ, ১৩৩৫ সাল।

প্রকাশক

প্রজাপতি-সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

২০৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বংশ-পরিচয়

নবম খণ্ড

[যন্ত্রস্থ]

মূল্য ২৲

বাগবাজারের স্বনামধন্য

স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু

মহাশয়ের পুত্র

সমাজ-হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, নীরব কর্ম্মী নানাসদগুণালঙ্কৃত

রায় বিপিনবিহারী বসু মহাশয়ের

করকমলে মৎ সঙ্কলিত

বংশ পরিচয় (অষ্টম খণ্ড)

শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

রায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বংশ-পরিচয়।

অষ্টম খণ্ড

বুদ্ধদেব

২৫৩২ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীর রাজোদ্যানে রাজা শুদ্ধোধনের ঔরসে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুদ্ধোধন ইক্ষ্বাকু বা সূর্য্যবংশ-সম্ভূত ছিলেন। তিনি এই পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখেন। রাজা শুদ্ধোধনের ঔরসে যেদিন সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন প্রকৃতি এমন সুন্দর বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিলেন যে, কপিলাবস্তুর সকলে শিশুর ভাবী জীবনের অবতারত্বের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। যেদিন শিশু জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন ঋষি কলাদেবল রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া শিশুটীকে দর্শন করিতে চান; রাজা শুদ্ধোধন শিশুটীকে দেখাইলে তিনি একবার হাসেন ও কাঁদেন। রাজ শুদ্ধোধন এই হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "এই শিশু ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ লোককে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া আমি হাসিতেছি, আর সেই সময় আমি জীবিত থাকিব না বলিয়া কাঁদিতেছি।" অষ্টম দিনে রাজা শুদ্ধোধন ১০৮ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাটীতে আনিয়া পরম পরিতোষ-সহকারে তাঁহাদিগকে ভোজন করান এবং নবজাত শিশুর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্য বলেন। তাহাতে একশত আটজন ব্রাহ্মণের মধ্যে আটজন ব্রাহ্মণ বলেন যে, এই শিশু যদি সংসারে থাকিয়া প্রজাপালন করেন, তাহা হইলে ইনি "রাজচক্রবর্ত্তী" হইবেন আর

যদি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে "বুদ্ধ" হইয়া সহস্র সহস্র লোককে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা শুদ্ধোধন ব্রাহ্মণদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এরূপ শিশুর জনক হইয়াছেন বলিয়া পরম পুলকিত হইলেন। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পালনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা চলিতে লাগিল। রাজকুমারের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, একটি পাঁচ তলা, একটি সাত তলা এবং একটি নয় তলা। বর্ষাকালে রাজকুমারকে কখনও প্রাসাদের নিম্নতলে আনা হইত না। যশোধারা রাজকুমারের ভাবী পত্নীও ঠিক বুদ্ধদেব যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, সেইদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজকুমারের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন যশোধারার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে স্বয়ম্বর হইয়াছিল, স্বয়ম্বরে সিদ্ধার্থই জয়ী হইয়া যশোধারাকে লাভ করেন। পাছে রাজকুমার বৈরাগ্যবশতঃ সন্ন্যাসী হইয়া যান, এই আশঙ্কায় রাজা শুদ্ধোধন যুবরাজকে কোন সময়ে রাস্তায় বাহির হইতে দিতেন না। যাহাতে কোন জীর্ণ, শীর্ণ, রোগাতুর, বৃদ্ধ, শোকগ্রস্ত লোক রাজকুমারের দৃষ্টিপথে না পড়ে, রাজা শুদ্ধোধন সেইপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই যশোধারাকে লইয়া রাজকুমার সিদ্ধার্থ যাহাতে সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে রত হইয়া প্রাসাদে অবস্থান করেন, রাজা শুদ্ধোধন সেই প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক এমন করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, কোন জীর্ণ মানুষ ত দূরের কথা, কোন প্রকার শুষ্ক পাতাটি পর্য্যন্ত রাজকুমারের দৃষ্টিপথে না পড়ে। এই ভাবে জন্ম হইতে ২৯ বৎসর কাল সিদ্ধার্থকে প্রাসাদের মধ্যে একরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অতঃপর রাজকুমারের নগর-প্রবেশের সময় হইলে রাজা শুদ্ধোধন আদেশ করিলেন যে, নগর যেন এমনভাবে সুসজ্জিত করা হয় যাহাতে কোন মৃত অথবা শীর্ণ লোক তাঁহার নয়ন-পথে না পড়ে। চারিটী

অশ্বের দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ করিয়া রাজকুমার সিদ্ধার্থ নগর-প্রবেশ করিলেন। নাগরিকগণ মহোল্লাসে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল; কিন্তু এই ভীষণ জনতার মধ্যে রাজকুমার একটি বৃদ্ধ লোককে দেখিতে পাইলেন, সেই লোকটি মৃত্যু-যন্ত্রণায় তখন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

সিদ্ধার্থ রথের সারথি চন্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে ঐ যে শ্বেত-কেশ, ন্যুব্জদেহ, জীর্ণকায় লোকটি কে?"

চন্না উত্তর করিল, "এই লোকটি একসময়ে মাতৃ-অঙ্কে শিশু ছিল, যৌবনে খুব বলশালী, আমোদপ্রিয় যুবক ছিল, সে সময়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের যথেষ্ট ভোগও করিয়াছে, লোকটি এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দৈহিক আকার-প্রকার সকলেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তেজস্বী যুবক আজ জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধে পরিণত হইয়াছে।" রাজকুমার জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে! আমাকেও কি ইহার মত জীর্ণ শীর্ণ হইতে হইবে?" চন্না বলিল "হাঁ।" তখন রাজকুমার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সকল মানুষকেই কালক্রমে এইরূপ হইতে হয়।" সিদ্ধার্থ রথ ফিরাইয়া বাড়ীতে আনিতে আদেশ করিলেন এবং পথিমধ্যে আরও দুইটি মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইলেন, একটি রোগগ্রস্ত লোকের সমস্ত দেহ ফুলিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়াছে, আর একটি মৃতদেহকে চারিজন লোকে কাঁদিতে কাঁদিতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর একটি দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, সে দৃশ্যটি হইল এই যে, একজন ভিক্ষু প্রশান্তমনে, উৎফুল্লচিত্তে যাইতেছিলেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে সকল মানুষকেই কি এই প্রকার জরা, ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যুর হাতে নিষ্পেষিত হইতে হয়?" সারথি উত্তর করিল, "হাঁ হইতে হয়। কালের প্রভাব নষ্ট করিবার কাহারও সাধ্য নাই। আজ যে শিশু আছে কাল সে যুবক হইবে, আর আজ যে যুবক কালক্রমে তাহাকে শিথিল-অঙ্গ বৃদ্ধে পরিণত

হইতে হইবেই। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া ঐ গৈরিকধারী ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছে, যদি সে কোনক্রমে সাধনার দ্বারা জন্ম, মৃত্যু জরা ও ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে।" ভিক্ষুর এই প্রশান্ত মূর্ত্তি রাজকুমারের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, যখন প্রাসাদের মধ্যে বাস করিলেও আধি, ব্যাধি, জরা, বার্দ্ধক্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই—যখন এই ললিতলবঙ্গসদৃশ বাহু পুড়িয়াও ছারখার হইবে—যখন এই সুগঠিত দেহ শ্মশান-বিভূতিতে পরিণত হইবে, তখন যে কাজ করিলে মানুষকে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে না হয়, সেই কাজ করাই ভাল। এই সমস্ত ভাবিয়া রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভিক্ষুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। স্থির করিলেন, সেই রাত্রেই তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। রাজকুমার কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, এইসমস্ত বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় রাজা শুদ্ধোধনের একজন দূত আসিয়া জানাইল যে, রাজকুমারী যশোধরার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাজকুমার এই কথা শুনিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "রাহুল!" রাহুল অর্থে প্রতিবন্ধক। দূত আসিয়া রাজাকে বলিল, "রাজকুমারকে পুত্রের জন্মের সংবাদ দিলে রাজকুমার অন্য কোন কথা বলিলেন না, কেবল রাহুল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।" রাজা শুদ্ধোধন রাহুল কথার অর্থ জানিতেন না; তিনি মনে করিলেন, সিদ্ধার্থ বোধ হয় পুত্রটীর নাম "রাহুল" রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, তদনুসারে তিনি পুত্রটির নাম "রাহুল" রাখিলেন।

অতঃপর রাজকুমার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন সুন্দরী কুমারীগণ নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি-সহকারে নৃত্য করিতে করিতে গান করিতে লাগিল। যুবরাজ খট্টাঙ্গে শুইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। অন্যদিন যুবরাজ উৎকর্ণ হইয়া কুমারীদের গান শুনেন, কিন্তু আজ

তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, কাজেই কুমারীরাও গান করিতে করিতে নিদ্রার ভাব আসায় সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। যুবরাজের ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি দেখিলেন, এইসমস্ত কুমারীদের কেহ অর্দ্ধ-উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইতেছে, কেহ মুখ খুলিয়া নিদ্রা যাইতেছে, কেহ দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিতেছে, কেহ বা ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার প্রতীয়মান হইতে লাগিল, যে প্রাসাদ ইন্দ্রের পুরীর ন্যায় ছিল, তাহা যেন শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, আর সেই শ্মশানে যেন সারি সারি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এইসমস্ত দৃশ্য দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, এই মুহূর্ত্তেই এই নরকপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। তবে হাঁ, যাইবার পূর্ব্বে আমার সদ্যোজাত শিশুপুত্রটিকে একবার দেখিয়া যাইব।" এই কথা ভাবিয়া তিনি যশোধরার কক্ষে গেলেন, দেখিলেন -যশোধরা খট্টায় শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পুষ্পশয্যায় তিনি শুইয়া রহিয়াছেন, এখন যদি যশোধরার হাতখানি শিশুর মাথা হইতে নামাই, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জাগিয়া পড়িবেন এবং আমার আর যাওয়া হইবে না। অতএব আমি আজ চলিয়া যাই, বুদ্ধ হইয়া আসিয়া তবে আমি পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিব। ইহা ভাবিয়া তিনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া যেখানে তাঁহার অশ্ব দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আসিয়া অশ্বকে বলিলেন, "কণ্ঠক! আমাকে লইয়া চল।" কণ্ঠক প্রভুর আদেশ পালন করিল। কপিলাবস্তু হইতে রাজকুমার আনোমানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, সেই নদী পার হইয়া তিনি তাঁহার রত্ন-খচিত পোষাক ও অশ্ব কণ্ঠককে চন্নার হাতে প্রদান করিলেন এবং তাহা বাড়ীতে লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি আপন অসি লইয়া মোহন কুন্তলদাম কাটিয়া ফেলিলেন। সেই স্থানে তখন এক ব্যাধ উপস্থিত

হয়, তাহার পরিধানে হলুদ রঙের পোষাক ছিল, যুবরাজ আপন পরিচ্ছদের সহিত সেই ব্যাধের পরিচ্ছদের বিনিময় করেন এবং ব্যাধের কমণ্ডলুটি লইয়া তিনি মগধের রাজগৃহে উপস্থিত হন। এই পথ তিনি পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। রাজগৃহ তখন রাজা বিম্বিসারের রাজ-ধানী। তিনি বাড়ী বাড়ী খাদ্য চাহিলেন, গৃহস্থগণ এই নবীন সন্ন্যাসীর অসামান্য রূপসৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "সূর্য্যদেব নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" কেহ কেহ বা রাজা বিম্বিসারের নিকটে গিয়া বলিল, "আপনার রাজধানীতে এক অপূর্ব্ব সুন্দর সন্ন্যাসী আসিয়াছে, সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে একেবারে মোহিত হইয়া যাইতে হয়, কোটি চন্দ্র যেন তাহার দেহে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।" রাজা এই কথা শুনিয়া এই নবীন সন্ন্যাসীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন, লোকেরা সিদ্ধার্থের পশ্চাদনুসরণ করিয়া পাণ্ডব পর্ব্বতের গুহা পর্য্যন্ত গেল। সে দেখিল, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যে খাবার লইয়াছেন সিদ্ধার্থ সেই গুহায় গিয়া তাহা খাইলেন। রাজার প্রেরিত লোকেরা এইসমস্ত দেখিয়া রাজার নিকট সংবাদ দিল এবং রাজা বিম্বিসার এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। সন্ন্যাসীর রূপলাবণ্যদর্শনে রাজা এতদূর মোহিত হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে রাজগৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং একথাও বলিলেন, "আপনি যদি রাজগৃহে অবস্থান করেন তবে আপনাকে আমি অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব।" বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ বলিলেন, "আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিব—এই আশাতেই হিমালয়ের পাদদেশস্থ কপিলাবস্তু রাজ্য ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি, অতএব আমাকে রাজ্যের প্রলোভন আর দেখাইবেন না, আমি এখন বুদ্ধত্ব-লাভের জন্য বেড়াইব, তার পর বুদ্ধত্ব লাভ করিলে আপনার রাজধানীতে আসিব।"

অতঃপর সিদ্ধার্থ রাজগৃহের পাণ্ডব পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া ঋষি আনর কমল ও উদক রমাপুত্রের সন্ধানে যাইলেন। ইহারা তখন আধ্যাত্মিক সম্পদে সম্পদবান্ মহাঋষি বলিয়া বিখ্যাত। এই ঋষিদের আশ্রমে সিদ্ধার্থ কিছুদিন থাকিয়া তাঁহাদের নিকট যাহা কিছু শিক্ষণীয় ছিল তাহা শিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে উপাসনা করেন, সেরূপ উপাসনায় সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি নিরঞ্জনা নদীর তীরে—উরুবিল্বে যাইলেন। এখানে তিনি ছয় বৎসর কাল কঠোর সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। এখানে তিন জন ভিক্ষুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হইল। এই ভিক্ষুকেরা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, শিষ্যেরা তাঁহার কঠোর তপশ্চর্য্যা পর্য্যবেক্ষণ করিত। সিদ্ধার্থ এই সময়ে মাত্র দৈনিক এক রতি মাত্রায় চাউল খাইতেন, তাহার ফলে যে দেহ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তেজ ও লাবণ্যে ঢল ঢল করিত, সেই দেহ এরূপ শুষ্ক বিশীর্ণ জীর্ণ হইয়া গেল যে, তাঁহার উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইল। একদিন ক্ষুধার তাড়নায় অথবা দৌর্ব্বল্যে যখন তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি শিষ্যগণের বহু অনুরোধে সেই তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, উপবাসাদি করিয়া শরীরকে অযথা কষ্ট দিলে মানুষের মুক্তি হয় না। তাই শারীরিক বলাধানের জন্য তিনি পুনরায় আহার করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন, শরীরে যদি শক্তি, সামর্থ্য ও বল না থাকে, তবে মানুষের মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে আর এক কাণ্ড ঘটিল। সিদ্ধার্থ যে মুহূর্ত্ত হইতে ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার শিষ্য পাঁচ জন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের জ্ঞান হইতে লাগিল এবং বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বদিনে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যেন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনে তিনি এক বটবৃক্ষমূলে

উপবেশন করিলেন। এই সময় গ্রামের প্রধান সেনানীর কন্যা সুজাতা স্বর্ণপাত্রে করিয়া বৃক্ষদেবতাকে দিবার জন্য দুধ আনিতেছিলেন। সুজাতা—বৃক্ষতলে আসিয়া বুদ্ধদেবকে দেখিতে পান এবং আরও দেখিতে পান যে, বুদ্ধের দেহ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে আর সেই জ্যোতিঃতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে। সুজাতা মনে করিল, বুঝি তাহার দুধ পান করিবার জন্য বৃক্ষদেবতা স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সুজাতার সন্দের দূর করিবার মানসে বলিলেন যে, তিনি দেবতা নহেন, তিনি একজন মানুষ; জীবনের চরম ও পরম সুখের অনুসন্ধানেই তিনি তথায় আসিয়াছেন। সুজাতা সিদ্ধার্থের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া যে দুগ্ধ তিনি বৃক্ষদেবতার জন্য আনিয়াছিলেন, সেই দুগ্ধ সিদ্ধার্থকে দিলেন। সিদ্ধার্থ তাহা স্নানান্তে পান করিলেন। তার পর সারাদিন সন্নিহিত শালবনে অতিবাহিত করিয়া যথায় বোধিবৃক্ষ ছিল সিদ্ধার্থ তথায় আসিলেন। পূর্ব্বদিকে মুখ রাখিয়া তিনি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি আমার দেহ শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া এই বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকে, সেও ভাল, তথাপি আমি যতদিন না বুদ্ধত্ব লাভ না করিতে পারি, ততদিন উঠিব না।।

সেই বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া সাধনা-পথ হইতে চ্যুত করিবার জন্য কামরাজ্যের মার তথায় আগমন করিলেন। মার সিদ্ধার্থের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "সিদ্ধার্থ ঐস্থান হইতে উঠ, ঐস্থানে উপবেশন করা তোমার সাজে না, আমার সাজে।" সিদ্ধার্থও অমনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি জগতের হিতের জন্য কোন কিছু এ পর্য্যন্ত কর নাই। জ্ঞানলাভ জন্য কোন দিন চেষ্টাও কর নাই, অতএব এস্থান তোমার উপযুক্ত নহে, এস্থান আমার পক্ষে উপযোগী।" মার কোন ক্রমেই

সিদ্ধার্থকে পরাজিত করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল এবং সিদ্ধার্থ কাম-জয়ী হইলেন। তখন স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা সেই বোধিদ্রুমতলে আসিয়া সিদ্ধার্থের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর সিদ্ধার্থ সেই বোধিদ্রুমতলে সাত দিন অবস্থান করিলেন, দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি সেই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এক-দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, তৃতীয় সপ্তাহে তিনি গভীর চিন্তা করিতে করিতে এধার-ওধার যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন এবং চতুর্থ সপ্তাহে তিনি সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তিনি অশ্বত্থবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "কি হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?" পঞ্চম সপ্তাহ তিনি মুচালিন্দ-বৃক্ষতলে এবং ষষ্ঠ সপ্তাহ রাজ্যতন বৃক্ষতলে অতিবাহিত করিলেন। এখানে তাপুসা ও ভাল্লুকা নামক দুইজন ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সপ্তম সপ্তাহে যখন তিনি বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণের অনুরোধ-রক্ষায় স্বীকৃত হন।

এতদুদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব নিরঞ্জনা নদীর তীর হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত পদব্রজে আইসেন। তাঁহার পূর্ব্বতন পাঁচ জন শিষ্য যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে অন্নগ্রহণ করিতে দেখিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, তাঁহারা প্রথমে তাঁহাকে তেমন যত্নের সহিত গ্রহণ করিল না, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাঁহার দেহে দিব্যদ্যুতি বিস্তার হইতেছে, তখন তাহারা বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি-সংবাদে আর কোন সন্দেহ না করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিল। বুদ্ধ পরদিন সেই পাঁচজনকে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ প্রথম শুনাইলেন। তিনি চারিটী সত্য বাণী বলিয়া আরও চারিজনকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর সেই শিষ্যগণকে

লইয়া তিনি নদীর তীরে গেলেন। তখন যাক্ষ নামে একজন ধনী জমিদার কাশীতে ছিল, সে নদীর অপর পারে গৌতম বুদ্ধকে দেখিয়া এপার হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "শ্রমণ, আমাকে কে যেন মারিয়াছে।" গৌতমবুদ্ধ উত্তর করিলেন, "তুমি এপারে এস, আর কেহ তোমাকে মারিবে না।" যাক্ষ জুতা রাখিয়া স্বচ্ছন্দে সেই নদী হাঁটিয়া পার হইয়া বুদ্ধের নিকট গেলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে দান, দক্ষিণা, প্রেম প্রভৃতির বাণী শুনাইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। অতঃপর যাক্ষের পিতা পুত্রকে খুঁজিতে খুঁজিতে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকেও বুদ্ধ স্বধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। পিতা-পুত্রে বুদ্ধের উপাসক হইলেন। পর দিন ইঁহাদের বাটীতে ফল-মূলাদি খাইতে গেলে যাক্ষের মাতা ও স্ত্রী উভয়েই বৌদ্ধমতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপাসিকা হইলেন। যাক্ষের পূর্ণ, বিমলা, চম্পটী ও সুবাহু নামে চারিজন বন্ধুও বৌদ্ধমতবাদ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কাশীধামের পঞ্চাশ জন যুবক বৌদ্ধধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিল। তথা হইতে বুদ্ধ সেনানী গ্রামে গিয়া ৬০ জন যুবককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তিনি কপিলাবস্তুর দেব নামক একজন ধনী ব্রাহ্মণকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, তাঁহার স্ত্রীও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই ব্রাহ্মণ-দম্পতী সেনানী গ্রামে আসিয়াছিল। অতঃপর বুদ্ধ উরুবিল্বে গিয়া নন্দা ও নন্দবালা নাম্নী দুইটি বালিকাকে আপন ধর্ম্মমতে আনিলেন। তার পর বুদ্ধ ভাবিলেন, যদি তিনি মগধে গিয়া উরুবিল্বে কাশ্যপকে (জটিলাকে) স্বধর্ম্মে আনিতেন পারেন, তবেই তাঁহার শ্রম সার্থক হয়। কাশ্যপের বয়স তখন ১২০ বৎসর এবং তাঁহার ৫০০ শিষ্য ছিল। তিনি ও তাঁহার দুই ভাই সেই সময়ে ৭৫০ শিষ্য লইয়া নিরঞ্জনা নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রথমে কাশ্যপ কোন মতেই বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী হইতে চাহেন নাই, পরে তিনি বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতা-দর্শনে সশিষ্য বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রাজা বিম্বিসারের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহে গেলেন। রাজা বিম্বিসার যখন দেখিলেন, "কাশ্যপ" পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের মতবাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছে, তখন তিনিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজগৃহের সীতাবনে অবস্থানকালে শ্রাবস্তীর সুদত্ত নামে এক বণিক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এইভাবে বহু লোককে আপন ধর্ম্মে দীক্ষা দান করিতে করিতে এবং ভিক্ষা করিতে করিতে বুদ্ধ অতঃপর কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে ভিক্ষা করিতে আসেন। যশোধরা ইহা দেখিয়া স্বামীর পথাবলম্বিনী হন।

শ্রাবস্তীর কতকগুলি বণিক ঝড়-তুফানের জন্য বিপথে চালিত হইয়া সিংহলদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন। সিংহল-রাজকন্যা রত্নাবলী তাঁহাদের মুখে গৌতম বুদ্ধের কথা শুনিয়া সেই বণিকদের দ্বারা একখানি চিঠি বুদ্ধদেবকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধদেব সেই চিঠি পাইয়া এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের জন্য রত্নাবলীর প্রবল আগ্রহ দেখিয়া আপনার একখানি প্রতিকৃতি সেই বণিকদের দ্বারা সিংহলে রত্নাবলীর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তাহার উপর, "উঠ, জাগ, নূতন জীবন আরম্ভ কর'," এই কথা লিখিয়া দেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কপিলাবস্তুর আনন্দ, প্রজাপতির পুত্র, দেবদত্ত, উপালি, অনুরুদ্ধ প্রভৃতি অনেকেই বুদ্ধের শরণ লইয়াছিল। বুদ্ধদেব যে সময় কপিলাবস্তুতে উপস্থিত হন, তখন রাহুলের বয়স মাত্র ৭ বৎসর। যশোধরা রাহুলকে তখন ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ যে লোকটি প্রাসাদের নিকট খাদ্য চাহিতেছে দেখিতেছ, ঐ লোকটি হইল তোমার পিতা"। রাহুল তাহা শুনিয়া পিতার নিকট গেল এবং "বাবা" বলিয়া ডাক দিল। পিতার মৃত্যুকালে বুদ্ধ পিতার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন। প্রথমে প্রজাপতি প্রথম ভিক্ষুণী হন। বুদ্ধের সঙ্ঘের ৫ শতের অধিক ভিক্ষুণী হইয়াছিল। বুদ্ধ জগৎকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

(১) মানুষ একাই দোষ করে, কষ্টভোগ করে, একাই পবিত্র হয় আবার একাই অপবিত্র হয়।

(২) মানুষ যাহা পরকে উপদেশ দিবার সময় মুখে বলে, যদি সে কাজে তাহা করে, তবে তাহার কথার ফল হয়।

(৩) যে ব্যক্তি যুদ্ধে হাজার হাজার লোককে জয় লাভ করে, সে ব্যক্তি বিজেতা নহে, যে নিজেকে জয় করিতে পারে, সেই প্রকৃত পক্ষে বিজেতা।

(৪) যাহারা মুর্খ তাহারাই মনে করে যে, এ কাজ আমি করিয়াছি।

(৫) মন্দ কাজ করা অতি সহজ, কিন্তু যে কাজ ভাল ও সৎ তাহা করা তত সহজ নহে।

(৬) এই দেহ দু'দিন পূর্ব্বেই হউক অথবা পরেই হউক নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, অতএব এমন সব কাজ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য যাহার ফলে মনের মধ্যে সচ্চিন্তার উদয় হয় এবং সচ্চিন্তা লইয়া যাওয়া যায়।

(৭) যাহারা অসত্যের মধ্যে সত্যকে কল্পনা করে তাহারা কখনও সত্যে উপস্থিত হইতে পারে না।

(৮) ঘরের চালে ছিদ্র থাকিলে সমস্ত ঘরেই বৃষ্টির জল পড়ে, সেইরূপ মনের ভিতর কামক্রোধাদি ইন্দ্রিয়নিচয় থাকিলে তাহারা মনের সমস্ত সাধু সঙ্কল্পকে ভাসাইয়া দেয়।

(৯) যাহারা কূপ খনন করে, তাহারা জলকে যেদিকে ইচ্ছা লইতে পারে, সূত্রধরেরা কাষ্ঠখণ্ডকে যথেচ্ছ নোয়াইতে পারে, যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা নিন্দাতেও কুপিত হন না কিংবা প্রশংসাতেও আত্মহারা হন না।

(১০) যদি কোন লোক মন্দ অভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার মনে দুঃখ আসিবেই আসিবে। ঘোড়ায়

গাড়ী টানিলে তাহার চাকা যেমন ঘুরিয়া ফিরিয়া চলে, সদসৎ কার্য্যের ফলাফলও তেমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে।

(১১) মন্দ কাজ অসমাপ্ত রাখাও ভাল, কারণ এই মন্দ কার্য্যের জন্য পরে তোমার অনুতাপ আসিবেই আসিবে।

(১২) যে মূর্খ আপনার মূর্খতা বুঝিতে পারে সে জ্ঞানী, কিন্তু যে মূর্খ আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করে, তাহার চেয়ে মূর্খ আর জগতে নাই।

(১৩) পাপীর নিকট পাপকার্য্য বড়ই আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হয়। যতদিন পাপের ফল না দেখা যায় ততদিন সে পাপকার্য্যকে আমোদজনক বলিয়া মনে করে, কিন্তু ফল পাকিলে সে বুঝিতে পারে যে, ইহার চেয়ে পাপকার্য্য আর নাই।

(১৪) যাহাতে আমোদ হয় এমন কোনও কাজের দিকে নিজের মন নিবিষ্ট করিও না।

(১৫) প্রেমের দ্বারা অপরের ক্রোধকে নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা কর।

(১৬ স্বর্ণকার যেমন একটু একটু করিয়া সোণার খাদ নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা একটু একটু করিয়া আপনার মনের অপবিত্রতা দূর করিতে চেষ্টা করেন।

(১৭) যে জাগিয়া ঘুমায় তাহার রাত্রি আর প্রভাত হইতে চাহে না, যে ক্লান্ত তাহার নিকট আধ ক্রোশ খুব দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; যাহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না, সে সমস্ত লোকের দীর্ঘ জীবনেরও কোন মূল্য নাই।

(১৮) যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, কাহাকেও কষ্ট না দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে বাস করাই ভাল।

এক সময়ে বুদ্ধদেব কোশল দিয়া যাইবার সময়ে মানসক্রীত নামক

এক ব্রাহ্মণ পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই জন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিলেন। ব্রাহ্মণদের একজনের নাম বশিষ্ঠ এবং আর এক জনের নাম ভরদ্বাজ। বশিষ্ঠ বুদ্ধদেবকে বলিলেন, "সত্যপথ লইয়া আমাদের দুইজনের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে। আমি বলিতেছি, সেই পথই সত্য—যাহা ব্রহ্মের সহিত সংযোগ করিয়া দেয় এবং আমার বন্ধু বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ তরুক্ষ যে পথ সত্য বলিয়াছেন সেই পথই সত্য। এখন আপনি এ বিষয়ের বিচার করুন।"

বুদ্ধদেব বলিলেন, "তোমরা কি মনে কর যে, সকল পথই সত্য ?"

তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ গৌতম, আমরা মনে করি সকল পথই সত্য।"

গৌতম—"আচ্ছা আমাকে এমন কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নাম বলিতে পার যিনি ব্রহ্মকে মুখোমুখি দেখিয়াছেন ?" ব্রাহ্মণদ্বয় বলিলেন—"না।"

গৌতম বলিলেন, "তাহা হইলে কোন বেদশিক্ষক ব্রাহ্মণ অথবা বেদ-রচয়িতা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাকে মুখোমুখি দেখেন নাই ?"

যুবকদ্বয় বলিলেন—"না।"

তখন গৌতমবুদ্ধ বলিলেন, "কোন একটা চৌরাস্তায় একটি প্রাসাদে উঠিবার জন্য একখানা মই রাখা হইলে লোকে জিজ্ঞাসা করে, প্রাসাদ কোথায়, কোন মুখো ইত্যাদি; লোকটি বলে, আমি জানি না। তখন লোকে কি সেই লোকটিকে মূর্খ বলে না ?"

যুবকদ্বয় বলিলেন—"হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।" তখন গৌতম বলিলেন, "তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরাও বলিবেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত কোথায় কি ভাবে মিলন হয় জানেন না। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যে ব্রহ্মের সহিত মিলনের পথ দেখাইতে পারিবেন, ইহাও অসম্ভব। দেখ তোমাদিগকে যদি এই নদীটি পার হইতে হয়, তাহা হইলে নদীর অপর তীরকে ডাকিলে কিংবা তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে উহা কি তোমাদের নিকট আসিবে ?"

গৌতম ইত্যাকার অনেক উপদেশ দিবার পর সেই দুইজন যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর বুদ্ধদেব নালন্দায় গিয়া তথা হইতে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে গেলেন। তথায় এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

(১) এই পৃথিবীর সর্ব্বদা চঞ্চল ও ব্যস্ততাময় অবস্থা যত দুঃখের কারণ। মনের শান্তি ও সন্তোষ বিধান কর, জগতে অল্পেও শান্তি পাইবে।

(২) কে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে?—ঈশ্বর।

(৩) যে দাতা তাহাকে সকলেই ভালবাসে।

(৪) যে দাতা, মুক্তি তাহার অনিবার্য্য।

(৫) কখনও চাটুকারের মিষ্ট কথায় ভুলিও না।

(৬) যখন বৃক্ষ অগ্নিতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে, তখন পক্ষিসকল তাহার মাথায় বসিতে পারে না। কাজেই যেখানে ইন্দ্রিয়গণ জাগরুক, সেখানে কখনও সত্য থাকিতে পারে না।

(৭) যে নিজের মুক্তির জন্য শুধু চেষ্টা করে, সে কিছুই পায় না।

বুদ্ধদেব-প্রচারিত ধর্ম্ম অতি সহজ, সরল, সর্ব্বসাধারণের বরেণ্য ও উপাসনার যোগ্য ধর্ম্ম। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। তাঁহার ধর্ম্মের প্রভাবে একদিন সমগ্র এশিয়াখণ্ড দীক্ষিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যখন ভিক্ষুণীদের অত্যাচার-অনাচার আরম্ভ হইল, তখনই এই ধর্ম্মের পতন হইতে আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বেদের কোন প্রভেদ নাই। বেদ বলেন, মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি; বৌদ্ধধর্ম্মও তাহাই বলেন। অশোক যে দ্বাদশটি বৌদ্ধবাণী শিলালিপিতে অথবা গিরিগাত্রে খোদিত করিয়াছিলেন সেগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে আবিষ্কৃত

হইয়াছে। অশোকের আদেশ ছিল এই যে, তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র মানুষ ও প্রাণীদিগের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, বৃক্ষ রোপণ, কূপ খনন, মানুষ ও পশু উভয়েয় ব্যবহারের জন্যই সমভাবে করিতে হইবে। পিতামাতাকে শ্রদ্ধা, বন্ধুদিগকে ভালবাসা, পশুদিগের প্রতি কৃপা, অমিতব্যয়ী না হওয়া, এই সমস্ত ছিল অশোকের উপদেশ-বাণীর সার মর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও এই ধর্ম্ম আরও পরিণত হইয়াছে। যদিও ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের কোন সংশ্রব ছিল না, তথাপি চীনদেশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২১৭ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন প্রথমে চীন-সীমান্তে গিয়া পৌছে। চীনের সম্রাট্ মিংতী খ্রীঃ পূঃ ৬১ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্যাক্‌স্‌মূলার বলেন—With Alexander we have entered on a new period in the history of the world, a period marked by the first strong reaction of the west against the east, inaugurated in the fifth century B. C. by the victories of Marathan, Thermopoly and Salarmis, which were almost contemporary with the first victories of Buddha. But while the victories of Miltiades, Leonidas and Alexander the Great belong to history only, Buddha the Jina or victor as he is called, is still the ruler of the majority of mankind."

বৌদ্ধধর্ম্ম যে আবার ভারতের—শুধু ভারতের নহে, পরন্তু সমগ্র এশিয়াখণ্ডের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইবে, বৌদ্ধধর্ম্ম যে আবার পূর্ব্বগরিমা লইয়া ভারত-বক্ষে উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান হইবে, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে। ভারতের নানা স্থানে যে

সমস্ত অঞ্চলের ভূগর্ভ হইতে প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দিরাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অনেকগুলি বুদ্ধদেবের। কলিকাতায় 'বৌদ্ধ চৈত্যবিহার' নামে কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড মনোহর বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথা হইতে "মহাবোধী" নামক ইংরাজী মাসিক পত্র এবং নানাবিধ বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি রেভারেণ্ড অঙ্গারিকা ধর্ম্মপালের চেষ্টায় লণ্ডন সহরে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আসক্ত নহেন, কিন্তু হিন্দুমাত্রই যে বুদ্ধদেবকে দশাবতারের অন্যতম অবতার বলিয়া পূজা করেন এবং বৌদ্ধদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করেন, একথা বলা বাহুল্য। আজ কলিকাতার এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ও শুদ্ধি-আন্দোলনের দিনে বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের দেশের পক্ষে কত যে প্রয়োজনীয় তাহা কে বুঝিবে? বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের জন্য নানা রূপ চেষ্টা হইতেছে। সারনাথে যেখানে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তথায় একটি বিহার ও সেই সঙ্গে একটি বিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের বৌদ্ধেরা কয়েকটি নগরের বৌদ্ধমন্দিরের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। মালা-বারের বৌদ্ধ মিশনও যে উত্তরোত্তর উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের হাতে রাখিবার প্রস্তাব হইতেছে। প্রতি বৎসর মহা সমারোহের সহিত বুদ্ধদেবের বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্ম আজ আচরণীয় ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত না হইলেও প্রত্যেক হিন্দুই ইহার সারভাগ ও উপদেশ পালন করিয়া থাকেন।

চৌগ্রাম-রাজবংশ

নবাবী আমলে উত্তর বঙ্গে যে সকল পরাক্রান্ত জমিদারবংশ স্থানে স্থানে স্বাধীন বা অর্দ্ধ স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়া সমাজে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একটাকিয়া রাজবংশ সুপ্রসিদ্ধ।

কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণের বংশধর সুবিখ্যাত পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ ও কেশব খাঁ গৌড় বাদসাহের দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া যে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার বার্ষিক নামমাত্র কর এক টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ঐ জমিদারবংশ একটাকিয়া রাজবংশ বলিয়া পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী তাহিরপুরের অমরকীর্ত্তি রাজা কংস-নারায়ণের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জগদানন্দ রায় রাজা কংসনারায়ণের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। জগদানন্দের প্রপৌত্র শ্যাম রায়ের দুই পুত্র—পাঁচু রায় ও ভুবন রায়। পাঁচু রায়ের বংশধরগণ চৌগ্রামের রাজবংশ ও ভুবন রায়ের বংশধরগণ বর্ত্তমান তাহিরপুরের রাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাঁচু রায়ের পুত্র রসিক রায়। রসিক রায়ের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত পৈত্রিক জমিদারীর উত্তরাধি-কারী হয়েন; কনিষ্ঠ পুত্র নাটোরের মহারাজা রামজীবনের পোষ্যপুত্র মহারাজা রামকান্তরূপে পরিচিত।

এই কুলীন রায়বংশের প্রাচীন নিবাস ছিল তাহিরপুরের পূর্ব্ব রাজধানী রামরামার অদূরবর্ত্তী সরখতিয়া গ্রামে। এখনও ঐ গ্রামে রাজবাটীর কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যাম রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচু রায় সরখতিয়া পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান চৌগ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ

শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়।

করেন এবং চৌগ্রামে পরিখাদি খনন করিয়া সুরক্ষিত রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে চৌগ্রাম খুব সমৃদ্ধশালী স্থান ছিল। সম্ভবতঃ নিজ জমিদারী মধ্যে এইস্থানে বহু ব্রাহ্মণ ও ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতি থাকায় পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সরখতিয়া গ্রাম এখনও চৌগ্রাম জমিদারীর অন্তর্গত। শ্যাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ভুবন রায়ের বংশধরগণ পরে তাহিরপুর রাজ্য লাভ করেন। ভুবন রায়ের বংশের অপর এক শাখা মৈনমের রায়বংশ।

সুতরাং একই বংশের দুই শাখা এক্ষণে চৌগ্রাম ও তাহিরপুর রাজবংশ।

রসিক রায়ের পুত্র কৃষ্ণকান্ত ও রামকান্ত। এই রামকান্ত নাটোরের মহারাজা রামকান্ত। কৃষ্ণকান্ত রায় নাটোর হইতে ইসলামাবাদ পরগণা লাভ করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি চৌগ্রাম জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন।

সুবুদ্ধি খাঁ ও কেশব খাঁর প্রতিষ্ঠিত একটাকিয়া রাজবংশ সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ বংশের শেষ রাজা রূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত নাটোরের মহারাজা রামজীবনের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে রামজীবনের প্রতি দৈববাণী হয়,—'যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হইবে কিন্তু একটাকিয়া বংশ নাটোরে রাজত্ব করিবে।' সেইজন্য মহারাজা রাম-জীবন তাঁহার পুত্র কালীকুমার রায়ের মৃত্যুর পর (১৭২৪ খৃঃ) একটাকিয়া বংশের সন্তানের সন্ধান করেন এবং নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে চৌগ্রামে রসিক রায়ের দুই সন্তান আছে জানিতে পারিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন কিন্তু কুলনাশভয়ে রসিককান্ত রায় দত্তক দিতে অস্বীকৃত হন, কারণ একটাকিয়া বংশ নিরাবিল কুলীন ও নাটোর বংশ শ্রোত্রিয়। শেষে কূটনীতি-বিশারদ দয়ারাম রায়ের চেষ্টায় একটাকিয়ার সন্তান রামকান্ত রামজীবনের পোষ্য গৃহীত হইলেও বিহিত যজ্ঞাদি হয় নাই, সেই জন্যই

চৌগ্রাম রাজবংশ অদ্যাপি নিরাবিল কুলীন রহিয়াছেন এবং মহারাজ রামজীবনকে দানপত্র দ্বারা মহারাজা রামকান্তকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে হইয়াছিল। রসিককান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌগ্রামে বাস করিতেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইনি সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, অনেক পণ্ডিত ইঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন।

কৃষ্ণকান্তের পর তাঁহার পুত্র রুদ্রকান্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি অতিশয় বিচক্ষণ ও বিদ্বান্ ছিলেন। তৎকালে চৌগ্রামে গভর্ণমেণ্টের মুন্‌সেফী আদালত ছিল এবং রুদ্রকান্ত বিচক্ষণতার সহিত বহুকাল বিচারকের কার্য্য করিয়াছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় রুদ্রকান্তের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী কালীময়ী দেবী রাজসাহী—খাজুরা-নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত লাহিড়ীর পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই দত্তকপুত্র রোহিণীকান্ত রায় নামে পরিচিত।

রোহিণীকান্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন, মাতা কালীময়ী দেবীর সহিত তাঁহার অনেক মামলা-মকর্দ্দমাও হইয়াছিল।

রোহিণীকান্ত চৌগ্রামে গঙ্গাপূজা ও জন্মাষ্টমী উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন।

রোহিণীকান্তের তিন বিবাহ। ১২৭৯ সালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তৎপর ১২৮৪ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নী চন্দ্রমণি দেবী রাজসাহী—পাটুল নিবাসী ৺কৃপানাথ মৈত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই চৌগ্রামের বর্ত্তমান স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়।

রমণীকান্তের নাবালকত্ব-কালে সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। ১২৯২ সালে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্পত্তি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণপ্রসাদ লাহিড়ীর কন্যা সিন্ধুবালার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিন্ধুবালার গর্ভজাত তিনটি পুত্রই অকালে পরলোক গমন করেন, সিন্ধুবালাও স্বর্গগতা হন। তৎপর

দীর্ঘকাল পরে রমণীকান্ত দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া দ্বিতীয়া পত্নী ব্রজবালা ১৩২১ সালে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

রমণীকান্ত বাঙ্গালার জমিদারগণের আদর্শস্থল। জনসাধারণ ইঁহাকে রাজা সম্বোধন করেন। উত্তরবঙ্গের জমিদারগণের মধ্যে তিনিই প্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে রমণীকান্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, বিশেষতঃ স্বদেশবাসীকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ-প্রদর্শনে তাঁহার বদান্যতা অতুলনীয়। তিনি বহু শিল্প-ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং বহু যৌথ ব্যবসায়ে ডিরেক্টরের আসন অলঙ্কৃত করেন। সম্প্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন-কার্য্যেও রমণীকান্তের যথেষ্ট ত্যাগ-স্বীকার ও স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ইনি শিক্ষা-বিস্তার-উদ্দেশ্যে চৌগ্রামে হাই স্কুল স্থাপন করিয়া ঐ অঞ্চলের ছাত্রগণের অশেষ উপকার করিয়াছেন, চৌগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ও রমণীকান্তের অন্যতম কীর্ত্তি।

রমণীকান্তের আর এক বিশেষ গুণ—তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতা। ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র সকলের পক্ষেই তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত, সততই তিনি সকলের সহিত সদালাপ করিয়া থাকেন। সকলেই তাঁহার নিরহঙ্কার বিনয়-ভদ্রতায় মুগ্ধ। রমণীকান্ত কখনও বিলাসব্যসনে সময় বা অর্থ অপব্যয় করেন নাই, নিপুণতার সহিত বিষয়-সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ফলে নিজ জমিদারীর অভাবনীয় উন্নতি সাধন করিয়াছেন। বরিশাল, যশোহর প্রভৃতি জেলায় নূতন নূতন জমিদারী ক্রয় করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কলিকাতায় প্রাসাদোপম বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেও রমণীকান্ত দেশের প্রতি অণুমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে স্বয়ং বিষয়-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া

সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রাজেশকান্তের হস্তে সম্পত্তি-পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয় জনসমাজে কুমার আখ্যায় অভিহিত।

রাজেশকান্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিন বৎসর নানা স্থানে থাকিয়া স্বাস্থ্য লাভ করেন। এক্ষণে সুস্থদেহে বিষয়-কার্য্য পরিচালনায় ব্রতী হইয়াছেন। পিতার ন্যায় ইনিও দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে বিশেষ আগ্রহশীল এবং নানা দেশহিতকর কার্য্যে অবসরকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। অনেক সময়েই ইনি স্বগ্রামে অবস্থিতি করিয়া পল্লীর উন্নতি-বিধানে যত্নবান থাকেন। ইঁহার চেষ্টায় চৌগ্রামের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। চৌগ্রাম হাই স্কুল স্থাপনে ইঁহার যথেষ্ট শিক্ষানুরাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। *প্রজাগণের সুখ-দুঃখের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়া সম্পত্তি-পরিচালনে* ইনি যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। বিনয় সৌজন্য অবিলাসিতা ও সামাজিকতাগুণে ইনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

রাজেশকান্ত ময়মনসিংহ কালীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী সুধাময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

মধ্যম শ্রীমান্ রবীন্দ্রকান্ত বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়াছেন। নলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ লাহিড়ী-বংশের শ্রীমতী শান্তিলতা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

রমণীকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রমেন্দ্রকান্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। শিক্ষার প্রতি ইঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুপ্রভার সহিত বলিহারের কুমার বিমলেন্দু রায় বি-এ মহোদয়ের বিবাহ হইয়াছে, মধ্যমা শ্রীমতী মতিপ্রভার সহিত

রঙ্গপুর-নলডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস লাহিড়ী, বি-এর বিবাহ হইয়াছে।

চৌগ্রামের রাজপরিবারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধারে বিরাজমানা বলা যায়। প্রাচীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশগুলির মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। এই বংশের সামাজিক গৌরব ও প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত।

চৌগ্রামের ন্যায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বৃহৎ জমিদারীর অধিকারিগণ জনসমাজে রাজা নামে পরিচিত।

চৌগ্রাম রাজবংশ-তালিকা

পাঁচু রায় ভুবন রায়

পাঁচু রায়
রসিক রায়
কৃষ্ণকান্ত
রামকান্ত
(নাটোরের মহারাজা
কান্ত)
রুদ্রকান্ত
রোহিণীকান্ত
রমণীকান্ত
রাজেশকান্ত
রবীন্দ্রকান্ত
রমেন্দ্রকান্ত
ভুবন রায়
হরগোবিন্দ
আনন্দীরাম
বিনোদরাম
রাজা বীরেশ্বর
(তাহিরপুর রাজবংশ
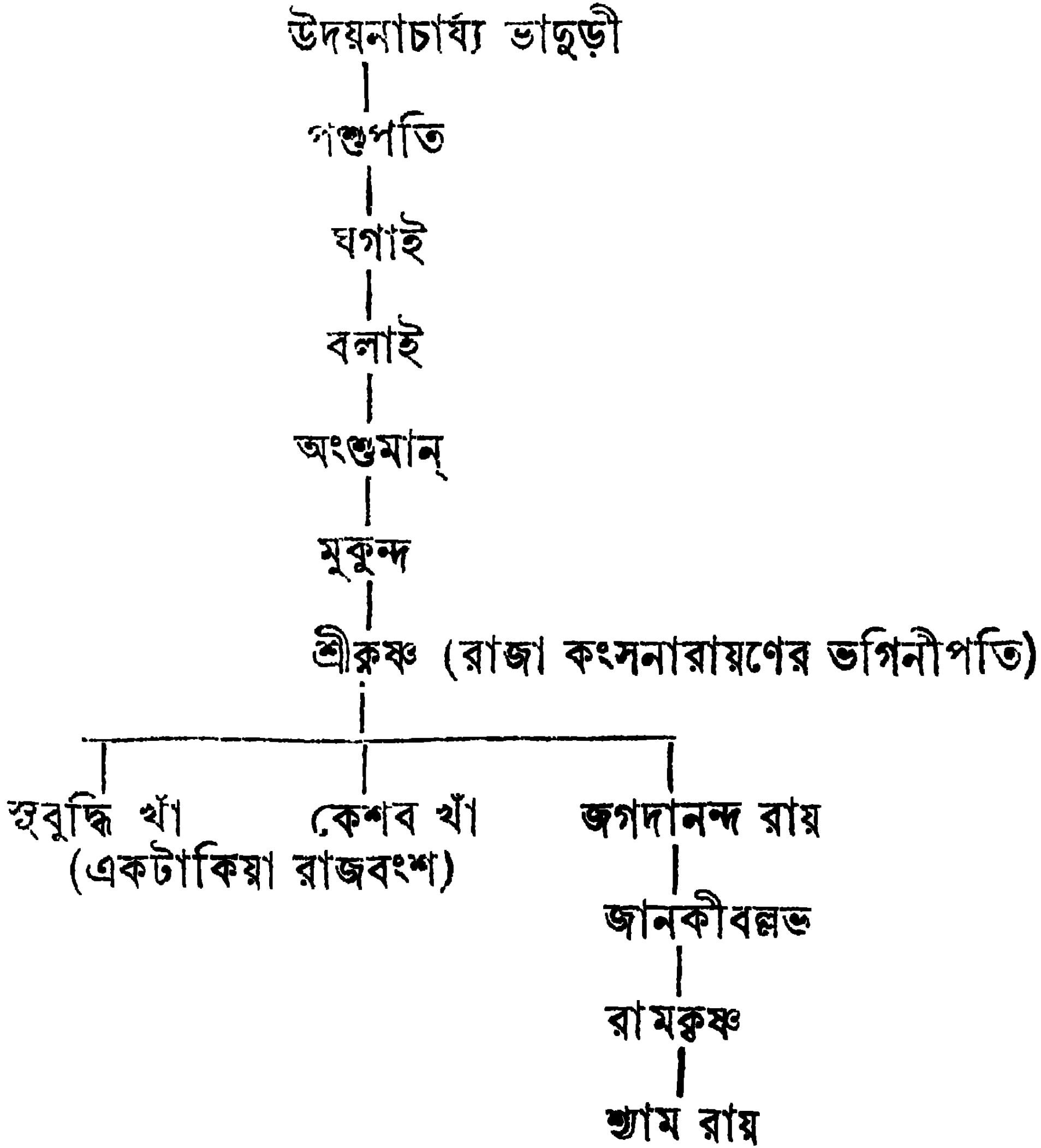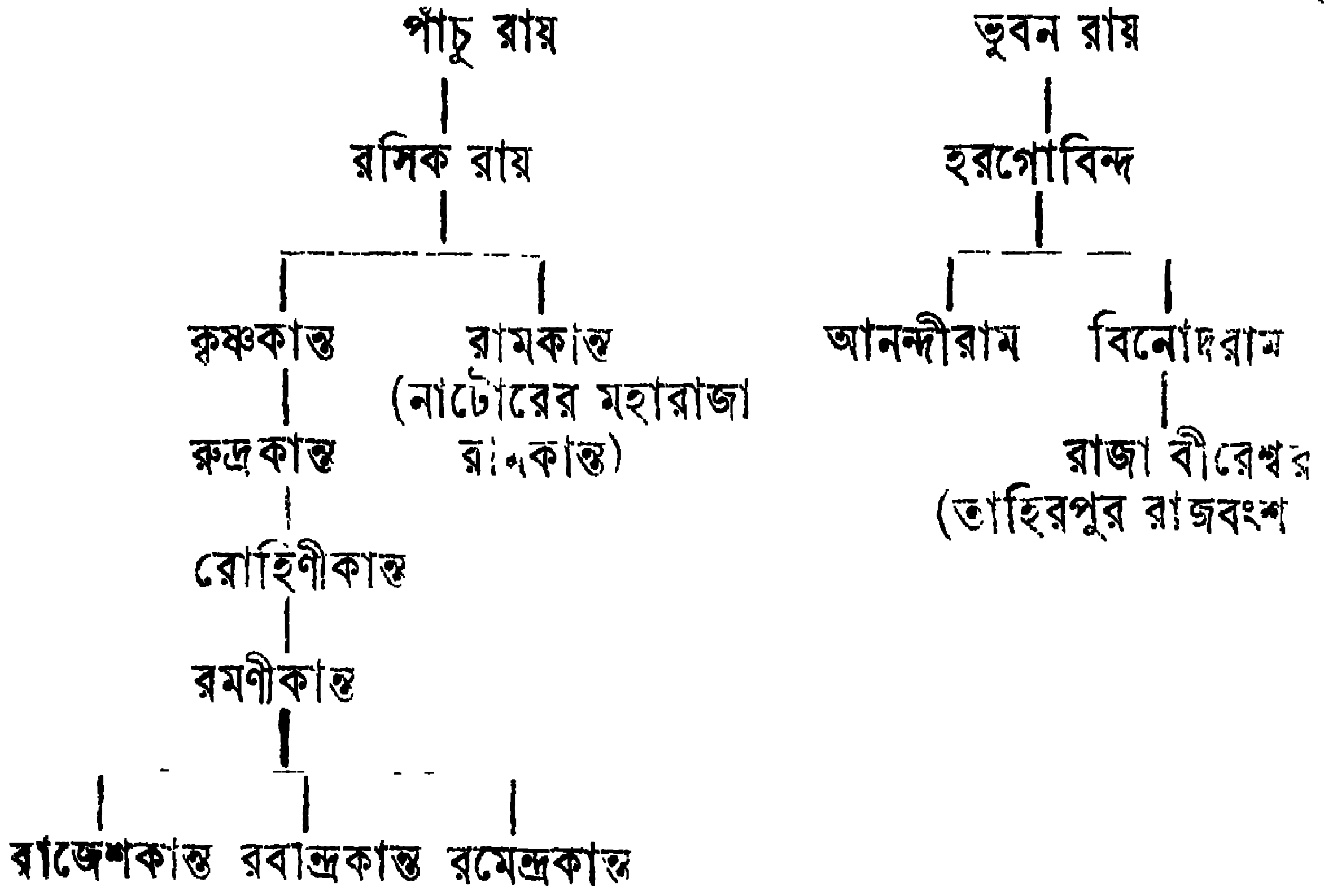
রায় বাহাদুর কালীপদ সরকার

কালীপদ সরকার মহাশয়দিগের আদিবাস—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত গোপালনগর গ্রামে। এই গ্রামটী পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কায়স্থকুলতিলক ৺বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার মহাশয় কালীপদের পিতামহ। ইনি বর্দ্ধমান জেলার সোণামুখীর জঙ্গল-বিভাগের দারোগা ছিলেন। ইনি একজন ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। ইনি প্রত্যহ হোমার্চ্চনাদি না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এমন কোন পূজার্চ্চনা ছিল না যাহা ভক্তি-ভরে সম্পন্ন না করিতেন। ইনি দীন-দুঃখীর অভাব-মোচনে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

বৃন্দাবনচন্দ্রের পাঁচ পুত্র। প্রথম বেণীমাধব, দ্বিতীয় জয়নারায়ণ, তৃতীয় হারাধন, চতুর্থ রামনারায়ণ ও পঞ্চম জগৎনারায়ণ।

বেণীমাধব বিশেষ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই। দ্বিতীয় জয়নারায়ণে মহাপুরুষ বৃন্দাবনচন্দ্রের চরিত্রের পূর্ব্বাভাস বিকশিত হইয়াছিল। ইনি ছোটনাগপুর বিভাগের হাজারিবাগ জেলার আবগারী বিভাগের ইনি-স্পেক্টর ছিলেন। ইহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর ইহাকে উক্ত জিলায় শ্রীরামপুর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ ষ্টেটের ম্যানেজারী পদও দেন। এই উভয় কার্য্য জয়নারায়ণ বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। কিন্তু উভয় কার্য্য একত্র ন্যায়-পরায়ণতার সহিত সম্পাদন করিতে তাঁহাকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহাকে পেন্সন গ্রহণ করিতে হয়। জয়নারায়ণ অতি অমায়িক লোক ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ জপ ও পূজার্চ্চনা করিতেন।

আবার তাহার পুণ্যের সংসারে মূর্ত্তিমতী স্নেহময়ী ৺সৌদামিনী দাসীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। সপত্নীক সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তাঁহার তিনটী অনুজ হারাধন, রামনারায়ণ ও জগৎনারায়ণকে উচ্চ শিক্ষা দিয়া প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলেন।

হারাধন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিজ কর্ম্মদক্ষতায় হাজারিবাগের ডেপুটী কমিশনারের সেরেস্তাদার-পদে উন্নীত হন।

রামনারায়ণও সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিজ কর্ম্মকুশলতায় সব জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বকনিষ্ঠ জগৎনারায়ণও ফার্ষ্ট গ্রেডের মুন্সেফ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

জয়নারায়ণের পত্নী ৺সৌদামিনী দেবরগণকে সন্তানবৎ স্নেহ-যত্ন ও আদর করিয়া লালনপালন করেন। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বেণীমাধব উচ্চ শিক্ষা পান নাই; এজন্য জয়নারায়ণ নিজে ও তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী তাঁহার অনুজগণও তাঁহাদের স্ব স্ব পৈতৃক সম্পত্তির অংশ বেণীমাধবকে ছাড়িয়া দিয়া অদ্ভুত ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ৬২ বৎসর বয়সে সতী সাধ্বী সৌদামিনী পুত্রের কোলে স্বামীর সম্মুখে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমর ধামে গমন করেন। জয়নারায়ণ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তাঁহার জাগতিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

এই জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র রায় বাহাদুর কালীপদ। কালীপদ সন ১২৭০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি হাজারিবাগ অন্তর্গত পথম্বার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। পরে বি-এল্ পাশ করিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখে বর্দ্ধমান জেলা-আদালতে

ওকালতী আরম্ভ করেন। তথা হইতে কিছুদিন মানভূম রঘুনাথপুর কোর্টে যান। কিন্তু যাঁহার অস্থিমজ্জা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হাজারিবাগে গঠিত ও পুষ্ট তাঁহার অন্যত্র ভাল লাগিবে কেন? ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইনি হাজারিবাগ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। অল্পদিন মধ্যেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিভাগেই ইঁহার বিজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং বেশ একজন নামজাদা আইনজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন। ইনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের ভকিল এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে পাটনা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট হন। ইনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় মিউনিসিপালটীর মেম্বর হন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান-পদে দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালন করেন। ইনি স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের মেম্বর হন ও পরে ভাইস্-চেয়ারম্যান থাকিয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইনি অত্রস্থ কৃষি-প্রদর্শনীর একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ইনি সেণ্ট্রাল জেলের পরিদর্শক; পাটনা বেঙ্গলি সেটলার্স এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট; স্থানীয় সেণ্ট কলাম্বস কলেজের ও জিলা স্কুলের গভার্ণিং বডির মেম্বর; ডিষ্ট্রীক্ট বয়স্কাউট্ এসোসিয়েসনের মেম্বর; হাজারিবাগ বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট, স্থানীয় গার্লস এম-ই, স্কুলের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট এবং বেঙ্গলি বয়েজ স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। এক কথায়, ইনি হাজারিবাগের স্তম্ভস্বরূপ। এখানে সাধারণ-হিতকর এমন কোন কার্য্যই নাই যাহাতে ইঁহার উদ্যোগ বা অর্থসাহায্য না আছে। স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, দেবালয়, বাজার, শ্মশান সর্ব্বত্রই ইঁহার নিপুণ হস্ত বিদ্যমান। ইহা ব্যতীত ইনি অনেক দুঃস্থ পরিবারের প্রতিপালক।

ইনি সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং সকলেরই প্রিয়। রাজপুরুষগণেরও ইঁহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস।

Mr Leister যখন হাজারিবাগের ডেপুটী কমিশনার তখন বকরিদ

উপলক্ষে এখানে হাঙ্গামার সূচনা হইয়াছিল। সে সময় ইনি রাজপুরুষগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে এবং নিজ প্রতিপত্তিতে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে সময় স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল সে সময় শান্তিময় হাজারিবাগের 'গীতা সমিতি' স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃক সন্দিগ্ধ ভাবে দৃষ্ট হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কতকগুলি গৃহ অনুসন্ধান করিবার জন্য পুলিশ অনুমতি প্রার্থনা করেন। Mr. C. A. Radice তখন এখানকার ডেপুটী কমিশনর। ইনি সে সময় ডেপুটী কমিশনর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "এখানে গৃহ-অনুসন্ধানের হুকুমের কোন আবশ্যকতা নাই। এখানে কোন অশান্তি হইবে না, যদি হয় তজ্জন্য আমি দায়ী।" ইঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল তাই পুলিশের প্রার্থিত হুকুম জারী হয় নাই, নচেৎ কত ভদ্রপরিবারকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতে হইত।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ ইঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে বিভূষিত করেন। এই উপলক্ষে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর রাঁচী সহরে যে দরবার হয় সে সময় সনন্দ-দানকালে মহিমান্বিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুর যে বক্তৃতা করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"You are a leading criminal lawyer in Hazaribagh and a member of one of the oldest domiciled Bengali families in the district. You hold a long record of service on the Hazaribagh Municipality and District Board. Having been Vice-Chairman of the former for many years and Chairman for 4 years, you have never hesitated to oppose forces of disloyalty and have rendered most excellent service to the state."

রায় বাহাদুর ইংরেজী ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেহার লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বর মনোনীত হন।

রায় বাহাদুর তাঁহার পিতামহের ন্যায় তান্ত্রিক, ইনিও দৈনিক পূজার্চ্চনাদি না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। ইনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি পাঠে ও আলাপে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তান্ত্রিক হইলেও ইহার মত উদার। এখানে শ্যাম-শ্যামার ও হরিহরের মধুর মিলন দেখা যায়।

রায় বাহাদুরের দাম্পত্য জীবন অতি মধুময়। পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইহার বিবাহ হয়। ধানোয়ার ষ্টেটের ম্যানেজার বর্দ্ধমান জেলার গুইরগ্রামের ৺ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের সর্ব্ব-কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চপলাসুন্দরী দাসীকে ইনি পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন।

ইহাদের পুত্র কন্যা ১৫টীর মধ্যে ৬টীর অকাল মৃত্যু হয়, অবশিষ্ট-গুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রথম পুত্র শ্রীসত্যেন্দ্রপদ সরকার, ইহার জন্ম ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসে। ইহার বিবাহ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের Legal advisor শ্রীযুক্ত ননীলাল ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কনকনলিনী সরকারের সহিত হয়। ইহাদের দুই পুত্র ও চারি কন্যা। ইনি অভ্রের ব্যবসায়ী। সত্যেন্দ্র বাবুর পুত্র-কন্যাগণের পরিচয় এই—

(ক) জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরবালা বসু। কলিকাতা সহরের রায় সাহেব হারাধন বসুর পুত্র কলিকাতার Electrical Engineer শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ বসুর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে।

(খ) শ্রীমান্ শ্যামাপদ সরকার, জন্ম ১৩১৭ সালের ১লা আশ্বিন।

(গ) শ্রীমতী সতীবালা বসু। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার Mr. H. D. Bose মহাশয়ের পুত্র কলিকাতা এলেনবারি কোম্পানির সেলসম্যান শ্রীমান্ মোহিতকুমার বসুর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে।

(ঘ) শ্রীমতী সরযূবালা

(ঙ) শ্রীমতী স্মৃতিরেখা

(চ) শ্রীমান্ তারাপদ সরকার।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীঅমরেন্দ্রপদ সরকার। ইঁহার জন্ম ১২৯৫ সালের ১লা অগ্রহায়ণ। ইঁহার বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার জুগলে-নিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নীহারবালা সরকারের সহিত হয়। ইনিও অভ্রের ব্যবসায়ী।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অতুসীকুসুম সরকার। ইঁহার বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার ইন্দেশগ্রাম-নিবাসী প্রথম Assistant Surgeon ৺নটবর সরকারের পুত্র হাজারিবাগের উকীল শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র সরকারের সহিত হয়।

তৃতীয় পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রপদ সরকার (ওরফে বাবু)। ইঁহার জন্ম ১৩০২ সালের ৪ঠা আষাঢ়। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র মহাশয়ের ভাগিনেয়ী সিমরাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শোভনার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি হাজারিবাগ কোর্টে ওকালতী করেন।

চতুর্থ পুত্র শ্রীখগেন্দ্রপদ সরকার। জন্ম ১৩০৫ সালের ১২ই ভাদ্র। ইনি হাজারিবাগের উকীল।

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বনলতা নন্দী। বাঁকুড়ার উকীল ৺হৃদয়চন্দ্র নন্দীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র নন্দীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জমিদারী তত্ত্বাবধান করেন।

তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী তরুলতা ঘোষ। বাঁকুড়ার রামসাগরগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত টিকেন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি চাত্‌রা কোর্টে ওকালতী করেন।

চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী উমারাণী ঘোষ। পাটনার খ্যাতনামা উকীল

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ষষ্ঠ পুত্র পাটনা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

পঞ্চমা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী বসু। কৃষ্ণনগর-নিবাসী ৺যদুনাথ বসু মহাশয়ের পুত্র মালদহের উকীল শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভায়া

পাবনা জিলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমায় যোগনালা গ্রামের প্রসিদ্ধ ভায়া জমিদার-বংশে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভায়ার জন্ম। ইঁহারা বৈদ্য কাউগুপ্ত। গুপ্ত ইঁহাদের জাতীয় উপাধি। ভায়া নবাবি খেতাব। ইঁহাদের জনৈক পূর্ব্ব-পুরুষ মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের পারিষদ ছিলেন। নবাব বাহাদুর একটী কঠিন কার্য্য উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে নিয়োগ করেন। তাঁহারা সকলেই বিফল-মনোরথ হইলে নবাব বাহাদুর তাঁহার পারিষদ ভায়া-বংশের ঐ পূর্ব্ব-পুরুষকে অনুরোধ করেন। তিনি সফলকাম হইয়া আসিলে নবাব পুলকিত হইয়া তাঁহাকে "আও ভায়া" বলিয়া সম্ভাষণ করেন ও তৎপর নবাব বাহাদুরের দরবারে তাঁহাকে ভায়া আখ্যা দেওয়া হয়। তদবধি ভায়া আখ্যাটী এই বংশে উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভায়ার পিতা ৺উমাকান্ত ভায়া ও তাঁহার মাতা স্বর্গীয়া দ্রবময়ী গুপ্তা উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, সহৃদয় এবং লোকপ্রিয় ছিলেন। সে সময়ে পাবনা বিভিন্ন জিলা ছিল না, রাজসাহী জিলার অন্তর্গত ছিল। তখন ৺উমাকান্ত ভায়া তাঁহার গ্রাম ছাড়িয়া রাজ-সাহীতে ওকালতি করেন। ঐ সময়ে আদালতসমূহে পার্শিভাষা প্রচলিত ছিল, উমাকান্তই প্রথম ইংরাজিনবিশ উকীল এবং সরকারী উকীল-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিশেষ যশ ও সুখ্যাতির সহিত কার্য্য পরিচালন করিয়া তিনি ১৮৮০ সালে অবসর গ্রহণ করেন ও ১৮৯৪ সালে যোগ-নালা গ্রামে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদিগের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ চতুর্থ। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ভায়া আদালতে সেরেস্তাদারি কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত তারাকান্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, তৃতীয় ৺বিজয়-গোবিন্দ স্কুলের ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেকটরী কার্য্য করিতে করিতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন ; চতুর্থ স্বরেন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম উপেন্দ্র মজঃফরপুরে ডাক্তারি করিতেছেন। তাঁহার ভাগিনেয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাক্তার স্ববোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কলিকাতা মহানগরীতে প্রসিদ্ধ দন্ত-চিকিৎসক এবং তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিজাগোবিন্দ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। স্বরেন্দ্রনাথ শৈশবে বড় রুগ্ন ছিলেন এবং তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাশায়ী হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ৩।৪ মাস পূর্ব্বে দৈনিক ৪ ঘণ্টা পড়িতে পারিবেন—এই সর্ত্তে ডাক্তারদের নিকট পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসর শয্যাশায়ী থাকিয়া পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হন। তার পর এফ্-এ এবং বি-এ পাশ করিয়া বি-এল্ উপাধি লইয়া ইংরাজী ১৯০০ সালে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৯৪ সালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় সুতরাং তিনি ওকালতি আরম্ভ করিয়া তাঁহার পিতার কোনই সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায় ও নিপুণতায় ওকালতির প্রথম অবস্থাতেই তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন এবং কালে যে তিনি প্রধান স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে না।

ওকালতি আরম্ভ করার পরেই তাঁহাকে বিশেষ কয়েকটী শোক পাইতে হয়। ১৯০৩ সালে তাঁহার মাতা দ্রবময়ী গুপ্তা পরলোক গমন করেন। স্বরেন্দ্রনাথ বড়ই মাতৃভক্ত ছিলেন, তিনি শিক্ষকতা করিবার কালে এবং ওকালতি ব্যবসায় করিতে করিতেও তাঁহার মাতাকে প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। তাঁহার মাতা শেষ জীবনে

রোগে জীর্ণ হইয়া পড়েন, কিন্তু তিনি পুত্রবধূদের রন্ধন করা দ্রব্য খাইতেন না। একদিন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর আচার্য্য বলেন, "আপনারা পাঁচ ভাই মাকে তুটা রাঁধিয়া দিতে পারেন না?" অপর ভ্রাতারা এ কথায় মনোযোগ না দিলেও সুরেন্দ্রনাথ তদবধি মাতার মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর ১৩০৪ সালে সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগ হয়। একমাস দশদিনের একটী কন্যা ও আড়াই বৎসরের একটী কন্যা রাখিয়া ভাগ্যবতী বিরাজমোহিনী সতীলোকে প্রস্থান করেন। সুরেন্দ্র স্ত্রীর শোকে এত অধীর হইয়া পড়েন যে, ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আড়াই বৎসরের শিশু কন্যাকে বুকে লইয়া বৎসরের পর বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। এত তিতিক্ষা উপস্থিত হয় যে, ২।৩ বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইয়া তৎপর আর ওকালতি ব্যবসা করিবেন না বলিয়া চাকুরী গ্রহণ করেন।

কিন্তু তাঁহার দ্বারা ভগবান অনেক কার্য্য আদায় করিবেন, সুতরাং তাঁহাকে চাকুরীতে থাকিতে দিবেন কেন? কাজেই চাকুরী ছাড়িয়া পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে ওকালতি আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই তাঁহার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি বিপত্নীক জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার পুত্রসন্তান নাই। দুইটী কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন। তিনি কন্যাদ্বয়ের বিবাহ মহাসমারোহের সহিত দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পুষ্পমালার বিবাহ রাজসাহী জিলার মাধবপুর-নিবাসী জমীদার শ্রীবরদাগোবিন্দ সেনের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ যতীশগোবিন্দ সেনের সহিত এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অশ্রুমালার বিবাহ যশোহর জিলার ইত্না গ্রামের শ্রীমান্ অনুকূলচন্দ্র সেন গুপ্তের সহিত দেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা

বিলাতের ইতিহাসের ডাক্তার হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ডিষ্টিক্ট ইন্‌স্পেক্টর-পদ লইয়া Bengal Educational Serviceএ কর্ম্ম করিতেছেন। দ্বিতীয় জামাতা অনুকূল প্রতিষ্ঠার সহিত ডাক্তারি পরীক্ষা পাশ করিয়া মধ্য প্রদেশে সরংগড় স্বাধীন রাজার প্রধান চিকিৎসকের পদে কার্য্য করিতেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া তাঁহার পিতার ন্যায় সরকারি উকীলের পদ লাভ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পারিবারিক সুখ-শান্তি সম্বন্ধে বড়ই দুর্ভাগ্য। গত ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসের ৩১শে তারিখে সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা যাঁহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন সেই পুষ্পমালা একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার পর সুরেন্দ্রনাথ আর ব্যবসায় করিবেন না কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিদায় লইয়া ৺পুরীধামে চলিয়া যান। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে কি হয়, ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। ভগবান তাঁহাকে কর্ম্মে লিপ্ত রাখিবেনই এবং তাঁহার দ্বারা তাঁহার নিজের বলিতে কেহ না থাকিলেও তাঁহার বিশাল পরিবার প্রতিপালন করাইবেনই। তাই তিনি পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় অবস্থানকালে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তার পান যে, পাবনায় যে সমস্ত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়াছে সরকার পক্ষে তাহার পরিচালনের ভার তাঁহাকে লইতে হইবে। ঐ তার পাইয়া তিনি আর রাজসাহীতে না আসিয়া পাবনায় চলিয়া যান এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। পাবনায় কার্য্যকালে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হয়। কিন্তু নির্ভীকভাবে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহার ফলে পাবনায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। তিনি হিন্দু বলিয়া খাতের করেন নাই বা মুশলমান বলিয়া আক্রোশ দেখান নাই। তিনি একমাত্র কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার কর্ম্ম করিয়াছেন। তজ্জন্য হিন্দুরাও তাঁহার প্রতি সাময়িক

অসন্তুষ্ট ছিল এবং মুসলমানরাও তদ্রূপ। কিন্তু উভয় পক্ষই বুঝিয়াছে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই এবং দেশের কল্যাণই করিয়াছেন।

পাবনায় অবস্থানকালে প্রথমা কন্যা-বিয়োগের ৯মাস পরে ১৯২৬ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অশ্রুমালাকে হারাইয়াছেন। তাঁহার জীবনে এক্ষণে আর কোন কার্য্য নাই, তিনি আত্মীয় প্রতিপালন করিতেছেন মাত্র।

ব্যবসায়ে সুরেন্দ্রনাথ যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সাধারণ কার্য্যেও তিনি তদপেক্ষা কম পটুতা দেখান নাই। তিনি রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান উভয় কার্য্যই করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যকালে অনেক উন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ এখনও পূর্ণ উদ্যমে স্বীয় ব্যবসায় এবং সাধারণ হিতকর কার্য্য চালাইতেছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ অন্যতম। বাঙ্গালা ১২৬৮ সালে (ইংরাজী ১৮৬২ খ্রীঃ) তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী সিকরা কুলীন গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল রাখালচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার পিতার নাম ৺আনন্দমোহন ঘোষ। ব্রহ্মানন্দের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলেই তাৎকালিক বঙ্গসমাজে বিশেষ বিখ্যাত লোক ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার পিতার প্রথমা পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন জমিদার ছিলেন; কিন্তু আভিজাত্যের অহমিকা কখনও তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ধনী হইলেও অমায়িক, প্রকৃতি-রঞ্জন, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবান্ এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের বয়স যখন মাত্র ৫ বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন; কিন্তু তাঁহার বিমাতা এরূপ সতীলক্ষ্মী মহিলা ছিলেন যে, মাতৃহারা ব্রহ্মানন্দকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার স্নেহে ব্রহ্মানন্দ একদিনের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি মাতৃহারা। গ্রাম্য স্কুলে পড়া শেষ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নই তাঁহার শেষ ইংরাজী শিক্ষা। তাঁহার বয়স যখন উনবিংশতি বৎসর, তখন কোন্নগরের ডাক্তার ভুবনমোহন মিত্রের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। এই সময়ে একদিন ব্রহ্মানন্দ শ্বাশুড়ী, শালাজ প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে যান এবং ঠাকুরকে দেখিয়া তিনি প্রাণের মধ্যে একটি অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

কথিত আছে, ব্রহ্মানন্দ পরমহংস দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে প্রায়ই দেখিতে পাইতেন যেন মা জগদম্বা একটি ছেলেকে প্রায়ই তাঁহার ক্রোড়ে আনিয়া দিয়া বলিতেন, "এইটি তোর ছেলে।" ব্রহ্মানন্দকে প্রথম দর্শন করিয়াই পরমহংসদেব বুঝিতে পারিলেন যে, যে ছেলেটিকে জগজ্জননী তাঁহার ক্রোড়ে দিয়াছিলেন, এই ছেলেটিই সেই। তিনি একথা তাঁহার শিষ্যদিগকে পরে বলিয়াছিলেন, "দেখ যে ছেলেটীকে জগদম্বা আমার কোলে তুলিয়া দিতেন, এই রাখালই সেই ছেলে।"

রাখাল কিছুদিন পরে সংসারাশ্রম পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, তখন তাঁহার পিতা ও শ্বাশুড়ী যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইতেন। ক্রমে এই অসন্তোষের ভাব দূরীভূত হয়। এমন কি, ব্রহ্মানন্দের শ্বাশুড়ী তাঁহার কন্যাকে পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট লইয়া আসিতে আরম্ভ করেন। পরমহংসদেব অনেক সময় ব্রহ্মানন্দকে বলিতেন, "আমি ত অনেক দিন এখানে আসিয়াছি, তোর আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?" ব্রহ্মানন্দ নতমুখে ঠাকুরের কথা শুনিতেন, কোন জবাব দিতেন না। ব্রহ্মানন্দ তখন বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামকৃষ্ণ তাই ব্রহ্মানন্দকে সম্মুখে রাখিয়া সমাধিস্থ হইতেন। সমাধি-অবস্থায় তিনি ব্রহ্মানন্দকে অনেক কথা বলিতেন। তিনি প্রায়ই শিষ্যদের বলিতেন, "দেখ রাখালের এখন জ্ঞান ও অজ্ঞান বোধ হইয়াছে, এখন আর উহাকে ভাঙ্গিবার উপায় নাই। আমি বলি কি, রাখাল তুই এখন ঘরে যা, ঘরে গিয়া অবস্থান কর, মাঝে মাঝে এখানে এলেই যথেষ্ট।" কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের সব কথায় কান দিলেও একথায় কান দিলেন না। রাখালের স্ত্রীর বয়স ১৪ বৎসর। তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শ্বাশুড়ী পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রাখালকে

কোন্নগরে ফিরিয়া যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাখাল তাহা শুনিলেন না। ব্রহ্মানন্দের মনপ্রাণ ঠাকুরের চরণে বসিয়া গিয়াছিল।

ঠাকুরের সহিত একত্র অবস্থানের প্রায় তিন বৎসর পরে ব্রহ্মানন্দ স্বামী অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত বলরাম বসুর সহিত শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। ঠাকুর জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন, "রাখাল আমার বোকা ছেলে, কিছুই বুঝে না। কৃপা করিয়া ইহাকে সুস্থ শরীরে আমার কাছে পৌছাইয়া দেও।" মা জগদম্বা ঠাকুরের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন, ঠাকুরের মানস-পুত্র রাখাল সুস্থদেহে ঠাকুরের কোলে ফিরিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ"অতি উপাদেয় গ্রন্থ। Words of the Master—Selected Precepts of Sri Ramkrishna নামে তাহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। ৫ম বর্ষের "উদ্বোধন" পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দমহারাজ "গুরু" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন "গুরু শিষ্য উভয়েই বিশেষ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। একই গুরুর শিষ্যগণের মধ্যে যে তারতম্যের সৃষ্টি হয়, তাহা শিষ্যের যোগ্যতানুসারেই হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে গুরুভক্তি নাই বলিয়া আর তেমন শিষ্য তৈয়ারী হয় না। কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিলে তাঁহার কথা বেদবাক্যবৎ পালন করিবে, তবেই ত জীবনটা সুনিয়ন্ত্রিত (Disciplined) হইবে এবং শিষ্যের জীবনে গুরুর প্রভাব পড়িবে। গুরুভক্তি যদি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, তবে ভগবানে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা বলিয়া যে বস্তু আছে তাহা লোপ পাইবে।"

১৩২৯ সালের ৯ই বৈশাখ বেলুড়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে ব্রহ্মানন্দ

স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ একটি বিশেষ পূজা ও ভোগ হইয়াছিল। ঐ দিন প্রায় দুই সহস্র শিষ্য প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

১৩২৮ সালের ২৭শে চৈত্র ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। পরদিন সুপ্রসিদ্ধ 'আনন্দ বাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়—"জননী জন্মভূমির ছিন্নাঞ্চল হইতে আজ যে কি উজ্জ্বল নীলমণিটি খসিয়া পড়িল—স্থূলবুদ্ধি প্রাকৃতজন আমরা, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সিদ্ধ সাধক-জীবন লইয়া দেশের যে কত বড় একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ ছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা শোক-তাপ-ক্লিষ্ট হৃদয় হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে ক্ষণকাল বসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন।"

আমেরিকা-গমনের পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজকে বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বভার প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণপণ সাধনায় আজ অগণ্য রামকৃষ্ণ-মঠ স্থাপিত হইয়াছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেলুড় মঠে অসংখ্য মুক্তিকামী যুবককে প্রতি বৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষা দিতেন। তাঁহারাই পরে তাঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা লইত। এত কর্ম্মের ভিতর থাকিয়াও ব্রহ্মানন্দ সাধন ও তপস্যায় অবিচলিত ছিলেন।

স্বর্গীয় ডাক্তার রায় দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

ডাক্তার রায় দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের দৌহিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ রায় মহাশয় যখন পরলোক গমন করেন তখন দেবেন্দ্রনাথ অষ্টমবর্ষীয় বালকমাত্র। জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর তাঁহাকে পিতার অবর্ত্তমানে লালন-পালন করিতে থাকেন। যদুনাথ কৃষ্ণনগরের মধ্যে এবং বঙ্গদেশে একজন বিশিষ্ট, গণ্য-মান্য ও পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষদমনকল্পে তিনি স্ব-ইচ্ছায় যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সেই নিষ্কাম কর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন। বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺কেশবচন্দ্র সেন, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ডাক্তার) স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় মহামনা মনস্বী ব্যক্তিগণ রায় বাহাদুরের কৃষ্ণনগরস্থ বাটীতে যাইয়া প্রায়ই অবস্থান করিতেন। এই সমস্ত মহচ্চরিত্র মহানুভবকে দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের বাল্য হৃদয়ে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইবার একটী বাসনা জাগিয়া উঠিত। তিনি নানাপ্রকার প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া এই দেশবরেণ্য সন্তানগণের নিকট হইতে যতই নানা কথা শুনিতেন ততই উচ্চ হইবার একটা প্রবল স্পৃহা তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। তিনি যে পরবর্ত্তী জীবনে একজন সদাশয়, দয়ার্দ্রহৃদয়, পরোপকারী, দরিদ্রবৎসল এবং আর্ত্ত ও দুঃখীর বন্ধু হইবেন ইহার লক্ষণ বাল্যকালেই তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি গরীবের কুটীরে

দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ছাত্রজীবন—কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে কিছুকাল পড়িবার পর ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় আনাইয়া কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত স্কুলকে বর্ত্তমানে হেয়ার স্কুল বলে। ঐ স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন।

কলেজে দেবেন্দ্রনাথ—প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সহপাঠী ৺লালমোহন ঘোষের সহিত ইংলণ্ডে যাইবার সমস্ত আয়োজন করিলে যেদিন লণ্ডন অভিমুখে জাহাজ ছাড়িবে তাহার পূর্ব্ব রাত্রে খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহোদর রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে কিছুতেই লণ্ডনে যাইতে দিলেন না। কাজেই লণ্ডনে যাইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে পোষাক-পরিচ্ছদাদি কিনিয়াছিলেন তাহা অল্পদিন পরেই অন্যতম সহপাঠী ও আকারে সদৃশ এবং সহৃদয় বন্ধুবর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লণ্ডন-যাত্রা-কালে আবশ্যক হওয়ায় লইয়া যান। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথের যেন অনেক দুঃখের হ্রাস হয় এবং উভয়ে অনেক সময় বলিতেন "We have started life together, perhaps we close together" এবং ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উভয়ের এক দিনেই জীবনলীলা শেষ হয়।

মেডিকেল কলেজে দেবেন্দ্রনাথ—বিলাত যাইতে না পারিয়া দেবেন্দ্রনাথ বড়ই মনঃকষ্ট পাইলেন। তাঁহাকে আর কোনও মতে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠান গেল না। তিনি অবশেষে মেডিকেল কলেজে যাইয়া পড়িতে লাগিলেন। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে অল্প সময় মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপকগণ মুগ্ধ হইলেন, আবার তাঁহার সরলতা ও হীন অবস্থার ছাত্রবৃন্দকে সাহায্য করিতে ব্যাকুলতা দেখিয়া সহপাঠীরাও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ যেমন হৃষ্ট-পুষ্ট তেমনি দীর্ঘাকার পুরুষ ছিলেন; কাজেই কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাকে "মানুষ পাহাড়" (The man mountain) বলিত। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হন।

কর্ম্মজীবন—মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর দেবেন্দ্রনাথকে নদীয়ার মহারাজ তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি সরকারী চাকুরীই গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরীতে যোগদান করিবার কয়েক মাস পরেই তিনি বর্দ্ধমানের এপেডেমিক ডাক্তারখানার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের জল-বায়ুতে তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ না থাকায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজপুতানা, দিল্লী, আলওয়ার, আগ্রা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এই সমস্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের প্রণষ্ট স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসে।

মান্দ্রাজে—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তথায় ডাক্তারের প্রয়োজন হয় এবং বহিঃপ্রদেশ হইতে ডাক্তার লইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। বঙ্গদেশ হইতে কোনও ডাক্তার মান্দ্রাজে যাইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। তৎকালীন সার্জ্জন-জেনারেল সাহেব ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথের সহিত মান্দ্রাজের অবস্থা ও ডাক্তারের বিশেষ অভাবের বিষয় আলোচনা করেন। তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে মান্দ্রাজে সমুদ্রপথে যাইতে হইত। সমুদ্রপথে যাত্রা করিলে তখন সমাজে পতিত হইয়া থাকিতে হইত; কাজেই সে সময়ে

বড় একটা কেহ সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিত না। দেবেন্দ্রনাথ পরদুঃখকাতর ও দরিদ্রবৎসল ছিলেন। দয়াবান্ পিতার এই মহৎ গুণটুকু তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কাজেই তিনি সমাজের কোন ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য না করিয়া দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের সেবার জন্য স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়া উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল ফেনিল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মান্দ্রাজে উপনীত হইলেন। গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে চাকরী উপলক্ষে যাইতে আদৌ বাধ্য ছিলেন না। রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা ব্যতীত তাঁহার উপর দৈনিক ৪ হাজার লোকের একটী অন্নশালার তত্ত্বাবধায়কের ভার অর্পিত হয়। মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের জন্য অসাধারণ ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া ও তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দর্শন করিয়া তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয় তাঁহাকে অর্পণ করেন। ইহাও কথিত আছে, লর্ড লিটন একদিন প্রাতে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগকে দেখিতে যান এবং ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথের (Camp) ক্যাম্পে যাইয়া তাঁহাকে অপরিচিত ব্যক্তিভাবে তিনি যখন রোগীদিগকে দেখিতেছেন সেই সময় লর্ড লিটনের এক রোগীকে দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাতে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ কহেন, তিনি অতি দুঃখিত যে, প্রথম তাঁহার ক্যাম্পের রোগীদের সকলকে না দেখিয়া তিনি বাহিরের রোগী দেখিতে যাইতে পারিবেন না ও সেইসকল রোগী দেখিতে প্রায় বেলা ২টা পর্য্যন্ত সময় লাগিবে এবং তাহার পর বাহিরের ঐ রোগীর আবশ্যকতা হইলে ও সংবাদ দিলে তিনি ক্যাম্প হইতে বরাবর তখনই যাইবেন।

ভারতীয় মেডিকেল বিভাগের সার্জ্জন-জেনারেল ডাক্তার জে, এফ,

বিট্সন তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর লিখেন—

"Your frank, unconditional, manly acceptance of duty in the famine districts of Madras impressed me most favourably" অর্থাৎ আপনি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট জেলায় বিনাসর্ত্তে অকপট এবং মানবোচিতভাবে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ ও তাহা সুন্দররূপে সমাধা করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে গভর্ণমেণ্ট নিয়মানুসারে বাধ্য ছিলেন না।

ব্রহ্মদেশে—মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর ডাক্তার রায়কে ব্রহ্মদেশের সিভিল সার্জ্জন করিয়া পাঠান হয়,তথায় দুই বৎসর যোগ্যতার সহিত কাজ করিবার পর তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে আহূত হন। ব্রহ্মদেশে তিনি কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ব্রহ্মের তদানন্তীন চীফ কমিশনারের মন্তব্য-পাঠে জানা যায়। চীফ কমিশনার লিখিতেছেন—

"Dr. Devendranath Roy has been Civil Surgeon of Tavoy District for 2 years and has gained the confidence of the Burmese as well as the English more completely and more quickly than any other Bengali Asst. Surgeon I have met. We are sorry to lose him...He, though a stranger to the language and people, had gained the confidence and regard of the famine sufferers aud relief officers in a remarkable way.

অর্থাৎ ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় টেভয় জেলায় দুইবৎসর যাবৎ সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। এখানকার ব্রহ্মবাসী ও ইংরেজের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এত সত্বর এত পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধালাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ছাড়িতে হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। যদিও তিনি ব্রহ্মদেশের ভাষা জানিতেন না এবং

এদেশবাসীর নিকট অপরিচিত ছিলেন, তথাপি তিনি যেভাবে দুর্ভিক্ষ ও রোগক্লিষ্টদের সেবা করিয়াছেন তাহাতে তিনি এ জেলার সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে ঃ—ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ কিছুকাল শিবপুর কলেজে মেডিকেল অফিসারের পদে কার্য্য করিয়া মালদহে সিভিল সার্জ্জন হইয়া যান। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে বহুসংখ্যক রোগীর বিশেষতঃ বিসূচিকা, উন্মাদ ও বসন্ত এবং প্লেগ-আক্রান্ত রোগীদের বিভাগটীর ভার গ্রহণ করিতে হয়। বিসূচিকা, বসন্ত ও প্লেগ রোগ-চিকিৎসায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ইহাতে তিনি বিশেষ যোগ্যতা এবং অভাবনীয় নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান রোগীদের চিকিৎসার ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্রদিগকে তিনি সর্ব্বদা ডাক্তারের জীবন, চরিত্রগঠন, দায়িত্বজ্ঞান এবং নিজ নিজ আরাম আয়াস ও সুখ প্রভৃতি পরিত্যাগে রোগক্লিষ্টের জন্য ব্যগ্রতা ও চিন্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিজ জীবনে লক্ষিত উদাহরণ দ্বারা শিক্ষা দিতেন। স্কুল বিভাগে যখন তিনি পড়াইতেন তখন ক্যাম্বেলের ছাত্রগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার কথা শুনিত, আবার রোগীর রোগ-শয্যা-পার্শ্বে যখন তিনি বসিতেন তখন তাঁহার মধুর আলাপ ও অমায়িক ব্যবহারে ও আশ্বাস বাক্যে রোগীর অর্দ্ধেক রোগ-যন্ত্রণার উপশম হইত। স্কুলে তিনি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সিভিল হাসপাতাল এসিষ্টাণ্ট দিগকে চিকিৎসা আইন সম্বন্ধে পড়াইতেন। দেশে স্ত্রী চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া তিনি একাকী স্কুলে মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র ক্লাস খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তৎকালে সমাজে এ বিষয়ে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল তিনি সিনেটের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি সিণ্ডিকেটে সিনেটের প্রতিনিধি-স্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসরের অধিক কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষক ছিলেন, একবার মেডিকেল সিণ্ডিকেটের "ডীন" নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তথায় ছাত্রগণের উন্নতিকল্পে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার পুলিশ সার্জ্জন-পদে কাজ করেন। এই পদে সাধারণতঃ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সুদক্ষ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় না।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হেম্প-ড্রাগ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান করেন ও ইহাতে তাহার অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে মেডিকেল কংগ্রেস হয়, তিনি তাহার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার সময়ে যে মেডিকেল সোসাইটী ছিল, তিনি তাহারও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবেরও তিনি ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এইসমস্ত সোসাইটী ও ক্লাবের উন্নতিকল্পে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন।

বাঙ্গালার কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স ও সার্জ্জনের তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ও এই কলেজের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য তিনি ইহার অনেক সংস্কার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই কলেজ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ নামে অভিহিত।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল, রিপণ কলেজ প্রভৃতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অনারারি এসিষ্টাণ্ট

সার্জ্জন হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিও দিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার—দেবেন্দ্রনাথ চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সেইসকল পুস্তক বঙ্গদেশের অনেক বাঙ্গালা মেডিকেল স্কুলে পঠিত হয়।

তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গের নানাস্থানে শোকসভা হইয়াছিল এবং বঙ্গের বিখ্যাত ও গণ্যমান্য নেতৃগণ এবং সার্জ্জন জেনারেল লিউকিস্ ও ডাক্তার চেম্বার্স সকলেই তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের নিকট পত্র দ্বারা সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ, সিনেট হাউসে ডাক্তার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল জি, এফ হ্যারিস সাহেব, কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবে ডাক্তার স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেব এবং কৃষ্ণনগর টাউনহলে নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তাঁহার নামে প্রতিবৎসর একটী স্বর্ণপদক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র শেষ M. B. পরীক্ষায় মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্সে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাকে দেওয়া হয়। তাঁহার স্মৃতি-সভায় বঙ্গদেশের মাননীয় বহু বক্তাগণ তাঁহার জীবনের সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ়সঙ্কল্পতা, স্বাধীনচিত্ততা এবং নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা সম্বন্ধে নিজ জ্ঞানে যে যাহা জানেন তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজীবন—বাল্যকাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মকথায় বিশেষ মনেযোগ দেখাইতেন এবং যৌবনে ধর্ম্মতত্ত্বে আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি আজীবন কর্ম্মক্ষেত্রে ও সংসারে থাকিয়া নীরবভাবে পরমেশ্বর স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যসকল সমাধা করিতেন। রোগীদিগের মঙ্গল-কামনায় ও

সত্বর আরোগ্য-লাভ জন্য তিনি আরাধনা করিতেন। তিনি যে অবস্থাতেই হউক ও যে স্থানেই হউক বা রাস্তাতেই হউক, সর্ব্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতেন।

নিম্নে ইহার বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল—

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র রাজা ভৈরবচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র
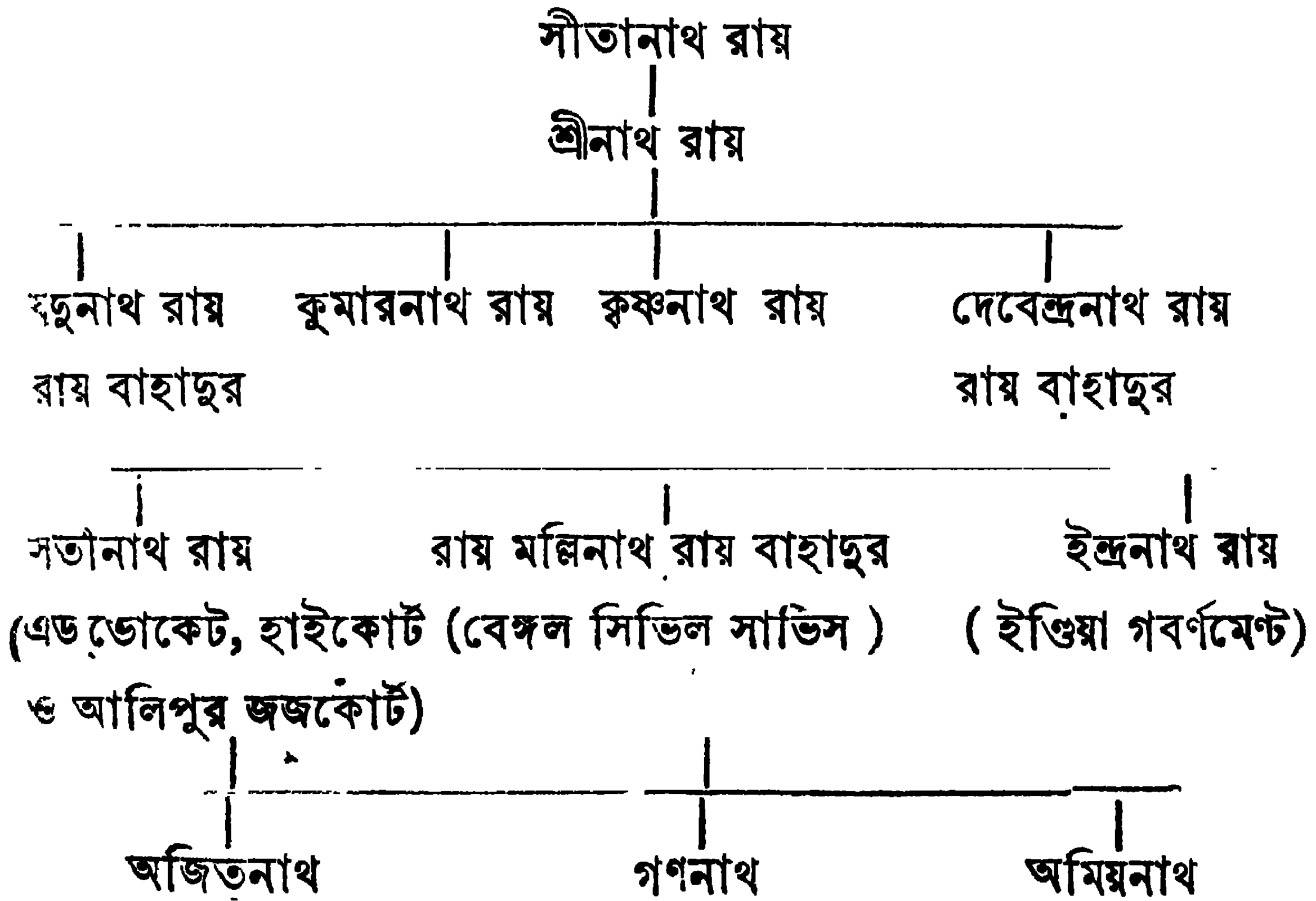
শ্রীযুক্ত রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, পরোপকার-ব্রত এবং অমায়িক ব্যবহারে শ্রীযুক্ত রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর একজন আদর্শ পুরুষ। তিনি কত নিঃস্ব ও কত বিপন্নকে সাহায্য করিয়াছেন; চট্টগ্রামের যাবতীয় জনহিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার আন্তরিক যোগ এবং অর্থসাহায্য আছে। সতীশচন্দ্রের সরল অন্তঃকরণ দয়া ও ধর্ম্মে পরিপূর্ণ, সর্ব্বোপরি তাঁহার সৌম্য, স্থির এবং গম্ভীর মুর্ত্তিখানি দেখিলে মনে হয় যেন বাৎসল্য উছলিয়া পড়িতেছে।

ইনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চট্টগ্রাম জেলার অন্তঃপাতী ধোরলা গ্রামের সম্ভ্রান্ত শক্তি গোত্র "ডুহী সেন" বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ডুহী সেনই জয়দেবোক্ত "পবনদূতে"র প্রসিদ্ধ কবি। একখানি প্রাচীন গীত-গোবিন্দের টীকায় ইঁহাকে "ধূয়ী" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং জয়দেব এই কবির উপর দুইটী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। একটী "শ্রুতিধর" এবং আর একটী "কবিক্ষাপতি"। দ্বিতীয় বিশেষণ হইতে ডুহী কবি খুব বৈভবশালী ছিলেন বলিয়াই অনুমান করা যায়। "পবনদূতে" দৃষ্ট হয়,—এই কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ বন্ধু ছিলেন। এক সময় মহারাজ তাঁহাকে হস্তী, স্বর্ণছত্র প্রভৃতি নানা মূল্যবান্ রাজযোগ্য উপহার দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে বৈদ্যজাতিরা যদিও আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন করিতেন, তথাপি এই ডুহী সেন চত্তবেদী অর্থাৎ চতুর্ব্বেদের অধিকারী ছিলেন। রাঘবকৃত "বৈদ্যকুলপঞ্জিকা"য় দৃষ্ট হয়, ডুহী সেনের পিতার নাম ছিল পুণ্ডরীক এবং পিতামহের নাম ছিল শ্রীবৎস। শক্তি গোত্রের বিবিধ

বংশ-পরিচয়
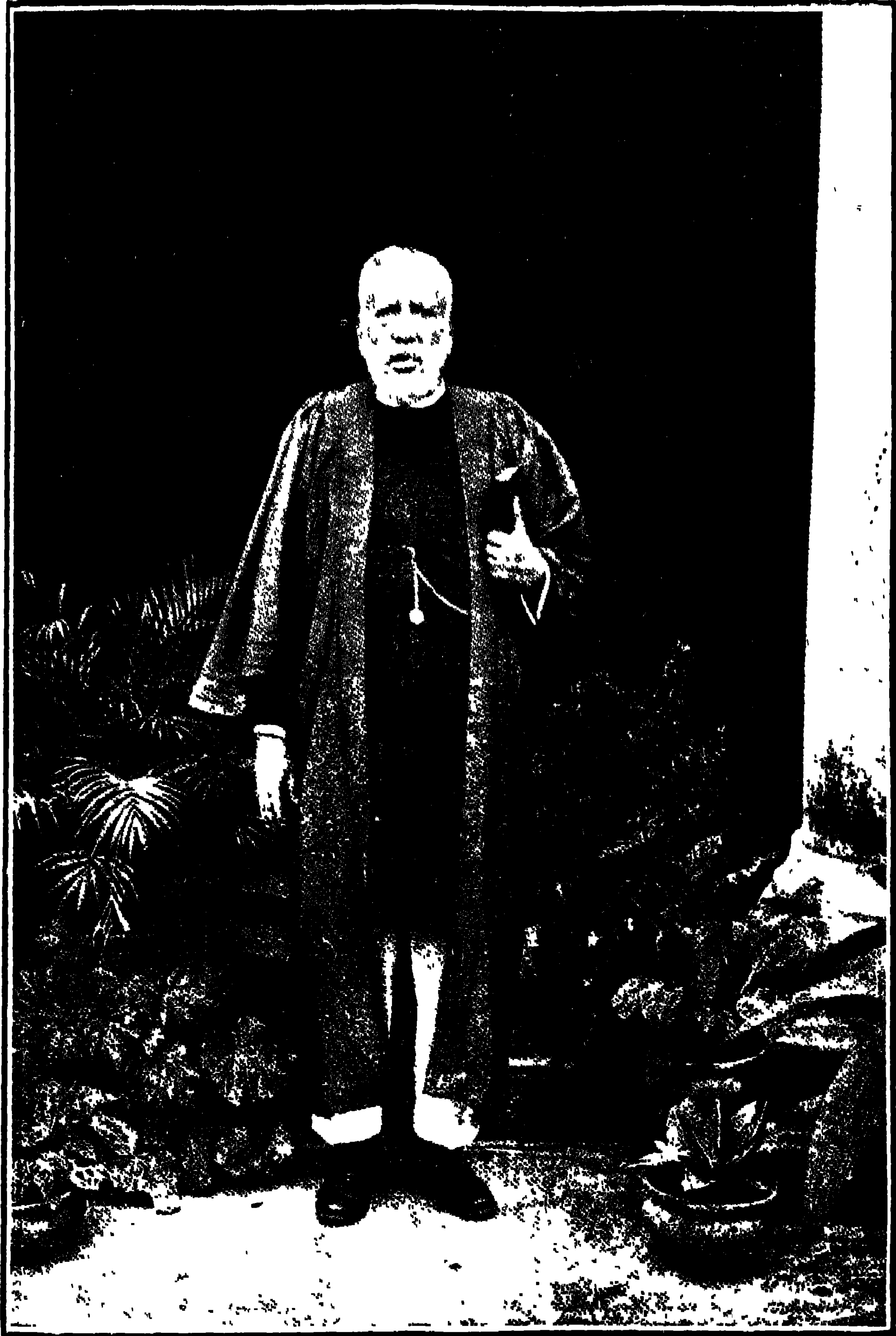
রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর।

শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবিষ্ট হইলেও প্রতিভা এবং পদগৌরবে শ্রেষ্ঠ থাকায় দুহী সেনকেই প্রধান বীজী বলিয়া গণ্য করা হয়। এই দুহীর দুই পুত্র—একজনের নাম কাশী এবং আর একজনের নাম কোশলী। কোশলীর বংশধরগণ প্রথমতঃ খুলনায় উপবিষ্ট হইয়া তৎপর প্রায় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন। কাশীর বংশধরগণ বিরাট রাঢ়ভূমিতে সমাগত হইয়া অজয়নদের দুই তীরে অর্থাৎ বর্ত্তমান বীরভূম এবং বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে বসতি স্থাপন করেন। রাঢ়ভঙ্গের সময় মহামারী এবং বর্গীর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া এই দুহী সেন-বংশোদ্ভব রঘুনাথ সেন সপরিবারে বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী শ্রীগ্রাম হইতে জলপথে পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং তিনি চন্দ্রনাথ-তীর্থ দর্শনান্তর চট্টগ্রাম জেলার ধোরলা গ্রামে সপরিবারে বসতি স্থাপন করেন। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন এই বংশের একখানি কুল-পঞ্জিকার শিরোভাগে লিখিত আছে,—

"রাঢ়ভঙ্গে রাঢ়দেশস্থ শ্রীগ্রামাৎ সমাগত"

বংশলতা

(১) রঘুনাথ সেন
|
(২) পরমানন্দ সেন
|
(৩) কন্দর্পরায় সেন
|
(৪) গঙ্গারাম সেন
|
(৫) রামদুলাল সেন
|
(৬) মৃত্যুঞ্জয় সেন
|

(৭) শরচ্চন্দ্র সেন
|
(৮) শ্রীযুক্ত রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর
|
(৯) শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, এম-এ, বি-এল

সতীশচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র সেন সদাচারে, সত্যনিষ্ঠায়, নির্ম্মল ও আদর্শ চরিত্রে এতদঞ্চলে একজন ক্ষণজন্মা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি বাল্যকালে চট্টগ্রাম জেলা স্কুল হইতে Junior Scholarship বৃত্তি লইয়া ঢাকা কলেজে Senior Scholarship পাঠ্য সমাপন করেন এবং চট্টগ্রাম জিলা-স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই সময় অনেক ছাত্রের সঙ্গে তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। তিনি কিছুকাল পটীয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম জিলা-স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় চট্টল-জননীর সুসন্তান বঙ্গের অমর কবি ৺নবীনচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ৺জগদ্বন্ধু দত্ত* সবজজ ৺চন্দ্রকুমার রায়‡ এবং পটীয়া স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় চট্টগ্রামের জননায়ক দেশবরেণ্য ৺যাত্রামোহন সেন† প্রভৃতি

পিতৃ-পরিচয়

---

* ইনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং এম-এ পরীক্ষায়ও Mental Philosophyতে প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

§ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং এম-এ পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

† ইনি কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র দেশপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পিতা।

অনেকেই তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে শরচ্চন্দ্রের অসাধারণ অনুরাগ ছিল, এইজন্য শেষ বয়সে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। গীতা ও চণ্ডী তিনি অহরহঃ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন। তিনি সংসারাশ্রমে যোগীর মতন স্পৃহাহীন এবং ধর্ম্মালোচনায় ঋষির মতন মহাপুরুষ ছিলেন। শরচ্চন্দ্র সত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা বলিতেন 'উপহাস করিয়াও মিথ্যা কথা বলিতে নাই।' শরচ্চন্দ্র কত দূর সত্যনিষ্ঠ ছিলেন একটী উদাহরণ দিলেই সকলে তাঁহার পরিচয় পাইবেন।

চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার রায় ৺দুর্গাদাস দস্তিদার বাহাদুর জীবনের প্রারম্ভে সরকারী অফিসে চাকুরী করিতেন। তখন ইন্‌কম্‌-টেক্স আইন প্রথম প্রচলিত হইলে এখানকার জনসাধারণ ভয়ানক বিক্ষোভিত হইয়া উঠেন এবং বহু গণ্যমান্য লোক আপনাপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এই আইন-প্রচলনের প্রতিকূলে এক দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্তে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী এবং ইন্‌কম্‌-টেক্স-এসেসরকে গালাগালি দেওয়া হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু এ কাজের অগ্রণী ছিলেন এবং দরখাস্তখানি তাঁহারই হস্তলিখিত ছিল। এই দরখাস্ত উপলক্ষে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার অনুসন্ধানকার্য্য আরম্ভ হইলে অনেক মহাত্মা আপনাপন দস্তখত অস্বীকার করেন। পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট দুর্গাদাসবাবুকে ফৌজদারীতে সোপরদ্দ করেন এবং বিচারে তাঁহার এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। পরে বিশেষ কারণে গবর্ণমেণ্ট দুর্গাদাস বাবুর কোন অপরাধ নাই জানিতে পারিয়া এক গোপনীয় (Confidential) তদন্ত করেন। সেই সময়েও সমস্ত স্বাক্ষর-কারী ভয়ে আপনাপন স্বাক্ষর পুনরায় অস্বীকার করেন, কেবল সেই সময় এই শরচ্চন্দ্র সেন ফৌজদারী দণ্ডভীতি উপেক্ষা করতঃ

আপন স্বাক্ষর স্বীকার করিয়া বলেন,—"অনেকেই তাঁহার সমক্ষে নিজ নিজ নাম দস্তখত করিয়াছে এবং ইহাতে কেবল দুর্গাদাসকে অপরাধী করা যায় না।" গবর্ণমেণ্ট শরচ্চন্দ্রের নির্ভীক ও সত্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দুর্গাদাসবাবুকে মুক্তি দেন এবং পুনরায় চাকুরীতে বাহাল রাখেন।

শরচ্চন্দ্র চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার জনকস্বরূপ ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া যখন স্কুল-সমূহের সব-ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিয়োজিত হন তখন চট্টগ্রাম জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শিক্ষকদিগকে অনেক রকমে পুরস্কৃত এবং বৃত্তি প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। তখন সমগ্র চট্টগ্রাম জেলার জন্য ইনিই একমাত্র সব-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। চট্টলভূমি শিক্ষা-দীক্ষায় এখন খুব উন্নত হইয়াছে, এই কথা অনেকেই স্বীকার করেন। এই শিক্ষা-গৌরবের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে—এই শরচ্চন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম আপনার কল্যাণ-হস্তে পল্লীগ্রামগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়াই এই উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য আমরণ তিনি অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ গ্রামেই তখন উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। শরচ্চন্দ্র এই জেলায় স্কুল-সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হইয়া বেশী দিন কার্য্য করিতে পারেন নাই। হঠাৎ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে। ৫৫ বৎসর বয়সেই ভগবানের নাম লইতে লইতে এই মহাপুরুষ মানবলীলা সংবরণ করেন।

শরচ্চন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী হেমেশ্বরী দেবী অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্না আদর্শচরিত্রা রমণী ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত রায় সতীশচন্দ্র সেন

বাহাদুরের জননী। হেমেশ্বরী দেবীর বাৎসল্যের গুণে স্বামীর বিধবা ভগিনী এবং দুইটী বিধবা ভাগিনেয়ী তাঁহাদের পরিবারে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রুক্মিণী দেবী, কিশোরী দেবী এবং কাশীশ্বরী দেবী এই তিন কন্যা এবং একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্রকে রাখিয়া হেমেশ্বরী দেবী ৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। শরচ্চন্দ্র সেন দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম ষোড়শীবালা দেবী। ইহার গর্ভে ছয়টী পুত্রসন্তান জন্মে। (১) যোগেশচন্দ্র (২) শ্রীশচন্দ্র (৩) জ্যোতিশচন্দ্র (৪) ক্ষিতীশচন্দ্র (৫) পরেশ চন্দ্র (৬) দীনেশচন্দ্র।

বাল্যকাল হইতে সতীশচন্দ্র শান্ত ও নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতেন। তিনি প্রথমতঃ নিজ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া সারোয়াতলী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বাঙ্গালা-শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে পটীয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষায় পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি-প্রাপ্তিতেই শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জীবনের প্রারম্ভেই সতীশচন্দ্রের মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম জিলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করিয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এইরূপে এফ-এ পরীক্ষায়ও তিনি ২০৲ টাকা সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নকালে তদানীন্তন প্রিন্সিপাল চন্দ্রমোহন মজুমদার এবং গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক রাজকুমার সেন এই নিরীহ ও শান্ত বালক সতীশচন্দ্রকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ অধ্যয়নকালে তিনি ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়েন, কারণ

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

কলিকাতার জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। অতঃপর সতীশচন্দ্র এলাহাবাদ মেওর সেণ্ট্রাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং এ কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৩০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। বাল্যকাল হইতে প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করায় আত্মপ্রসাদজনিত ঔৎসুক্য তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছিল। এলাহাবাদ মেওর সেণ্ট্রাল কলেজে অধ্যয়নকালে ভারতের স্বনামধন্য মহাপুরুষ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সতীশ চন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। এলাহাবাদ কলেজে ইংরেজী শাস্ত্রে এম-এ অধ্যয়নকালে তিনি ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনীত হন। কিছুকাল পরে আরোগ্য লাভ করিলে সতীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ এবং মেট্রিপলিটন ইনষ্টিটিউসনে বি-এল অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এম-এ পরীক্ষার ফিস দাখিল করার পর তাঁহার পিতৃদেব লিখিয়া পাঠাইলেন— "তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না।" এই পত্র সতীশচন্দ্রকে অধীর করিয়া তুলিল। শিশু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সংসারের যাবতীয় বোঝা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি বি-এল পাঠ্য-সমাপনান্তর পরীক্ষা প্রদান করেন; তথাপি এই পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্বালয়ে ৭ম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তাহার পর সতীশচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল। জেলা-কোর্টে ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিতে লাগিল।

কর্ম্মজীবন

এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গগত হন। তিনি সতীশচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের সূত্রপাতমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। জীবনের প্রথমাবস্থায় পিতৃ-বিয়োগে সতীশচন্দ্রের চিত্ত অতিশয় প্রতিহত হইয়াছিল। এক

বৎসরের ব্যবসায়—চারিদিকে অভাব ; তথাপি এই সহায়হীন অবস্থায়ও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়াছিলেন। এই সময় অপোগণ্ড বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের শিক্ষার ব্যয় এবং সংসারের যাবতীয় খরচ তাঁহার আয়ের উপর নির্ভর করিত। ভগবান সতীশচন্দ্রের সহায় হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ উকিলগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Public Prosecutor নিযুক্ত হন। তদানীন্তন জেলা-জজ মিঃ গর্ডন তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করিবার সময় নিম্নলিখিত অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—"As a criminal practitioner he has no equal and as a civil practitioner he has no superior." ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রায় দুর্গাদাস দস্তিদার বাহাদুর অবসর গ্রহণ করিলে সতীশচন্দ্র Senior Government Pleader-পদে উন্নীত হন এবং এখন পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত এই পদে কাজ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটির কমিশনার-পদে নির্ব্বাচিত হন। ইনি ২৪ বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনারের কাজ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বার বৎসর কাল তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটির ভাইস্‌-চেয়ারম্যান এবং দুইবার চেয়ারম্যানের কাজও করিয়াছেন। করদাতাগণ তাঁহার কাজের উপর সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন, গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে তাঁহার কর্ম্ম-নিপুণতার অজস্র প্রশংসা থাকিত। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতির জন্য সতীশচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এই সহৃদয়তার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিনবার Certificate of Honour দিয়া সম্মানিত করেন। প্রথমবার তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ডায়মণ্ড

সাধারণহিতকর কার্য্য এবং রাজসম্মান

জুবিলি” উপলক্ষে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ক্রমান্বয়ে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেষবার তিনি Coronation Medalও প্রাপ্ত হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। সতীশচন্দ্র অনেক বৎসর ধরিয়া পোর্ট কমিশনারের কাজ করিয়াছেন। ৮ বৎসর তিনি চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। গত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের Non-official Chairman নির্ব্বাচিত হইয়া দুই মাস কাজ করেন। এই জেলার সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে সতীশ-চন্দ্রের অর্থসাহায্য ও সহানুভূতি আছে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ-মন্দির এবং ইস্‌লাম হোষ্টেল নির্ম্মাণকার্য্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তিনি অনেক অর্থ প্রদান করিয়াছেন। বহুতর নিঃস্ব ও দরিদ্র বালক এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই শিক্ষার জন্য এই উদারচেতা মানুষটীর নিকট অর্থসাহায্য পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সাধুসন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ, কন্যাদায়গ্রস্ত, উৎকট রোগী, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি যে কেহ সতীশচন্দ্রের দ্বারে সমাগত হয়, তিনি কাহাকেও বিমুখ করেন না।

এই সতীশচন্দ্র জীবনের সায়াহ্নেও বাঙ্গালার অধিকাংশ মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। গুরুতর রাজ-কার্য্যের অন্তরালেও তিনি অনেক সৎগ্রন্থ পাঠ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ আছে। তিনি বহু বর্ষ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিজ গ্রামে যখন চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদকে আহ্বান করা হয়, তখন তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-স্বরূপে এক সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরম আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এই

রায় বাহাদুর এখন চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েসনের সভাপতি। হিন্দু-সভার সভাপতি-স্বরূপে তিনি এই জেলার হিন্দুগণের পক্ষে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর একজন খাঁটি হিন্দু। হিন্দুসমাজের প্রাচীন আচার-ব্যবহার তিনি নিজ পরিবারে সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই ধর্ম্মভাব জাগরিত থাকে। তিনি বহু বর্ষ ধরিয়া প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতার সহিত চট্টগ্রামে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করতঃ বিচারকার্য্যে আপনার সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পারিবারিক বিবরণ

সতীশচন্দ্র ২১ বৎসর বয়সে নয়াপাড়া গ্রামের মৎগোল্যগোত্রীয় সুবিখ্যাত সেন বংশের * ৺ হরদাস সেন রায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। করুণাময়ী অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না হিন্দুগৃহের আদর্শ-গৃহিণী; তিনি প্রতিদিন শিবের অর্চ্চনা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। এই আদর্শরমণী ষোল বৎসর যাবৎ ষোড়শ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রের দুই পুত্র—প্রথম শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, এম-এ, বি-এল; ইনি বর্ত্তমান সময় অতিশয় সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসা করিতেছেন। সাধুতা, চরিত্রবল এবং উদারতায় চন্দ্রশেখরবাবু পিতার সর্ব্বগুণের অধিকারী। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তঃপাতী কানুনগোপাড়া গ্রামের ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দাসবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার কানুনগো মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরবাবুর ৪টী কন্যা—(১) অশোকা (২) অণিমা (৩) অরুণা (৪) অসীমা।

* মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র বিধুশেখর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে নিতান্ত অপূর্ণ জীবন লইয়াই দুরন্ত কলেরা রোগের আক্রমণে পরলোক গমন করে। এই বালকের মধ্যে অপরিমিত প্রতিভার আভাস পাওয়া গিয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে সে "শক্তি গোত্র দুহী সেন" বংশ উজ্জ্বল করিতে পারিত। রায় বাহাদুর বিধুশেখরের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বহু টাকা ব্যয় করিয়া আপন গ্রামে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। "ধোরলা বিধুশেখর দাতব্য চিকিৎসালয়" সতীশচন্দ্র ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর বুকের মধ্যে সান্ত্বনার অভয় বাণী প্রদান করিতেছে।

সতীশচন্দ্রের দুই কন্যা—প্রথমা শ্রীমতী মাধবীলতা এবং দ্বিতীয়া কন্যাটী জন্মগ্রহণ করার তিনমাস পরেই পরলোকগতা হয়। চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্ট বারের উকিল ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দাশবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চৌধুরী বি-এল মহাশয় শ্রীমতী মাধবীলতা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহাদের বংশ সাধারণতঃ কেদারবংশ নামে প্রখ্যাত। মাধবীলতার চারি পুত্র—(১) সুখময় (২) শান্তিময় (৩) জ্যোৎস্নাময় (৪) চিন্ময় এবং ইঁহার তিনটী কন্যা—(১) নীলিমা (২) নীহারিকা (৩) সুলেখা।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ

সতীশচন্দ্রের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছিলেন, তখন দারুণ কলেরা রোগে তাঁহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটে। তৎকনিষ্ঠ শ্রীশচন্দ্রকে পিতার আদেশানুযায়ী সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কাব্য ও ব্যাকরণপাঠ সমাপন করিয়া ৯ বৎসর কাল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং কবিরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র চট্টগ্রাম সহরে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে না করিতেই পরলোক গমন করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ জ্যোতিশচন্দ্র বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং

কণ্ট্রাক্টরের কাজ করিতেছেন। তৎকনিষ্ঠ ক্ষিতীশচন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় সাহিত্য এবং ইতিহাসে Double Honours প্রাপ্ত হইয়া ইতিহাসে এম-এ পাশ করেন। ইনি কিছুকাল কলিকাতার রিপণ কলেজে ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তৎপর তিনি বি-এল পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হন। ওকালতি ব্যবসায়ে চারিদিকে তাঁহার যশ ছড়াইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বিধাতার কি অভিশাপ জানি না—৩৭ বৎসর বয়সে এই যুবক সমস্ত পরিবারকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট মাননীয় ফজলুল হক এবং তদানীন্তন হাইকোর্টের প্রধান জজ মান্যবর সেণ্ডার্সন সাহেব ক্ষিতীশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

Amritabazar Patrika, July 15, 1919. At the High Court on Monday the Chief Justice and Mr. Justice Cumming taking their seats the Hon. Mr. Fazlul Haque said, "I feel it my faithful duty to convey to you the sad news of the sudden death of one of the promising members of our profession Babu Kshitish Chandra Sen. The deceased was enrolled as a Vakil of this Hon. Court in 1909 after having graduated with honours in History in 1905 and taken the M.A. Degree in that subject in 1905. He soon got into good practice and gave evidence of rapid success at the bar. In this hour of sorrow at his loss, we all remember his unfailing courtesy, the warmth of his friendship, his ability as an advocate and honesty of purpose in putting his case before the Court. The Chief Justice replied,—"My learned brother and I have heard with great sorrow the said news which you have just imparted to us about the sudden death of Babu Kshitish Chandra Sen. We heartily reciprocate all that you have said about the deceased and we all appreciate his ability as a lawyer. We convey our sympathy with his family through you."

ক্ষিতীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পরেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইতিহাসে অনার্স প্রাপ্ত হইয়াই বি-এ পাশ করেন এবং সেই ইতিহাসশাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া কুচবিহার মহারাজ কলেজ এবং কলিকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। পরিশেষে তিনি বি-এল্ পাশ করিয়া চট্টগ্রাম জেলা কোর্টে ওকালতি-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়া অতিশয় সুনাম অর্জ্জন করিতেছিলেন। সদাশয় ও চরিত্রবান্ বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। ক্ষিতীশচন্দ্র ও পরেশচন্দ্র একযোগে বি-এ ছাত্রদের জন্য "Political Economy" (অর্থশাস্ত্র) এবং "Modern Enrope" (বর্ত্তমান ইউরোপ) নামক দুইখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ইংরেজী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরেশচন্দ্র Essentials of Geography নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের বালকদের পাঠোপযোগী একখানি ভৌগোলিক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, গত ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে শুক্রবার কলিকাতার নবীন কুণ্ড লেনে তাঁহার বাসা-বাড়ীর সম্মুখেই আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীনেশচন্দ্র পিতৃ-বিয়োগের এক বৎসর পরে পরলোক গমন করেন।

রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং জীবনের সর্ব্বকার্য্যে তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মাতা হেমেশ্বরী পুত্র-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। রায় বাহাদুর চট্টগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোয়ার্টার পল্টন রোডে সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মাতার নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। এই প্রাসাদ "হেমকুটীর" নামে অভিহিত।

বংশলতা।

"রাঢ়ভঙ্গে রাঢ়দেশস্থ শ্রীগ্রামাৎ সমাগত"

রঘুনাথ সেন

পরমানন্দ

(১) শ্রীরায় (২) কন্দর্পরায় (৩) কৃষ্ণরায়

কমলনয়ন (পরইকোড়া) (১) হরিরাম (২) গঙ্গারাম (৩) দয়ারাম রামনারায়ন

সাঁছিরাম

তিতারাম উৎসব রায় (নয়াপাড়া) শম্ভুরাম (১) চাঁদরায়*

মাগন* (২) কালিকাপ্রসাদ*

(১) রামদুলাল (২) রামবল্লভ (১) রামলোচন* (২) রামবল্লভ (আনোয়ারা)

কালীচরণ রামরত্ন(ক)

ভুবনমোহন (২) কৃষ্ণমোহন* (১) শান্তিরাম (২) রামদুলাল

জাহিরাম

(১) মহেশচন্দ্র (২) কৈলাশচন্দ্র

কৈলাশচন্দ্র*

(৩ গোলকচন্দ্র*

(১) ভৈরবচন্দ্র (২) গৌরমোহন (৩) রামচন্দ্র*

*রামকুমার (১) *রাজকুমার (২) রামকমল (১) *উমাচরণ(২)

ক খ গ
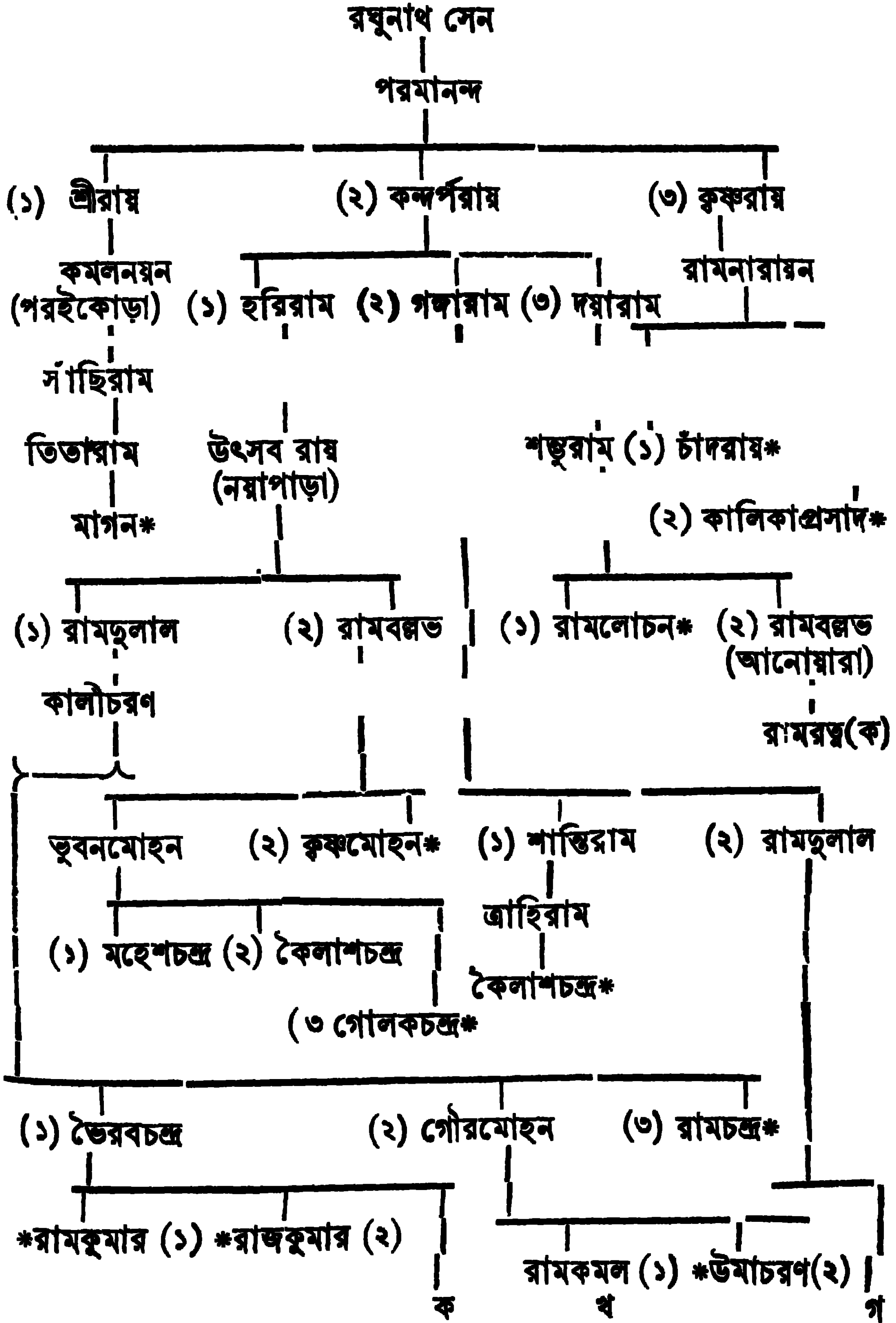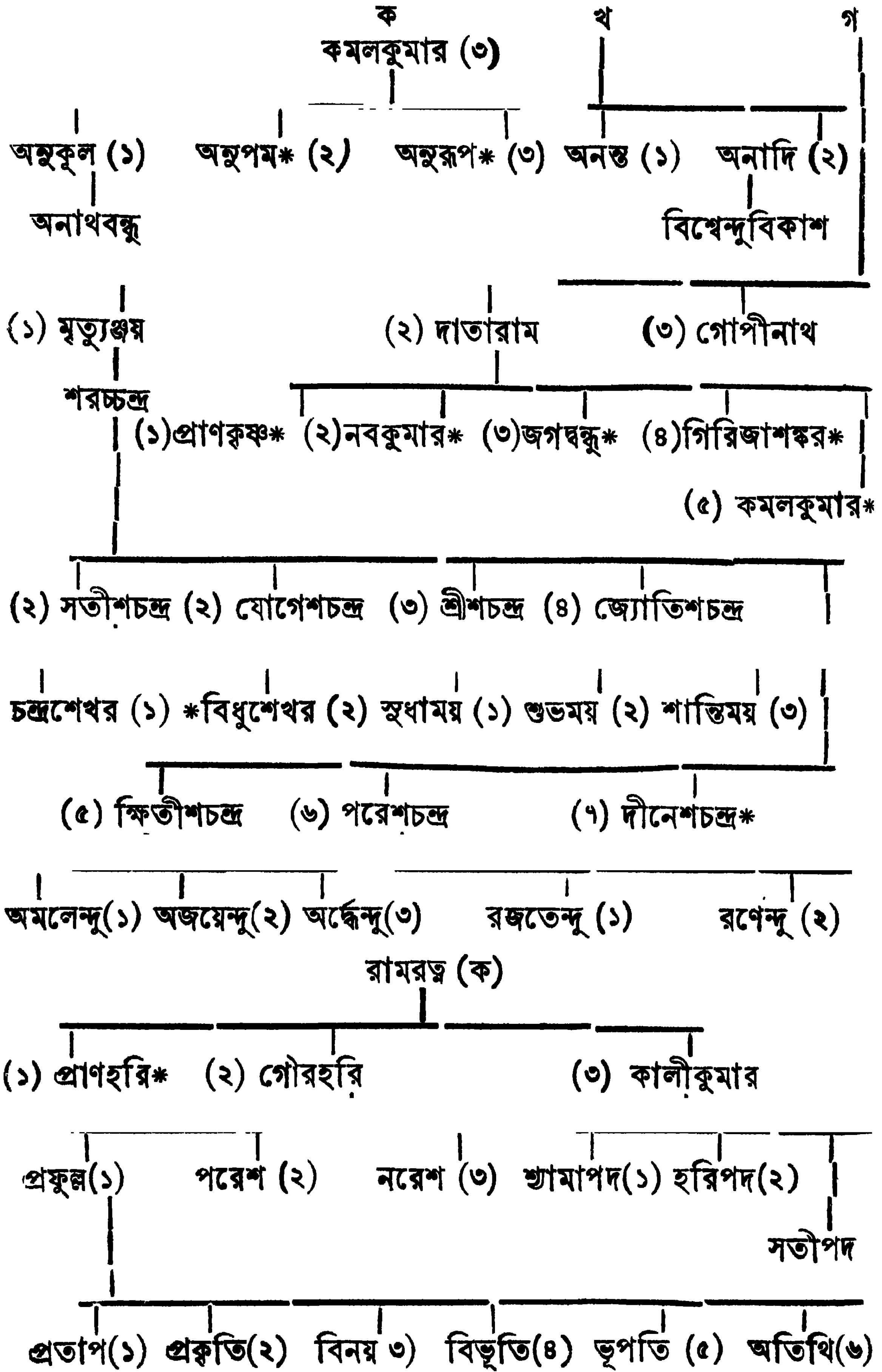
* এই চিহ্নিত ব্যক্তিগণ অপুত্রক।

মুগবেড়িয়া জমিদার-বংশ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত বর্ত্তমান ভগবানপুর থানার এলাকায় নাড়ুয়ামুঠা পরগণার অধিকাংশ ভাগ অবস্থিত। উক্ত পরগণা বাদশাহগণের শেষ আমলে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক বাঙ্গালা ১১০০ সালে পুণ্যাত্মা ও দানশীল মাজনা এষ্টেটের রাজা যাদবরাম রায়ের রাজ্য ছিল। সে সময়ে এ অঞ্চলে শিক্ষিত ও সদ্ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব এক প্রকার ছিল না। কিন্তু দেবতা ও ব্রাহ্মণের পরম ভক্ত রাজা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন। তিনি সদ্ ব্রাহ্মণের সম্যক্ অভাব অনুভব করিয়া ৺পুরীধামে গমনপূর্ব্বক দেবরাজের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করতঃ তাঁহার নিকটে নিজ রাজ্যে সদ্ ব্রাহ্মণের অভাবের কথা জানাইয়াছিলেন। পরে তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে তথা হইতে সদাচার-ও বৈদিক ক্রিয়া-নিরত পাঁচজন শাসনিক (ক) ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের পরিজনবর্গের সহিত গৃহাদি নির্ম্মাণ ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া বাস করাই-বার অঙ্গীকার করতঃ সঙ্গে লইয়া আসেন। তাঁহাদের উপাধি "নন্দ" "ত্রিপাঠী" "দ্বিবেদী" "হোতা" ও "ষড়ঙ্গী"। নন্দ উপাধিধারী ব্রাহ্মণ সামবেদী এবং পঞ্চপ্রবরবিশিষ্ট কাশ্যপগোত্রীয়। নন্দ উপাধিধারী যিনি প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম 'অপর্ত্তিচরণ' নন্দ (খ)।

(ক) পুরীতে দেবরাজ-প্রতিষ্ঠাপিত কুলশীল ও বিদ্যাবিনয়াদিসম্পন্ন ১৬টী পল্লী আছে। ঐ ১৬টী পল্লী সামাজিক ব্যাপারে এক এক জন নেতার দ্বারা শাসিত হয় বলিয়া ১৬ শাসন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ সকল শাসনাধিবাসী ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন দেশে যাইয়া বাস করিলেও বিশেষজ্ঞগণের নিকটে শাসনিক ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত ও বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন।

(খ) উৎকল অঞ্চলের রীতি এই যে, কাহারও সন্তান উৎপন্ন হইয়া মরিয়া যাইবার পর অপর সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সেই পরজাত সন্তানের নিরর্থক বা কদর্থক শব্দ-

ইনি ৺পুরীধামের সুপ্রসিদ্ধ বীররামচন্দ্রপুর শাসন হইতে আসিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজা পূর্ব্বোক্ত উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণকে সসম্মানে আনাইয়া 'মুগ্ বেড়্যা' নামে (ক) খ্যাত একটী গ্রামের মধ্যে প্রায় ১৬ বিঘা জমির চতুস্পার্শ্বে গড়খাই কাটাইয়া এবং তাঁহাদের প্রত্যেক পরিবারের বাসোপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ও প্রচুর নিষ্কর ভূসম্পত্তি দিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন।

কালক্রমে "ষড়ঙ্গী" ও "হোতা" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ নিরংশ হইয়াছেন। "দ্বিবেদী" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ মুগবেড়্যা হইতে প্রায় ৩ মাইল অন্তরে গিয়া বাস করিতেছেন। মুগবেড়্যাতে কিঞ্চিন্ন্যূন একশত বর্ষ বাস করিবার পরে "ত্রিপাঠী" বংশধারার সন্তানবৃদ্ধি ও নন্দ-বংশীয়গণের শ্রীবৃদ্ধি ও সন্তানবৃদ্ধি হওয়ায় "নন্দ"-বংশীয়গণ সেই রাজ-কল্পিত বাসস্থানের মমতা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বাস্তু "ত্রিপাঠী" গণের হস্তে সমর্পণ করতঃ পূর্ব্ব বাসস্থানের অনতিদূরবর্ত্তী "কেশাইদীঘি" গ্রামের একটি প্রশস্ত স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাহার পর অপর্ত্তিচরণ নন্দের প্রপৌত্র খগেশ্বর নন্দ মহাশয়ের প্রৌঢ়াবস্থা উপস্থিত হইলে ও পুত্র না হওয়ায় তিনি দুঃখিতান্তকরণে বৈদ্যনাথধামে যাইয়া ধরণা দেন। তখন অন্তর্য্যামী ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন, "তোমার প্রতি আমি সুপ্রসন্ন হইয়াছি, তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে এবং তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার বংশধরগণ সকলের কর্ত্তৃক চিরকাল সম্মানিত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়া বাস

ঘটিত একটী নাম দেওয়া হয়। ঐ নামটীও সেইভাবে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(ক) মুগেশ্বরী বা মুদ্‌গেশ্বরী নামে একটী পাষাণময়ী গ্রামদেবতা অতি পুরাকাল হইতে অবস্থিত বলিয়া গ্রামের নাম মুগ্ বেড়িয়া হইয়াছে।

করিবে।” তাঁহার এইরূপ আদেশের অল্পকাল পরেই বাঙ্গালা ১২২৮ সালে সেই খগেশ্বর নন্দ মহাশয়ের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অপরের কথা দূরে থাকুক, তখন সেই খগেশ্বর নন্দ মহাশয়ও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, সেই সদ্যোজাত শিশু অল্পকাল পরেই বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও অধ্যবসায়াদিগুণে অদ্বিতীয় হইবেন এবং প্রভূত অর্থব্যয় ও প্রাণপাত পরিশ্রম স্বীকার করতঃ মনুষ্য-সাধারণের অগম্য হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্যময় বিশাল ভূমিখণ্ডকে আবাদযোগ্য করিয়া বৃত্তিহীন সহস্র সহস্র প্রজার বংশপরম্পরা-নির্ব্বাহোপযোগী বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। নামকরণের সময় ইঁহার নাম রাখা হইয়াছিল শ্রীভোলানাথ নন্দ। তাহার পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল শ্রীভীমচরণ নন্দ। এই পুত্রদ্বয়ের জন্মগ্রহণের অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতা লোকান্তরিত হন, সুতরাং সন্তান দুইটীকে শিক্ষিত করিবার সুযোগ তাঁহার আদৌ ঘটে নাই। ইঁহাদের পৈত্রিক নিষ্কর সম্পত্তি যাহা ছিল তদ্দ্বারা সংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত মাত্র, উদ্‌বৃত্ত থাকিত না। কিছুকাল পরে উভয়ে বিবাহিত হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমচরণ নন্দ মহাশয় বাঙ্গালা ১২৫৪ সালে জ্যেষ্ঠ ভোলানাথ নন্দ মহাশয় হইতে পৃথক হইয়া যান।

তাহার পর ১২৫৬ সালে মাজ্‌না এষ্টেটের তাৎকালিক মালিক রাজা আনন্দলাল রায় মহোদয়ের নিকট হইতে উক্ত ভোলানাথ নন্দ মহাশয় ৭টী মৌজায় বহুসংখ্যক হরিণ ও বন্যশূকর এবং মহিষাদি হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ তিন হাজার বিঘা পতিত জঙ্গলভূমি কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চাষ-আবাদের জন্য বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। সে সময়ে সুদূর মফঃস্বলে আগ্নেয়াস্ত্র ও শিকারীর অত্যন্ত অভাব ছিল। সেই হেতু তাদৃশ নিবিড় জঙ্গলাবৃত ও হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ পূর্ব্বোক্ত

পতিত ভূমিখণ্ড কখনও যে আবাদ-যোগ্য হইবে এরূপ সম্ভাবনা পূর্ব্বে কেহ করিতে পারে নাই। নতুবা উক্ত জঙ্গলের অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে অনেক অবস্থাপন্ন লোক থাকিলেও অসম্বল ব্রাহ্মণকে এরূপ অসীম সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইত না। এই ভোলানথ নন্দ মহাশয় বাল্যকাল হইতেই বলিষ্ঠ, উদ্যমশীল, শীকার-প্রিয় এবং নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অপরিসীম সাহসিকতার ফলেই ঐ সকল জমি আবাদ-যোগ্য অবস্থা লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রতিদিন রাত্রিকালে স্বয়ং দুই একজন মাত্র লগুড়ধারী অনুচর সঙ্গে লইয়া তাৎকালিক সেই সাধারণ গাদা বন্দুকের সাহায্যে অসংখ্য বন্যমহিষ ও বরাহ প্রভৃতি শীকার করিয়া ও কুলীর দ্বারা ক্রমে ক্রমে জঙ্গল কাটাইয়া ঐ সকল পতিত জমিকে ক্রমশঃ আবাদোপযোগী করতঃ প্রজাবিলি করেন। এ প্রদেশে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার অল্পদিন পরেই গভর্ণমেণ্টের অধীনে হিজলীর সণ্ট এজেন্সীর কার্য্য আরম্ভ হয়। গত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সেই সণ্ট এজেন্সী রহিত হইলে উক্ত নন্দ মহোদয় পুনর্ব্বার রাজা আনন্দলাল রায় মহাশয়ের নিকট লবণাম্বু-পরিবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গলাবৃত ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ আরও চারিহাজার বিখা পতিত জমি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। পরে সদর মহাল জালপাই নামক একটী সুবৃহৎ জঙ্গলাবৃত এষ্টেট গভর্ণমেণ্টের নিকট ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন; উহার পরিমাণ চৌদ্দহাজার বিঘা। উক্ত জঙ্গলাবৃত বিশাল ভূমিখণ্ডের শস্যনাশক বন্য হরিণ ও হিংস্রজন্তুসমূহকে অপরিসীম অধ্যবসায় ও সাহসিকতাগুণে স্বয়ং নিহত করিয়া ক্রমশঃ জঙ্গল পরিষ্কার করতঃ আবাদের উপযোগী করিয়া অধিকাংশ জমি প্রজাবিলি করেন এবং অবশিষ্ট জমি নিজ চাষে রাখেন। পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল জমিগুলি বর্ত্তমান সুন্দরবনের মত জঙ্গলাবৃত ও হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ

ছিল। ঐ সময়ে তিনি স্বগ্রামে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে সুবিখ্যাত গ্রন্থকার নৈষ্ঠিক-চূড়ামণি ঋষিকল্প ৺দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ নামক পণ্ডিত কেশরীকে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। পরে পরিজন ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ায় মুগবেড়্যা নামে প্রকাশিত সুয়াদিঘী গ্রামের একটী সুপ্রশস্ত স্থানে বৃহদাকার ইমারতের পত্তন করিয়া ১১৭২ সালে তিনি কেশাইদিঘী গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়া সেখানে পরিজন-বর্গের সহিত বসবাস করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি ১২৮৭ সালে জ্যেষ্ঠ মাসে শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মৃত্তিকানির্ম্মিত চতুষ্পাঠী-গৃহ এখনও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া সংস্কৃত-শিক্ষার্থীগণের অধ্যয়ন-শব্দে মুখরিত হইতেছে।

তাঁহার তিনটী পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই উদারহৃদয়, তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দানশীল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ৺গোবিন্দপ্রসাদ নন্দ এবং মধ্যম পুত্রের নাম ৺দিগম্বর নন্দ; আর যিনি কনিষ্ঠ সেই গুণগরিষ্ঠ, স্বনামধন্য, অকৃত্রিম দেশহিতৈষী, ন্যায়পরায়ণ, দানবীর, অদ্বিতীয় লোকশিক্ষানুরাগী, মহামহিমাশালী, মহাত্মা, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের নাম শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ। ইঁহারা পিতৃবিয়োগের পর ১০।১২ দিন মধ্যেই সাত হাজার টাকার রেভিনিউ-সংক্রান্ত মাল জালপাই এষ্টেট ক্রয় করেন। এই ভ্রাতৃত্রয় ১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তীভাবে থাকিয়া মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অনেক জমিদারি ও নিষ্কর সম্পত্তি ক্রয় করেন। আবার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সুন্দর বনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঁচখণ্ড লাটে প্রায় ২৭,০০০ সাতাইশ হাজার বিঘা জমি গভর্ণমেণ্টের নিকটে বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া হাজারিবাগ, মানভূম ও ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে কুলী আনাইয়া ও তাহাদিগের দ্বারা জঙ্গল কাটাইয়া লবণাম্বু-প্রবেশে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত রীতিমত উচ্চ ও সুপরিসর বাঁধ

বাঁধিয়া শীকারী নিযুক্ত করেন এবং শত শত কুম্ভীর, ব্যাঘ্র ও বরাহাদির বিনাশ সাধন করতঃ সেই সকল জমি আবাদ-যোগ্য করিয়া অধিকাংশ জমি প্রজাবিলি করেন।

সন ১৩০৭ ও ১৩০৮ সালে ইঁহারা সমস্ত সম্পত্তি আপোষে বিভাগ করিয়া ১৩০৯ সালে ১৯শে মাঘ বণ্টননামা দলিল সম্পাদন করেন এবং পৃথক হইবার পরেও প্রত্যেকে স্থানে স্থানে বহু সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ ৺গোবিন্দপ্রসাদ নন্দ মহাশয় সুবক্তা, দয়ালু, নিরতিশয় সরলচিত্ত এবং ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, কিন্তু তিনি বিভাগের অল্প কাল পরেই রুগ্ন অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধুপুরে যাইয়া সেখানে হঠাৎ অশুভনিয়তির বশ্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহার উল্লেখযোগ্য সৎকার্য্য করিবার অবসর ঘটে নাই।

তাঁহার তিন পুত্র। সকলেই সৌম্যদর্শন, শান্তশীল, ও নিষ্ঠাপরায়ণ। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ নন্দ মহাশয় সাতিশয় আস্তিক্যভাবাপন্ন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে নিজ গ্রামে ৺শীতলা মাতার একটী মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মেদিনীপুর সহরে ও সুজাগঞ্জ নামক স্থানে ৺শীতলা মাতার প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় সেইখানে একটী প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দুঃস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে সাহায্য দানও করিয়া থাকেন। এপর্য্যন্ত ভ্রাতৃত্রয় একান্নবর্ত্তীভাবেই কালযাপন করিয়া আসিতেছেন। মধ্যম ৺দিগম্বর নন্দ বিদ্যানিধি মহাশয় গভর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত কাব্যশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়া মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং কালীকুসুমাবলি নামক সার্দ্ধশতাধিক সংস্কৃত শ্লোকে আদ্যাশক্তির একটী সুললিত স্তব রচনা করিয়া তাহা মুদ্রিত করতঃ সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করেন। ইনি যুগ-

বেড়্যাতে একটী এম, ই স্কুল স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল তাহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। আর হিংস্রজন্তু ও লবণাম্বুপরিপূর্ণ তাঁহাদের সমগ্র লাট অঞ্চল ও ডম্বুরবড়িয়া নামক জালপাই আবাদের সময়ে ইনিই প্রাণপাত পরিশ্রম স্বীকার করতঃ ঐসকল সুদূর দুর্গমস্থানে যাতায়াত করিয়া লবণাম্বু প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য প্রশস্ত বাঁধ ও জঙ্গল পরিষ্করণ প্রভৃতি কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যানিধি মহাশয় ভ্রাতৃগণের সহিত একান্নবর্ত্তিভাবে থাকিয়াই ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার পর পৃথক্ হইয়া মুগবেড়্যা হইতে অন্যূন ১২ মাইল দূরবর্ত্তী বলাগেড়িয়া নামক স্থানে বৃহদাকার ইমারতের পত্তন করিয়া সেইখানে বিশাল ও সুদৃশ্য একটী বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তাহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পত্নীর সহিত অবারিত পান-ভোজনাদির সুব্যবস্থা-সম্বলিত ও ভূরি দক্ষিণা-বিশিষ্ট রজতময় তুলাপুরুষদান-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। ইনি বলাগেড়িয়াতে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ঐ চতুষ্পাঠীতে অনেকগুলি ছাত্রের ও অধ্যাপক মহাশয়ের থাকিবার বৃত্তির ও বেতনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল কার্য্য করিয়া পরে তিনি বাস করিবার নিমিত্ত ৺কাশীধামে হোড়ারবাগে একটী তেতালা বাড়ী প্রস্তুত করেন। সেখানে কয়েক বৎসর অবিচলিতচিত্তে বাস করিয়া ৺বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার পাঁচটী পুত্র। তাঁহারা সকলেই বিনয়, সৌজন্য প্রভৃতি বহু গুণের আধার হইলেও চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ নন্দ মহাশয় সুচতুর ও বিষয়কার্য্যে নিপুণ। তিনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবিভক্ত ভাবে থাকিয়া বলাগেড়িয়াতে একটী বৃহদাকার ও সুদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া একজন এম, বি ডাক্তার নিযুক্ত করতঃ তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে আবশ্যকীয় ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত উপকরণই

সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় এই বলাগেড়িয়া গ্রামে "বলাগেড়িয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটী" নামে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং অচিরেই "বলাগেড়িয়া কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক" নামে একটী ব্যাঙ্ক ও "বলাগেড়িয়া পোষ্ট অফিস" নামে একটী পোষ্ট অফিস স্থাপিত হইবে। তাঁহার এই সকল কার্য্যে দেশবাসিগণ যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে।

মহামহিমান্বিত মহাত্মা শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ মহাশয় উক্ত শ্রীভোলানাথ নন্দ মহাশয়ের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও অনির্ব্বচনীয় দেশহিতৈষণা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার মহনীয় গুণগ্রামের বাহুল্য সংক্ষেপে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীহর্ষ কবির ভাষায় বলিতে পারা যায় যে—

"যদি ত্রিলোকীগণনা পরাস্যাৎ
তস্যাঃ সমাপ্তির্যদিনায়ুষঃ স্যাৎ।
পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাৎ
গণেয় নিঃশেষ গুণোঽপি স স্যাৎ॥"

ইনি বাল্যকাল হইতে সাতিশয় ধীরস্বভাব ও অত্যন্ত দয়ালু এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহার আশৈশব কৃশতা বর্ত্তমান ৬৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রায় সমভাবেই আছে। তথাপি ইঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা পুরুষ জগতে অত্যন্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মুখ্যতঃ জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য ও পুস্তক প্রবন্ধাদি পাঠ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। শাকসবজী ও ফুলের বাগানের কার্য্যের প্রতি ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আরও নানাবিধ কারণে দৈনিক শত

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ

গঙ্গাধর দাতব্য চিকিৎসালয়।
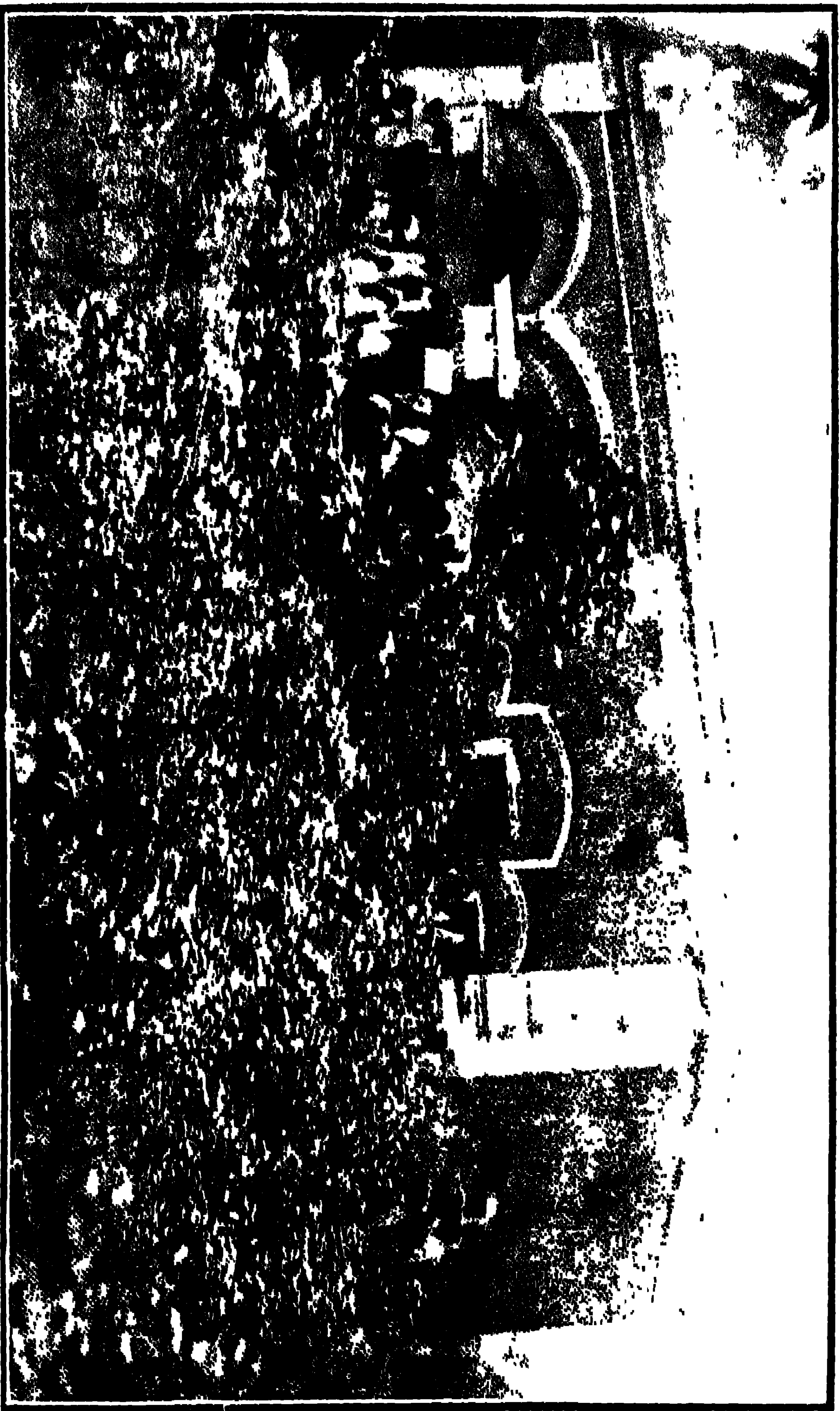
শত লোক ইঁহার নিকট আসিয়া থাকে। তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিয়া যথাসম্ভব প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। সমস্ত কার্য্যের মধ্যে বিবিধ পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধবিশেষ পাঠ ও সমালোচনা ইঁহার প্রীতিপদ কার্য্য। ইহাতেই ইনি অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। নাটক, নভেল প্রভৃতি কোনও লঘু গ্রন্থ ইঁহার আসন স্পর্শ করিতে কেহ কখনও দেখিতে পায় না। ইনি সর্ব্ববিধ চিকিৎসা-পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকা ও যাহাতে বিজ্ঞান, রসায়ন বা কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধাদি থাকে সেইরূপ পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন। এমন কি, উল্লিখিত বিশ্রাম-সময়ের মধ্যেও অধিকাংশ সময় পূর্ব্বোক্ত প্রকার পুস্তক-পাঠেই ইঁহার অতিবাহিত হয়। কোনও নূতন ঔষধের আবিষ্কারে, কোনও রোগের নূতন প্রাদুর্ভাব অথবা চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে অনেক সময়ে নিজ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুযোগ্য এম, বি ডাক্তার বাবুর সহিত আলোচনা করেন। মধ্যে মধ্যে নিজ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক এবং আগন্তুক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত আর্য্যশাস্ত্রবিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহার বুদ্ধির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা, অচল অধ্যবসায় এবং সর্ব্বদা চিকিৎসাবিষয়ক প্রবন্ধাদির অনুশীলন-ফলে এরূপ অসাধারণী প্রতিভার উৎপত্তি হইয়াছে যে, যে কোন সময়ে যে কোনও রোগীর রোগের বিবরণ শুনিবামাত্র আশুপ্রতিকার্য্য রোগের বিবরণ শুনিবামাত্র রোগ-নিবারণে সমর্থ ঔষধের ব্যবস্থা মুখে মুখে করিয়া দেন। ইঁহার ঔষধ-নির্ব্বাচনে বিশেষত্ব এই যে, নির্ব্বাচিত ঔষধ দুর্ম্মূল্য বা দুর্লভ হয় না; প্রচলিত মুষ্টিযোগের ন্যায় রোগীর অনায়াসলভ্য হইয়া থাকে। বিপন্ন ব্যক্তিমাত্রের প্রতি ইঁহার দয়া থাকিলেও রোগীর প্রতি দয়া অসাধারণ। যখন জার্ম্মান যুদ্ধের পর "ওয়ারফিভার" বা "ইনফ্লুয়েঞ্জা" জ্বরের উপদ্রবে এদেশের প্রতিগৃহ শ্মশানে পরিণত হইতেছিল, সে সময়ে এই মহাত্মা পার্শ্ববর্ত্তী অন্যূন ৫০খানি

গ্রামে বহু চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত করিয়া বিনামূল্যে প্রতি-গৃহে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসা দ্বারা শত শত লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে মহামারী উপস্থিত হইলে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাসহকারে চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত করিয়া অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে শত শত লোকের উদ্ধারসাধন করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার সৌজন্যও অসামান্য। ইঁহার নিকটে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত যে কোন প্রকার লোক আসুক না কেন, ইনি তাহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের সহিত সহাস্যবদনে যথোচিত আলাপ করিয়া থাকেন।

ইঁহার শারীরিক কৃশতা ও দুর্ব্বলতার জন্য ইঁহার পিতা বা অগ্রজদ্বয় ইঁহাকে উচ্চশিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করান নাই। প্রাইভেট শিক্ষকের সাহায্যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিষয়ে কেবল জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য পরিচালনোপযোগী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করাইয়াছিলেন। অগ্রজদ্বয় ইঁহার কার্য্য-দক্ষতায়, ন্যায়পরতায় ও বিশ্বস্ততায় বিমুগ্ধ হইয়া ২০ বৎসর বয়সে ইঁহারই উপর এষ্টেটের কার্য্যভার নিহিত করিয়া চিরজীবন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন। এমন কি বিভক্ত হইবার পরেও ইঁহার কনিষ্ঠাগ্রজ বিদ্যানিধি মহাশয় ৺কাশীধামে বাস করিবার সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রগণ থাকা সত্ত্বেও নিজ এষ্টেটের যাবতীয় দায়িত্বযুক্ত কার্য্য অন্যনিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত ইঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। বিভক্ত হইবার পরেও অন্ততঃ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি ইজমাল্ এষ্টেটের কার্য্য-পরিচালক ছিলেন। ইজমাল্ এষ্টেটের যে সম্পত্তি তাহাও একটী আঢ্য জমিদারের জমিদারী অপেক্ষা অল্প নহে। ইনি এখনও দেশের কল্যাণকর অশেষবিধ কার্য্যে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিয়াও নিজের সুবিশাল এষ্টেটকে শান্তিময় করিয়া অবলীলাক্রমে চালাইতেছেন। এরূপ একটী এষ্টেট্ চালাইবার নিমিত্ত কখনও ম্যানেজার-নিয়োগের কল্পনাও করেন

নাই, যেন মন্ত্রশক্তিতে যথাযথ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া যাইতেছে। ইহার মোকদ্দমার প্রতি একান্ত বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় মোকদ্দমা মিটাইয়া লইবার জন্য নিজের যাহা ন্যায়তঃ প্রাপ্য তাহাও ছাড়িয়া দেন।

ইনি এষ্টেটের ভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তা-বলে স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অনুশীলন করিয়া ডাক্তারখানা স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রোগিগণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন, চিকিৎসা জন্য ইঁহার যশঃও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

এষ্টেট্ বিভাগের পরেই দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য একটী প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে একজন নেটিভ ডাক্তার ও কম্পাউ-ণ্ডার প্রভৃতি নিযুক্ত করেন এবং আবশ্যকীয় ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ বহু অর্থব্যয়ে ক্রয় করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইহাতে বহু রোগিণী ও রোগীগণের অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া একজন উপযুক্ত স্ত্রী ডাক্তার নিয়োগ করতঃ নেটিভের পরিবর্ত্তে একজন বিচক্ষণ ও যশস্বী এম, বি ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে আরও অনেক নবাবিষ্কৃত অস্ত্র এবং যন্ত্রসমূহ আনাইয়াছেন। ঐ ডাক্তারখানায় গড়্পড়্তায় দৈনিক কিঞ্চিন্ন্যূন আড়াই শত করিয়া রোগী হয়। ইহাতে ৪জন হইতে ৬জন কম্পাউণ্ডার কার্য্য করেন। যখন যে কোনও সিভিল-সার্জন ডাক্তারখানা দেখিতে আসিয়াছেন তখন তাঁহাকে এই মন্তব্য লিখিয়া যাইতে হইয়াছে যে, "মফস্বলের কোনও ডাক্তারখানাতেই গঙ্গাধর চেরিটেব্‌ল ডিস্পেন্‌সারীর মত এত অধিক রোগীর সমাগম ও এরূপ অতিরিক্ত ঔষধব্যয়, এবং মূল্যবান্ ঔষধ ও যন্ত্রসমূহের সংরক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখি নাই।"

আরও ইঁহার বহুদর্শী কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ নন্দ মহাশয় স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করেন। ইঁহার নিকটে অনেক

সন্দিগ্ধ-জীবন দুরারোগ্য রোগীও আরোগ্যলাভ করিয়াছে। অন্যান্য চিকিৎসকের চিকিৎসায় যে সকল রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, ইনি তাদৃশ রোগীসকলকে চিকিৎসা করিয়া অধিকাংশ স্থলে আরোগ্যলাভ করাইয়া থাকেন। ইঁহার চিকিৎসা-বিষয়ণী বুদ্ধি অসাধারণ, ইঁহার নিকটেও দৈনিক প্রায় একশত রোগী চিকিৎসিত হয়।

এই গঙ্গাধর নন্দ মহাশয় নিজ মাতা সুধাময়ী দেবীর নামানুসারে "সুধা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়" নাম দিয়া একটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপন করতঃ তাহাতে একজন সুচিকিৎসক নিয়োগ করিয়া বহু রোগীকে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন।

ইঁহার নিজবাড়ী মুগবেড়্যা হইতে বি-এন আরের "কণ্টাই রোড ষ্টেশন" অন্যূন ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী। ঐ ষ্টেশনের অত্যন্ত সন্নিহিত বেলদা গ্রাম ঐস্থানে বা উহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যূন ২০ মাইল ব্যাপী স্থানে কোনও প্রকার শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না। ইনি তত্রত্য অধিবাসীগণের শিক্ষা-সৌকর্য্য-সাধনের নিমিত্ত "বেল্‌দা গঙ্গাধর একাডমি" নামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার জন্য বিশাল ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছাত্রাবাসে ১০ জন শিক্ষক সহ শতাধিক ছাত্র সর্ব্বদাই থাকে।

ইঁহার বাড়ী হইতে ২০ মাইল দূরে "কাঁথি বেল্‌দা" রাস্তার উপরেই "ললাট্" নামক একটী গ্রাম আছে। সেখানেও তন্নিকটে কিংবা দূরে কোনও বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ না থাকায় এই বিদ্যোৎসাহী দয়ার্দ্রহৃদয় মহাত্মা এই গ্রামে "ললাট গঙ্গাধর পাঠশালা" নামক একটী এম, ই স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

নিজ গ্রামে ইঁহার অগ্রজ "বিদ্যানিধি" মহাশয়ের প্রতিষ্ঠাপিত এম, ই স্কুলটীকে উক্ত মহাত্মা বহু অর্থব্যয় করিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'মুগবেড়্যা গঙ্গাধর হাইস্কুল' নামে একটী বিশিষ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে
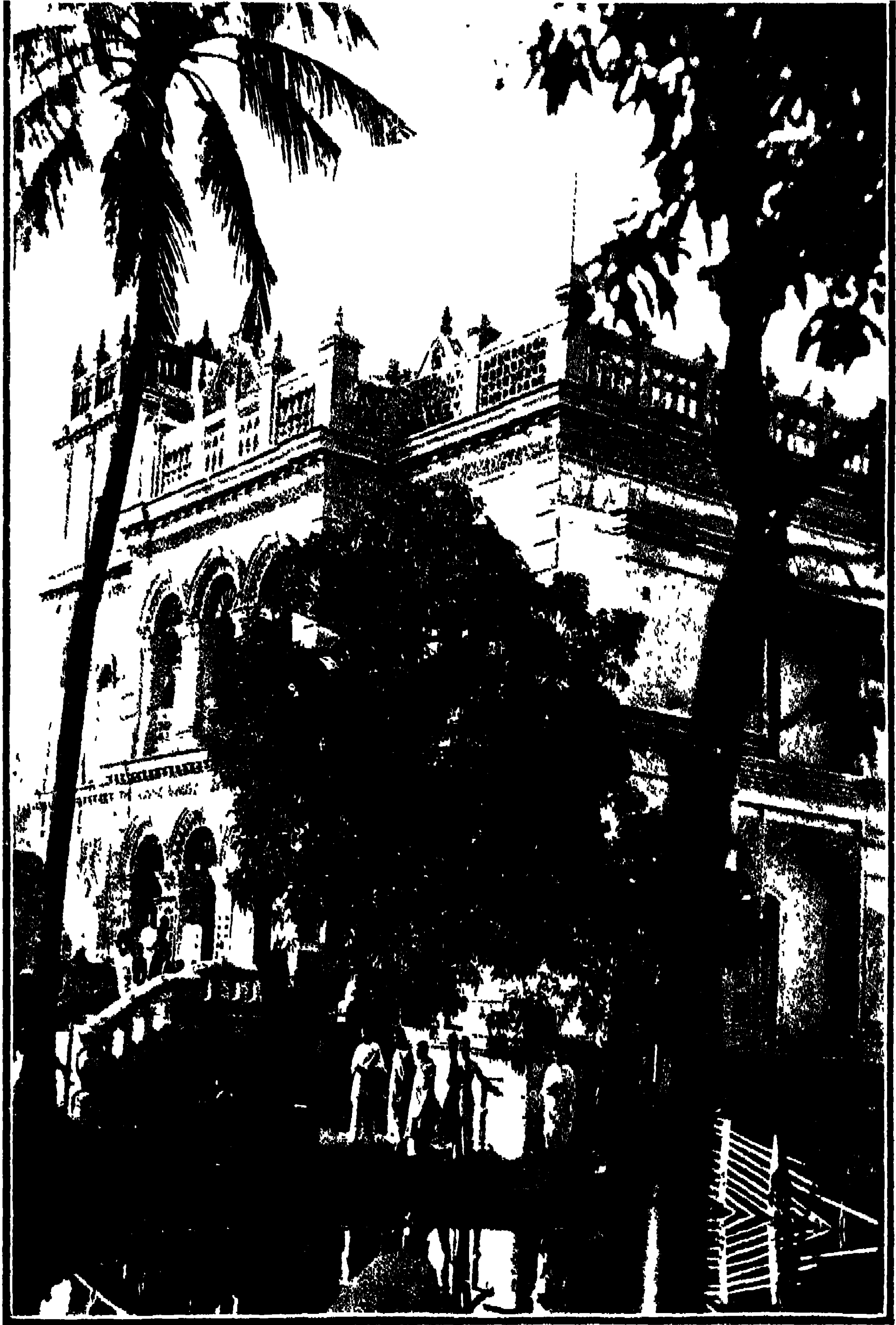
শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ মহাশয়ের প্রাসাদ।

শ্রীযুক্ত শৈলজাচরণ নন্দ

পরিণত করিয়াছেন এবং বৃহদাকার ছাত্রাবাসও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে ৫০ জনের অধিক ছাত্র প্রায়শঃ থাকে। এই স্কুল সংশ্লিষ্ট একটী সুপ্রশস্ত লাইব্রেরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বহুমূল্য রাশি রাশি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

স্থানীয় বালিকাগণের শিক্ষার জন্য হাই স্কুলের নিকটে একটী পৃথক্ অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

এই হাই স্কুল্ সংলগ্ন একটী "টেক্‌নিক্যাল" বিভাগেরও স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে অনেকগুলি ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া সূত্রোৎপাদন, বস্ত্রবয়ন, ছুতারের ও কামারের কার্য্য এবং সূচিশিল্পবিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এই শিল্পাগারে পূর্ব্বোক্ত শিল্পশিক্ষোপযোগী বহু যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

ইনি বিভক্ত হইবার কিছুকাল পরেই ইঁহার পিতৃ-প্রতিষ্ঠাপিত সুদীর্ঘকালাবধি পরিচালিত মুগ্‌বেড়্যা চতুষ্পাঠী নামক সংস্কৃত বিদ্যালয়-টীকে আয়তনে ও ছাত্র-সংখ্যায় দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া এক্ষণে পিতারই নামে "মুগবেড়্যা ভোলানাথ চতুষ্পাঠী" নামে বিখ্যাপিত করতঃ ইহার সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ঐ চতুষ্পাঠীতে ২০ জন বৈদেশিক ছাত্রের যাবতীয় ভোজ্যাদি ও বাসস্থানের ব্যয়ভার ইনি বহন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত একজন সুদক্ষ অধ্যাপক, একজন সহকারী অধ্যাপক, এক জন পাচক ব্রাহ্মণ এবং চাকরের বেতনাদি সমস্ত ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত দেশের মধ্যে কত স্থানে নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; কোথাও বা বিদ্যালয়ের কপাট, চৌকাট, জানালা, চেয়ার ও বেঞ্চ প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন; অথবা কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের

অসম্পূর্ণ বেতন পূরণ করিয়া আসিতেছেন এবং এই জেলায় কয়েকটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর পুস্তক ক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়াছেন।

ইঁহার বাড়ী হইতে কাঁথি সহর ২০ মাইল দূরবর্ত্তী। সেই কাঁথিতে "প্রভাতকুমার কলেজ" স্থাপনের জন্য ইনি অকাতরে ১০,০০০্ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ফলতঃ শিক্ষাব্যাপারে যে ইঁহার কত অর্থ নিয়োজিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইঁহার প্রতিষ্ঠাপিত ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে ইনি প্রায় সমস্ত দরিদ্র ছাত্রের বেতন ও ভোজ্যাদির ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। সেই হেতু যখন নন্-কোঅপারেশনের হুজুগে বিদ্যালয়-বয়কটের আন্দোলনে দেশ প্লাবিত হইতেছিল এবং তাহার ফলে এ অঞ্চলের যাবতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল তখনও ইঁহার বিদ্যালয়সমূহের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় নাই। ইঁহার প্রতিষ্ঠাপিত ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারু-রূপে পরিচালিত হইতেছে। সেই হেতু বহুবর্ষাবিচ্ছেদে পরীক্ষাফল সন্তোষজনক হওয়ায় ঐ সকল বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে স্থানপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি ভিন্ন শিক্ষার্থীগণের সম্বন্ধে ইঁহার ব্যক্তিগত দানও অসাধারণ। যে কোনও শিক্ষার্থী ইঁহার নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে, ইনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহার নিকট হইতে কোনও সাহায্যার্থীকে রিক্তহস্তে প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই। ইঁহার অর্থ ও উৎসাহে দেশের কত লোক যে কত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দানবীরের দানসমূহ কখনও ইঁহার সুমধুর সদুপদেশপূর্ণ বাক্যাবলীর সাহচর্য্য-বর্জ্জিত নহে। কাঁথি সহরে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে একটী বিস্তৃত পাঠাগার ষট্‌সহস্রাধিক মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তথাকার হরিসভা গৃহ

নির্ম্মাণ, হিন্দু বালিকা বিত্থালয়, ব্রাহ্ম বালিকা বিত্থালয়, মডেল স্কুল, ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা কেন্দ্র ও সংস্কৃত আত্ম, মধ্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে প্রয়োজনীয় অর্থের আংশিক ভার ইনি বহন করিয়া আসিতেছেন। কাঁথিতে এমন কোনও শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই যাহাতে ইঁহার অর্থসাহায্য, বহুল পরিমাণে গৃহীত হয় নাই।

১৩২০ সালের ভীষণ বন্যায় কাঁথি মহকুমার অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হওয়ায় অধিবাসীগণের দুর্দ্দশা চরম সীমায় উঠিয়াছিল। উনি সে সময়ে সরকারী সাহায্য ফণ্ডে বহু সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন এবং দেশের মধ্যে নানাস্থানে ইঁহার যত গোলাঘর ছিল, দুঃস্থ দেশবাসীগণের সাহায্যকল্পে সে সকল উন্মুক্ত করিয়া শস্যশূন্য করিয়া দিয়াছিলেন। এসময়ে তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকা দেশে বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই দুর্বৎসরে দেশবাসীগণ যদি ইহাঁর আনুকূল্যভাগী না হইত, তবে কত শত দরিদ্রকে যে অন্নাভাবে প্রাণ হারাইতে হইত এবং কত মধ্য-বিত্তকে যে বাস পর্য্যন্ত হারাইতে হইত, তাহার ইয়ত্তা থাকিত না।

উল্লিখিত বন্যা অপেক্ষাও অতি ভীষণ ১৩৩৩ সালের বন্যাতেও ইনি দেশবাসীগণের পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সাহায্য করিয়াছেন। অধিকন্তু ২৫খানি গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীবর্গকে ৬ মাসের অধিক কাল নিয়মিত ভাবে চাল ও ডাল বিতরণ করিয়াছেন। কি সরকারী সাহায্য ফণ্ড, কি অন্যান্য সাহায্য ফণ্ড, সকল সাহায্য ফণ্ড অপেক্ষা ইঁহার সাহায্য ফণ্ডে চাল ও ডালের মাত্রা অধিক ছিল। এতদ্ব্যতীত ইনি বহু বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করিয়াছেন। এই সময়ে ইঁহার নিযুক্ত ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারগণ রোগীগণের গৃহে গৃহে যাইয়া ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিয়াছেন।

ইনিই মুগবেড়িয়া হিতসাধনভাণ্ডার নামে একটী সুনিয়মে পরিচালিত ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অনাথ ও বিপন্ন ব্যক্তিগণের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে।

ইঁহারই আন্তরিক চেষ্টা ও বহুল অর্থে "মুগবেড়িয়া কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী" নামে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি জেলার মধ্যে সমস্ত সমিতি অপেক্ষা প্রধান হইয়াছে বলিয়া উপর্য্যুপরি কর্ত্তৃপক্ষের রিপোর্টে প্রকাশ পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত কাঁথি মহকুমার অধিকাংশ স্থানে ইনি অদম্য উৎসাহ ও যত্নসহকারে এ পর্য্যন্ত শতাধিক "কো-অপারেটিভ্ সোসাইটী" স্থাপন করিয়া দেশবাসীর অশেষ উপকার সাধিত করিতেছেন।

মেদিনীপুর "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক" হইতে টাকা আদান-প্রদানে অসুবিধা হওয়ায় ইঁহারই সম্পূর্ণ উদ্‌যোগ ও তত্ত্বাবধায়কতায় মুগবেড়িয়ার ব্যাঙ্কটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পরিণত হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী শতাধিক ঋণ-দান সমিতির অর্থের আদানপ্রদান বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে ৩,০০,০০০ তিন লক্ষের অধিক টাকার কারবার চলিতেছে।

অক্লান্তকর্ম্মা এই মহাপুরুষ ডাক্তারখানা, স্কুল, চতুষ্পাঠী ও সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ঐ সকল বিভাগের কার্য্য নির্দ্দোষভাবে সম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য অনুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

কলিকাতা, মেদিনীপুর ও পুরীধাম প্রভৃতি স্থানের শত শত যাত্রী কণ্টাই রোড্ ষ্টেশনে রেলে উঠিবার নিমিত্ত বেল্‌দাবাজারে আহার ও বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঐ স্থানে পানীয় জল ও আহার্য্য দ্রব্য এবং ভদ্রলোকের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানের একান্ত অভাব থাকায় সকলেরই কষ্টের একশেষ হইত। আমাদের দেশের গৌরববর্দ্ধক ও পরদুঃখকাতর এই মহাত্মা সেই সকল অভাব উপলব্ধি করিয়া একটী স্বাদু জলপূর্ণ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করতঃ তাহাতে পাষাণময় সোপান-শ্রেণী-শোভিত একটী সুবৃহৎ ঘাট প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে একটী চাঁদনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের

শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ নন্দ ও
তাঁহার তিন পুত্র ও কন্যা

ক্রয়বিক্রয় মুখরিত একটী বাজার স্থাপন করিয়াছেন এবং ভদ্রলোকের থাকিবার উপযোগী একটী রম্য অট্টালিকা ধর্ম্মশালার জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেখানে ইহার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস-স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

বি এন্ আর রেলে যাইবার নিমিত্ত প্রতিদিন কণ্টাই-বেল্‌দা রোডে ও অন্যান্য পথে আগত শত শত যাত্রীকে বেল্‌দাবাজার হইতে প্রায় এক মাইল পথ ঘুরিয়া ষ্টেশনে যাইতে হইত। উক্ত মহাত্মা যাত্রিগণের এইরূপ অসুবিধা নিবারণের জন্য অনেকের জমি উচ্চতর মূল্যে ক্রয় করিয়া ক্ষতি-স্বীকার করতঃ ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের সাহায্যে ষ্টেশনে যাইবার নিমিত্ত একটী প্রশস্ত পথপ্রস্তুত করিয়া দেওয়ায় প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পথ কমিয়া গিয়াছে। লেখা বাহুল্য যে,ইহাতে যাত্রিগণের খুব সুবিধা হইয়াছে।

ইনি ৺কাশীধামে দুইখানি ও ৺পুরীধামে একখানি বৃহদাকার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া পান্থশালার নিয়মানুসারে যথাযথ কর্ম্মচারী নিয়োগ করতঃ তীর্থযাত্রিগণের ঐ সকল তীর্থে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বাস করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

ইনি সাধারণ তীর্থযাত্রী এবং সাধু অতিথিগণের বিশ্রামের জন্য বেলদা বাজারের পশ্চিমাংশে একটী পুষ্করিণী খোদিত করিয়া একটী স্বতন্ত্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আরও ইনি দেশের মধ্যে যেখানে যেখানে পানীয় জলের অসুবিধার বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন সেই সেই স্থানে নূতন পুষ্করিণী খনন বা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া পাকাঘাট বাঁধিয়া দিয়াছেন। অনেক স্থানে বহু লোকের যাতায়াত-মার্গে উপযুক্ত স্থানে পুল না থাকায় পথিকগণকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইত। এই মহাত্মা সেই সেই স্থানে কতকগুলি কাষ্ঠময় সুদৃঢ় স্থায়ী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ইনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়েকটী ইষ্টকময় দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং সে সকলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর স্বদেশে ও বিদেশে কত লোকের মন্দিরাদি সংস্কারের জন্য যে কত অর্থ ব্যয়িত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইতিমধ্যে নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ গোস্বামী পণ্ডিত তাঁহার একটী প্রাচীন জীর্ণ মন্দির সংস্কারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে উঁহাকে নগদ ২০০৲ টাকা দিয়া বলেন, ইহাতে পর্য্যাপ্ত না হইলে আমাকে জানাইলে আরও কিঞ্চিৎ সাহায্য করিব। ইহার এ জাতীয় দান বিরল না হইলেও বাহুল্যভয়ে একটীমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। এতদ্ব্যতীত ইঁহার উল্লেখযোগ্য অশেষ সৎকার্য্য আছে। তন্মধ্যে দুই একটী মাত্রের উল্লেখ করিয়া এই জীবনবৃত্তের উপসংহার করিব।

মুগবেড়িয়া হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী বজরপুর পরগণা একটী তালুক-দারী মহাল। এই মহালটী অত্যন্ত গভীর। এই মহালের মালিক-গণের পরস্পর মতভেদ ঘটায় বহু বৎসর যাবৎ উক্ত মহালের জলরোধ-কারী বাউণ্ডারী বাঁধের সংস্কারকার্য্য না হওয়ায় অনেক স্থলে ঐ বাঁধের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। সেই হেতু পর পর কয়েক বর্ষা-বিচ্ছেদে বন্যার জলে শস্যনাশ ঘটায় এবং বর্ষার প্রারম্ভ হইতেই কোনও প্রকার জলযান ব্যতীত কাহারও প্রতিবেশীর বাড়িতে পর্য্যন্ত যাতায়াতের সম্ভাবনা না থাকায় পলায়িতাবশিষ্ট প্রজাগণের দুর্দ্দশা চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পর করুণহৃদয় এই মহাত্মা প্রজাগণের দুরবস্থা দূরীকরণের নিমিত্ত পরস্পর বিবদমান মালিকগণের সম্মতিক্রমে অন্যূন ১০,০০০ দশ হাজার টাকার তাৎকালিক ব্যয় যোগাইয়া উক্ত তালুকের বাঁধ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সেই বজরপুর প্রজাগণের কামধেনুতে পরিণত হইয়াছে।

মুগবেড়িয়া হাইস্কুল-সংশ্লিষ্ট টেক্‌নিক্যাল বিভাগ স্থাপনের বহুপূর্ব্বে

বাড়ির নিকটে একটী বৃহদাকার বস্ত্রবয়নাগার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অনেকগুলি তাঁত স্থাপন করতঃ বহুলোক নিযুক্ত করিয়া বস্ত্রবয়নকার্য্য প্রশংসিত ভাবে চালাইতেছেন। ঐ সকল তাঁতে চরকাকাটা সূতায় ও বিলাতী সূতায় মোটাও মিহি বস্ত্রের বয়নকার্য্য সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইতেছে এবং এই বয়নাগারে বহুলোক শিক্ষালাভ করিয়া সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। এই মহাত্মা দেশে বহুপরিমাণে সূত্রোৎপাদন এবং কতকগুলি দরিদ্র ও অকর্ম্মণ্য লোকের জীবিকা সংরক্ষণের নিমিত্ত যাহাতে অধিকসংখ্যক চরকার প্রচলন হয় সে জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

এই দানবীর ও কর্ম্মবীরের দান ও সৎকার্য্যের অসাধারণতা এই যে, ইহার দান বা সৎকার্য্য সংবাদপত্রে ঘোষিত হইবার নিমিত্ত কখনও কাহারও ইঙ্গিত লাভ করে না। সৎকার্য্যের ঘোষণা বিষয়ে এই দাতা ও কর্ম্মীর প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাই ইঁহার সৎকার্য্যাবলী অধিকাংশ সময়ে নীরবে সম্পাদিত হয়। ইঁহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ বলিতে পারা যায় যে, ইঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,মধুভাষী,স্বদেশহিতৈষী, অক্লান্তকর্ম্মা, পরোপকারী, বহুদর্শী, ত্যাগশীল ধৈর্য্যবান্, আড়ম্বরহীন, সংযমী ও দূরদর্শী মহামহিমাশালী পুরুষ এ সংসারে অত্যন্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহার দূরদর্শিতা বিষয়ে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ইঁহার বয়স যখন ২৬ বৎসর তখন হইতেই ইঁহার অলৌকিক সৌভাগ্যশালিনী মহাকুলীনা পতিব্রতা পত্নী শ্রীমতী মোক্ষদাদেবী প্রিয়তম পতিদেবতাকে স্বদেশপ্রেমিক দেখিয়া আত্মার্পিত প্রেম প্রত্যর্পণে একমাত্র স্বদেশপ্রেমিক করাইবার নিমিত্তই যেন দুইটী মাত্র শিশুসন্তান রাখিয়া নিয়তির কঠোর আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ স্বর্গগামিনী হইয়াছেন। এইরূপ অসাময়িক ও অভাবনীয় দুর্ঘটনায় মনুষ্য-

মাত্রের অধীরতা স্বাভাবিক হইলেও অলৌকিকচরিত্র এই মহাপুরুষের শোকাকুলতা বাহিরে কিঞ্চিৎমাত্রও প্রকাশ পায় নাই। কিছুকাল পরে ইঁহার নিরতিশয় ভক্তিভাজন অগ্রজদ্বয় এবং দেশ-বিদেশের বহু সম্ভ্রান্ত লোক পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের জন্য বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেও ইনি দৃঢ়তাসহকারে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইঁহার যেমন অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য এবং যেরূপ অল্প বয়সে পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছিল তাহাতে উনি যদি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে ইঁহার কার্য্য অযৌক্তিক হইয়াছে বলিয়া কেহ মনেও স্থান দিত পারিত না। কিন্তু ইনি সকলেরই অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ বিবাহ না করিয়া কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী যোগিজনের ন্যায় দেশহিতানুধ্যায়ী হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন।

ভট্টপল্লী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, জমিদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নন্দ মহাশয়ের অন্যান্য বিষয়ে দূরদর্শিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইঁহার যে অবস্থায় পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছিল সে অবস্থায় দুইটী মাত্র শিশুসন্তান থাকার জন্য দারান্তর পরিগ্রহ না করাই তাঁহার অপরিসীম দূরদর্শিতাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

পত্নীবিয়োগের পর ইঁহার দুইটী শিশুসন্তান পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ধাত্রীগণের প্রযত্নাতিশয়ে পালিত হইয়া শিক্ষাগ্রহণ-যোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে ঐ দুইটী পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পড়িবার জন্য কলিকাতায় রাখিবার সুব্যবস্থা করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শৈলজাচরণ নন্দ মহাশয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় আস্থাহীন হইয়া সঙ্গীতশিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হন এবং তাহাতে সাফল্যলাভ করেন। ইঁহার কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে। ইনি দয়ালু, সহৃদয়, মধুরভাষী, পরোপকারী, উৎসাহশীল, তীক্ষ্নবুদ্ধিশালী, ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্গীত-

বিদ্যাবিশারদ ও অমায়িক ব্যক্তি। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ নন্দ মহোদয় গুণে কনিষ্ঠ নহেন। ইনিও বুদ্ধিমান্, পরোপকারী, অধ্যবসায়শীল, তেজস্বী, স্পষ্টবাদী, নানাশাস্ত্রানুশীলনকারী ও আর্য্যধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান্। ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্তি করিয়া কলিকাতার ২।৩ জন সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন করতঃ উক্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। ইনি নিত্য শতাধিক রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করেন। ইঁহার চিকিৎসাগুণে বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে ও করিতেছে। ইনি উপনিষদ্, বেদান্ত, তন্ত্রশাস্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া বহুরহস্য অবগত হইয়াছেন। ইনি নিত্য নৈমিত্তিক যাবতীয় পূজা স্বয়ং স্বহস্তে করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যে সবিশেষ অভিনিবিষ্ট না হইলেও ইঁহার সুবিশাল জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্য-পরিচালনোপযোগিনী বুদ্ধি যথেষ্টই আছে। ইঁহার তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় নন্দ অল্পবয়স্ক হইলেও অসাধারণ শক্তিশালী, নির্ম্মলচরিত্র, গুরুজন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্। অতুলনীয় পিতৃপৈতামহ ঐশ্বর্য্য, স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ এবং অসাধারণী বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি গুণ থাকা সত্ত্বেও এই বালকের বিনয়নম্রতা, শিষ্টাচার-প্রতিপালন, সরলতা এবং সমস্ত বিষয়ে আড়ম্বরশূন্য ব্যবহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই মোহিত করিয়াছে। এই বালক স্বনামধন্য পিতামহের প্রতিষ্ঠাপিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতঃ ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাউথ্ সুবার্ব্বণ কলেজে আই এস্ সি ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। ইঁহার সংস্কৃতশিক্ষা বিষয়েও অসাধারণ অনুরাগ। তাহারই ফলে মধ্যে মধ্যে কাব্যের অনুশীলন করতঃ কাঁথি সংস্কৃত সমিতিতে কাব্যের আদ্য

পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং এই অবস্থায় সংস্কৃত গদ্য পদ্য রচনায় আশাতীত উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে।

বংশতালিকা।
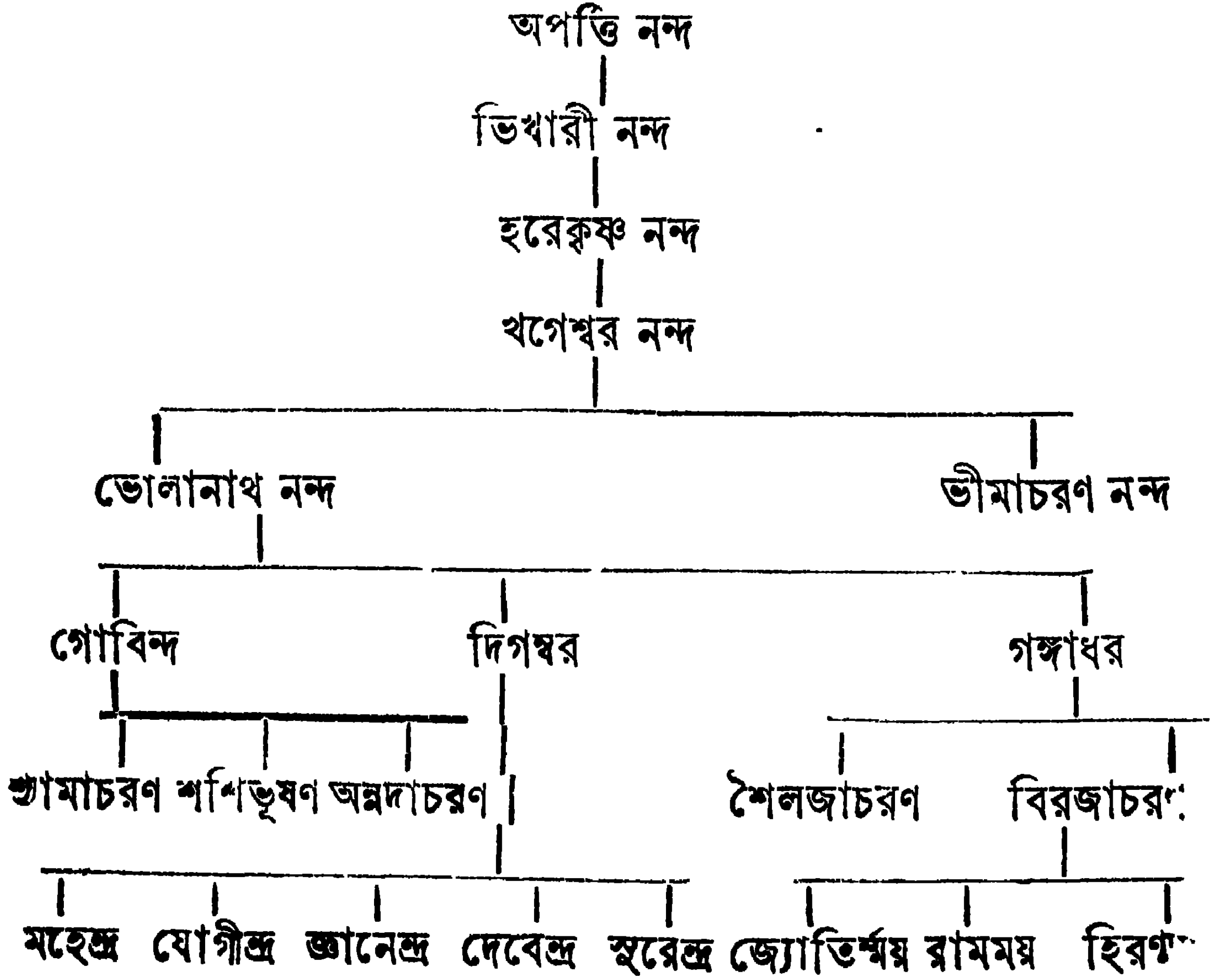
শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় ভরদ্বাজ গোত্রজ,খড়দহর মুখুটী, যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান। আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রীহর্ষ হইতে ইনি ৩২শ পুরুষ। ইঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুর থানার অধীন ধুলুক গ্রামে। পূর্ব্বে ইহা একটী গণ্ডগ্রাম ছিল। এককালে ঐ গ্রামে ৮।৯টী টোল ছিল। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে উক্ত ধুলুক গ্রামের অন্যতম পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সন ১২৭২ সালে ধুলুক গ্রামে প্রথম ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হয়। তাহাতে গ্রামে যে মহামারী উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। এক এক দিন গ্রামে ১৫।১৬ জন করিয়া লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। অল্পদিন মধ্যেই গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠে। গ্রামে যে কয়টী টোল ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে গ্রামে একটী মাত্র টোল থাকে। শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ বাবুর জ্যেষ্ঠ মাতামহ ৺ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ টোলের অধ্যাপক ছিলেন। ৩০ বৎসরের কিছু অধিক হইল, ৺ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রামে সংস্কৃতচর্চ্চা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। এককালে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এখন প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। সেওড়াফুলির রাজবংশের স্থাপিত শ্রীশ্রী৺কাত্যায়নী প্রভৃতি কয়েকটী দেবীমূর্ত্তি এই গ্রামে ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের সেবা পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, এখন তাহাও প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ম্যালেরিয়ায় প্রথম প্রকোপ বিস্তারের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ সন

১২৭৩ সালের ২৭শে ভাদ্র তারিখে উক্ত ধুলুক গ্রামে শ্রীহর্ষবাবু জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীহর্ষবাবুর জন্মগ্রহণের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ ৺পার্ব্বতী-চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়। ৺পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি নিরীহপ্রকৃতি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি কর্ম্ম উপলক্ষে স্থানান্তরে যাইয়া কখন থাকিতে পারেন নাই। যে সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল তাহার আয় হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীহর্ষ বাবুর পিতা ৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তিনি অতি যত্নে উক্ত সন্তানকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমতঃ হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তথায় Junior Scholarship পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর অধিক-দিন অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। তিনি কাপ্তেন রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। Thwates সাহেব সেই সময় হুগলী কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কাপ্তেন রিচার্ডসনের প্রিয়পাত্র থাকায় ৺শ্রীরাম বাবু Thwates সাহেবের কিছু বিরাগভাজন হয়েন। ৺শ্রীরাম মুখো-পাধ্যায় ইংরাজী শাস্ত্রে সবিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সেক্সপিয়ারের নাটকগুলি তাঁহার বিশেষরূপে পড়া ছিল। তিনি তৎকালে অনেক সংবাদপত্রে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। ৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় আলিপুরে ওকালতী করিতেন ও খিদিরপুরে ভূকৈলাসে তাঁহার বাসা ছিল। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যৎকালে ভারত-সঙ্গীত লিখিয়া হেমবাবু কিছু বিপদগ্রস্ত হয়েন, তখন ৺শ্রীরামবাবু হেমবাবুর নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি হেমবাবুর কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং শ্রীহর্ষ বাবু সেই সময় হইতেই হেমবাবুর ও রঙ্গ-লাল বাবুর কবিতাসকল পাঠ ও অভ্যাস করিতে থাকেন। ৺শ্রীরাম

মুখোপাধ্যায় অতি উদারপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে ভূকৈলাস রাজপরিবারের বাড়ীতে শিক্ষকতা কার্য্য করায় ভূকৈলাস রাজপরিবারের সকলের সহিত বিশেষ তৎকালের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর ও কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষালের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হয়। সেই সুযোগে স্বগ্রামবাসী অনেকের উক্ত রাজসংসারে নানা প্রকার চাকরি আদি করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি বিশেষরূপে ইংরাজী-শিক্ষিত হইয়াও ইংরাজীভাবাপন্ন হন নাই। দেশস্থ বহুতর লোক অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার ভূকৈলাসের বাসায় যাইতেন ও সকলেই তাঁহার বাসায় পরম যত্ন ও আদর-আপ্যায়ন পাইতেন। তাঁহার দেশের জোত জমার মধ্যে মগদম সাহেবের অধীনে বার্ষিক ৵১০ পয়সার একটী মোকররী জমা ছিল। মগদম সাহেবের সেবাইত বৎসরে একবার উক্ত খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত ভূকৈলাসে যাইতেন এবং যাইয়া প্রাপ্য খাজনা ব্যতীত যাতায়াতের গাড়ীভাড়া ও বস্ত্রাদি পাইতেন। ৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের কখন অর্থস্বাচ্ছল্য ছিল না। তিনি যে প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে অর্থ সঞ্চয় করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তিনি তাদৃশ অর্থশালী না হইলেও তৎকালীন সকল প্রকার লোকহিত-কর কার্য্যে যোগ দিতেন এবং আপন পুত্রদিগকে নানা প্রকার সৎশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। তৎকালে বড়িশা-বেহালার হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিচালিত হইত। প্রতি বৎসর উক্ত সভার বাৎসরিক অধিবেশন ও উৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত আপন সন্তানগণকে লইয়া যাইতেন। যখন শ্রীমতী রমাবাই সরস্বতী কলিকাতায় আসিয়া টালিগঞ্জে বাস করিতেছিলেন, তখনও তিনি পুত্রগণকে সমভিব্যবহারে লইয়া উক্ত বিদুষীর প্রতিভা দেখাইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসাদি করিয়া ও হরিসভার উপকারিতা আদি বুঝাইয়া সন্তানগণের বিদ্যালাভের বাসনা

ও ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বয়ং পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেন। ৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন ১২৮৮ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখে ৫৪ বৎসর বয়সে ভূকৈলাসের বাসা বাড়ীতে পরলোক গমন করেন। ৺কালীঘাটের মহাশ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীহরি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বি-এল পাশ করিয়া প্রথমে আলিপুরে ওকালতী করেন; এখন দিনাজপুরের অধীন রাইগঞ্জে ওকালতী করিতেছেন। এখন তাঁহার বয়ক্রম ৬৫ বৎসর। শ্রীহর্ষ বাবু মধ্যম। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৃতীয়। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি বাবু কলিকাতা Medical College হইতে L. M. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বর্দ্ধমানে ডাক্তারি ব্যবসায় করিতেছেন। কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় বহরমপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ও তথাকার কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি তথায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন-বিষয়ে বহু প্রয়াস পাইয়াছেন এবং এক্ষণে যে অসহযোগিতার (non-co-operation) ভাব দেশে আসিয়াছে তাহা বিস্তার করিবার নিমিত্ত নানা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা আদি করিয়া বহরমপুরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের তাদৃশ স্বাচ্ছল্য না থাকিলেও শ্রীকান্ত বাবু বহরমপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীহরিবাবুকে Presidency Collegeএ পড়াইতেন ও তাঁহার পাঠাভ্যাসের সহায়তা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সাধ্যাতীত ব্যয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন ৺শ্রীরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হয় তখন শ্রীহরিবাবু Presidency Collegeএ F. A. ও শ্রীহর্ষবাবু খিদিরপুরে চার্চ্চ মিশনারি সোসাইটীর স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন মাত্র; আর দুই ভ্রাতা তখন শিশু। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান

কন্যা তখন নিতান্ত শিশু। ৺শ্রীরামবাবুর মৃত্যুর পর শ্রীহর্ষবাবু ও তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাদের মাতামহ ৺গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বালিগঞ্জ মোকামে ব্যবসা ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন। সেই কারবারের বাড়ীতে থাকিয়া শ্রীহর্ষবাবু সিয়ারসোল রাজ-পরিবারের স্থাপিত সিয়ারসোল ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়িতে থাকেন। শ্রীহর্ষ বাবু তৎকালে উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যাদবকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীহর্ষ বাঁকুড়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যান। তখন ভূকৈলাসের কুমার সত্যশ্রী ঘোষাল বাঁকুড়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট থাকায় শ্রীহর্ষ বাবুর তথায় অনেক উপকার হইয়াছিল। শ্রীহর্ষবাবু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায়, পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এফ-এ পরীক্ষায় ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হন। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক ৺প্রসন্নকুমার লাহিড়ী ঐ সময় মেট্রোপলিটন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ও ৺ এন-এন ঘোষ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। উঁহারা উভয়েই শ্রীহর্ষবাবুকে ভালবাসিতেন। শ্রীহর্ষ বাবু বি-এ পড়িবার সময় অঙ্কশাস্ত্রে Honours পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পুস্তক কিনিবার সাধ্য না থাকায় অগত্যা অবশেষে তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়। যে বৎসর শ্রীহর্ষ বাবু বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সেই বৎসরই শ্রীহরিবাবু বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীপতি বাবুও তখন বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহাদের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। শ্রীহর্ষবাবু এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই সন ১২৯০ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। রাণীগঞ্জের উকীল বাবু বারাণসী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সুতরাং আর অর্থ উপার্জ্জন না করিলে উপায়ান্তর নাই

দেখিয়া শ্রীহর্ষ বাবু চাকুরি খুঁজিতে থাকেন। শ্রীহর্ষ বাবুর কলিকাতা থাকাকালে সে সময় যে সকল সভাসমিতি হইত তাহাতে তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। ঐরূপ একটী সভায় একদিন একটী ভদ্রলোক আপনা হইতে আসিয়া শ্রীহর্ষবাবুর সহিত আলাপ করেন এবং অল্প দিন পরেই তিনি শ্রীহর্ষ বাবুর অভাবের বিষয় অবগত হইয়া ঠনঠনিয়ার লাহা বাবু-দের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া একটী ১০৲ টাকা মাহিনার প্রাইভেট টিউসন যোগাড় করিয়া দেন। উক্ত ব্যক্তির সহিত ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল শ্রীহর্ষ বাবুর দেখা হয় নাই; তাঁহার নামও স্মরণ নাই। সেই সময় খিদিরপুর চার্চ্চ মিশনারী স্কুলে একটী অতিরিক্ত শিক্ষকের কার্য্য খালি হয়। শ্রীহর্ষ বাবু যখন ঐ স্কুলে পড়িতেন তখন উমাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮৮ সালেও তিনি হেড পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীহর্ষ বাবুর পঠদ্দশার সময়ের আরও অন্যান্য শিক্ষকও তখন ঐ স্কুলে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ঐ শিক্ষকগণের অনুগ্রহে—বিশেষতঃ উক্ত উমাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীহর্ষ বাবু উক্ত স্কুলে এক শিক্ষক-তার কার্য্য প্রাপ্ত হন। তখন মিঃ আর এন দে ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার। শ্রীহর্ষ বাবু ১৮৭৪ সালে ঐ স্কুলে প্রথম ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তখন ৺মধুসূদন দাস মহাশয় হেড মাষ্টার ছিলেন। ১৪ বৎসর পরে যখন ঐ স্কুলে শ্রীহর্ষবাবু শিক্ষকস্বরূপে গমন করেন তখন তিনি বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় উক্ত আর এন্ দে ও শ্রীহর্ষ বাবু একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন তাহা অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিল। ইত্যবসরে ৺দুর্গাচরণ লাহা রাজা ও কিছুদিন পরে মহারাজা উপাধি পান। এই সময়ে গার্ডেন রীচ স্কুলে শ্রীহর্ষবাবু যে সামান্য মাহিনা পাইতেন তাহাতে শ্রীহর্ষ বাবুর ও তাঁহার ভ্রাতার খরচ কুলাইত না। অগত্যা আরও প্রাইভেট টিউসন অনুসন্ধান করিতে হইল। হুগলীর প্রফেসর ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালে কলিকাতায় বহুবাজারে

৺ মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ীর নিকটে বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে পড়াইবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজিতেছেন শুনিয়া শ্রীহর্ষ বাবু ঐ পদ পাইবার নিমিত্ত তাঁহার বাড়ীতে যান; তিনি শ্রীহর্ষ বাবুকে বি-এ অনার্স ক্লাসের অঙ্ক সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করেন এবং তাঁহার উত্তরে প্রীত হইয়া তাঁহাকে তাহার পুত্রের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ঐ পুত্রটী তখন এফ এ পড়িতেন। তখন শ্রীহর্ষবাবু ঠনঠনিয়ায় ৮৮নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে থাকিতেন। প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত লাহাবাবুদের বাড়ীতে পড়াইতেন, ১১॥০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খিদিরপুরে পড়াইতেন ও আবার সন্ধ্যার সময় দুই ঘণ্টা বৌবাজারে ঈশানবাবুর বাড়ীতে পড়াইতে হইত। তখন তাঁহার অপর ভ্রাতাগণ খিদিরপুরে থাকিতেন। ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইত। কিছুদিন পরে খিদিরপুরের উক্ত স্কুলে কিছু মাহিনা বৃদ্ধি হওয়ায় কলিকাতার প্রাইভেট টিউসন ছাড়িয়া শ্রীহর্ষবাবু খিদিরপুরে তাঁহার অপর তিন ভ্রাতার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীহর্ষ বাবু বি-এ পাস করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষা দিবার কথা, কিন্তু কলিকাতায় প্রাতে দুই ঘণ্টা, আবার খিদিরপুরে মধ্যাহ্নে ৪ ঘণ্টা ও রাত্রিতে ২ ঘণ্টা পড়াইয়া তাঁহার আইন পড়িবার আর সময় হইত না। অগত্যা ১৮৮৯ সালে বি-এল পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। ১৮৯০ সালে বি-এল পরীক্ষা দেন। বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর একবৎসর মধ্যে ওকালতী আরম্ভ করিতে হয়, না করিলে আর ওকালতী করা চলে না। সুতরাং ১৮৯১ সালের প্রথম ভাগে শ্রীহর্ষবাবুকে মাষ্টারী ছাড়িতে হয়। গার্ডেন রীচ স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ চাকরি ছাড়িবার সময় তাঁহার যেরূপ বিদায়-উৎসব করিয়াছিলেন শ্রীহর্ষ বাবু আজিও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। খিদিরপুরের বন্ধুবর্গ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার ফটো খিদিরপুর লাইব্রেরীতে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া তাঁহার

প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার পর শ্রীহর্ষবাবু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের ধন্যবাদ করেন এবং যৌবনের কত সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত খিদিরপুর অশ্রুপূর্ণনয়নে পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতে আসেন। তখন ওকালতীই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। ইহা স্বাধীন ব্যবসায়, ইহার দ্বারা দেশের লোকের ও নিজেরও উপকার হয়, এই ধারণার বশেই তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন। ইংরেজের আদালতে ওকালতী করিলে ইংরেজ-রাজের সহায়তা করা হয়, সুতরাং আমাদের স্বাধীনতা লাভের আশা দূরপরাহত হয়, এ ধারণা সাধারণ লোকের—অন্ততঃ শ্রীহর্ষবাবুর মনে ছিল না। যাহা হউক, বর্দ্ধমানের ওকালতী আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরে শ্রীহর্ষবাবু সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। ইন্দ্রবাবু তখন বর্দ্ধমানেই ওকালতী করিতেন। বর্দ্ধমানে ওকালতী আরম্ভ করিবার পর এক বৎসরকাল শ্রীহর্ষবাবু কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। তখন বর্দ্ধমানের রাজসরকারে একটী ১২৪৲ টাকা মাহিনার চাকরী খালি হয়। তখন বর্দ্ধমান রাজকলেজের এক সভায় শ্রীহর্ষবাবুর বক্তৃতার পর বর্দ্ধমানের রাজা বনবিহারী কপূর বাহাদুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শ্রীহর্ষবাবু উক্ত চাকরীর নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে উদ্যত হইলে ইন্দ্রবাবু তাঁহাকে নিবারণ করেন। যদিও তখন অর্থাভাবে সংসার চালান কঠিন হইয়াছে, তত্রাচ ইন্দ্রবাবুর উৎসাহ-বাক্যেই শ্রীহর্ষবাবু ওকালতীতে ত্যাগ করেন নাই। তাহার পর ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রবাবুর সাহায্যে ব্যবসায়ে শ্রীহর্ষবাবুর ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। তবে ইন্দ্রবাবুর সহিত আলাপে শ্রীহর্ষবাবুর অন্য বিষয়ে যে উপকার হইয়াছে তাহার তুলনায় ব্যবসায়ের উন্নতি অতি অকিঞ্চিৎকর। ইন্দ্রবাবুর সহিত আলাপে শ্রীহর্ষবাবুর অনেক বিষয়ে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি,

সমাজনীতি সকল বিষয়ে ইন্দ্রবাবু তাঁহার উপদেষ্টা ছিলেন। শ্রীহর্ষবাবু ভগবৎকৃপায় কখনও অনাচারী ছিলেন না, তবে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব ইন্দ্রবাবুর সহিত আলাপের পূর্ব্বে শ্রীহর্ষবাবুর মনে উদিত হয় নাই। ১৯০৫।৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে ইন্দ্রবাবুর সহিত আলোচনায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশী বস্ত্রব্যবহার ও স্বদেশী গৃহশিল্পের (Home Industry) উন্নতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষা ব্যতীত এ জাতির উদ্ধারের উপায় নাই। তখন কিন্তু ওকালতী ছাড়িবার সংকল্প করিতে পারেন নাই, তবে সেই ধারণা বশেই তিনি মিউনিসিপাল কমিশনারী, জেলা বোর্ডের মেম্বরগিরি প্রভৃতি করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। ইন্দ্রবাবুর নিকট কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ শ্রীহর্ষবাবু ইন্দ্রবাবুর এক তৈল-চিত্র বর্দ্ধমান জনসাধারণকে উপহার দিয়াছেন। উক্ত চিত্র বর্দ্ধমান টাউন হলের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। আবশ্যক হইলে শ্রীহর্ষ বাবু অকপটে সত্য প্রকাশ করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। বর্দ্ধমানে যে বৎসর প্রাদেশিক কন্‌ফারেনসের অধিবেশন হয় শ্রীহর্ষবাবুকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সভায় উপস্থিত হইতে হইয়াছিল; সেই সভাতেই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আকাশে এক নূতন আলোক প্রজ্জলিত হয়। সভাপতি স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরী সেই সভাতেই বিজয়-নিনাদে ঘোষিত করেন যে, গোলামের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন অস্বাভাবিক। ঐ সভাতে ঐ ভাবের পোষকতা করিয়া শ্রীহর্ষ-বাবু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হয়েন। আবার যখন ঐ সভায় কোনও খ্যাতানামা ব্রাহ্মণ কবিও সংবাদ-পত্র-সম্পাদককে মুসলমানের সহিত চা পান করিতে দেখিয়া প্রকাশ্য-ভাবে কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন, তখন সভাস্থ সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আবেদন নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে

আন্দোলনকারীদের দ্বারা আহুত রাজনৈতিক সভায় শ্রীহর্ষবাবু তাহার পর আর যোগ দেন নাই। তবে স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বদেশী বস্ত্রাদির প্রচার বিষয়ে যে সকল সভা-সমিতি হইত তাহাতে অবশ্যই যোগ দিতেন, এখনও যোগ দিয়া থাকেন। ১৯০৫।৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে ইন্দ্রবাবুর অভিমত অনুসারে তিনি বিলাতী বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন নাই। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিলাত যাইবার পর তাঁহার সহিত কোন প্রকার সামাজিক সংশ্রব না রাখিয়াই চলিতেছেন। কিন্তু বর্দ্ধমানে যখন সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হয় তখন বর্দ্ধমানাধিরাজ বাহাদুরের সহিত একমত হইয়া অনেক পরিশ্রম করিয়া যাহাতে সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষবাবু সাবেক প্রণালীমতে সমুদায় আচার-ব্যবহার করিয়াছেন ও সভায় যোগদান করিয়া বহরমপুরের ব্রাহ্মণ মহাসভায় অধিবেশনে তিনি বিনীতভাবে বক্তৃতা করিয়া আপন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া যখন National Council of Education স্থাপন করেন তখন ইনি সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয় যে ভাবে ঐ বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার অনুমোদন করিতে না পারিয়া তাহার সংশ্রব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, শ্রীহর্ষ বাবু হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীতে নাম লিখাইয়াছেন।

শ্রীহর্ষবাবুর ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা। শ্রীযুক্ত শ্রীনিধি মুখোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ; তিনি এখন কয়লার ব্যবসায় করিতেছেন। মধ্যম শ্রীযুক্ত শ্রীধর মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীকর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা Scottish Churches College এ ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী

পর্য্যন্ত ও চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে I. Sc. পড়িয়াছেন। গত পূর্ব্ব বৎসর যখন স্কুল-কলেজের ছাত্রগণকে কলেজ ছাড়িবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী অনুরোধ করেন তখন উঁহারা উভয়েই পড়া ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে উভয়েই ব্যবসায় আরম্ভ করিবার চেষ্টায় আছেন। আর দুই পুত্র নাবালক।

শ্রীহর্ষবাবু ৩৪ বৎসর কাল ওকালতী করিতেছেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে ওকালতী করেন। তাহাতে আসামীর ২ বৎসর জেল হয়। আসামী ফরিয়াদীর কারবারের অংশীদার ছিলেন। অংশীদারী কারবারের কতক দ্রব্যাদি তিনি লইয়া গিয়াছিলেন—এই ছিল অভিযোগ। ইহাতেই দুই বৎসর জেলের আদেশ হওয়ায় তদবধি তিনি আর ফরিয়াদির পক্ষে ওকালতী করেন নাই। তাঁহার পিতাও ফরিয়াদির পক্ষে ওকালতী করিতেন না। পরলোকগত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনেক দিন করেন নাই। শ্রীহর্ষ বাবু তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতেছেন।

বর্দ্ধমানের শেষ প্রদর্শনী (Exhibition) স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া খোলা হইবে—এইরূপ প্রকাশ পাইলে উক্ত প্রদর্শনীতে যাহাতে কোন লোক না যান তাহার নিমিত্ত বর্দ্ধমানে যে সকল সভা হয় শ্রীহর্ষবাবু তাহাতে কয়েক দিন বক্তৃতা করিবার পর বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ড্রামণ্ড সাহেব শ্রীহর্ষবাবু প্রমুখ কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোককে এক সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া প্রদর্শনীকে একদিনের নিমিত্ত বয়কট করিয়া তার পর লোক আসিতে দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, কিন্তু শ্রীহর্ষবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যাহাতে প্রদর্শনীতে কেহ না যান তদ্বিষয়ে তাহার পরও সভাদি করেন ও বক্তৃতাদি করেন। শ্রীহর্ষবাবু ও তাঁহার সহযোগিগণের চেষ্টায় উক্ত প্রদর্শনীতে অনেক লোক যান নাই। ফলে উক্ত প্রদর্শনী অকালে

বন্ধ করিতে হয়। এখন কংগ্রেস-কনফারেন্সের দিন। এক্ষণে যে সকল রাজনৈতিক Congress-Conference হইতেছে তাহাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। বহুদিন হইতে এই মত পোষণ করায় শ্রীহর্ষবাবু কখন প্রতিনিধি হইয়া কোন রাজনৈতিক Congress বা Conferenceএ যোগদান করেন নাই। তত্রাচ কয়েকটী Congress-Conferenceএ দর্শকস্বরূপে উপস্থিত হইয়া তিনি ঐ সকলের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং 'সংঘশক্তি কলৌ যুগে', এই কথার মহামূল্যতা তিনি স্বীকার করেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর আবশ্যকতাও তিনি বিশ্বাস করেন। সন ১৩২৯ সালে ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীতে সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে দেখিয়া সমগ্র বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের পদধূলিতে বর্দ্ধমান পবিত্র করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে এবং তাহার পর বৎসর বর্দ্ধমানে সমবেত হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন। পর বৎসর চৈত্র মাসের ২৮শে ও ২৯শে তারিখে বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। প্রধানতঃ স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ধনকুবের শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ও সেহাড়সোল-নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উদারহৃদয় ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথনাথ মালিয়ার উৎসাহে ও বর্দ্ধমানবাসী বহুব্রাহ্মণাদি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সাহায্যে এই সম্মিলনীর অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। শ্রীহর্ষ বাবু সম্পাদকস্বরূপে অশেষ পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সন ১৩৩০ সালের ২৮শে ও ২৯শে চৈত্র শ্রীহর্ষবাবু নিজের তথা বর্দ্ধমানের মহাগৌরবের দিন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। শ্রীহর্ষবাবুর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৭ বৎসর।

স্বর্গীয় হরিমোহন মজুমদার

স্বর্গীয় বাবু হরিমোহন মজুমদার।

জন্ম ও বংশ-মর্য্যাদা

স্বনামধন্য জমিদার ও সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার বাবু হরিমোহন মজুমদার মহাশয় সন ১২৬৬ সালের কার্ত্তিক মাসে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি চিত্রপুরের সুপ্রসিদ্ধ দেব-বংশোদ্ভব। মোগল বাদশাহগণের রাজত্ব কালে এই বংশের জনৈক বংশধর কোন বাদশাহের নিকট "মজুমদার" (অর্থাৎ রেভিনিউ কলেক্টর) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ও তদবধি এই বংশ দেব পদবীর পরিবর্ত্তে 'মজমুয়াদার" বা "মজুমদার" পদবীতে জনসাধারণে পরিচিত। মজমুয়াদারগণ রাজা উপাধি অথবা পাঁচ হাজার সৈন্যের নায়কতার ভার পাইতেন। হরি মোহন বাবুর পূর্ব্বপুরুষ শিবরাম প্রথমে চিত্রপুর হইতে ভবানীপুরে ও তাহার অন্যান্য জ্ঞাতিরা প্রয়াগ ও লক্ষ্মৌ সহরে বসবাস করিতে যান। ইহারা ভরদ্বাজগোত্রীয় মৌলিক কায়স্থ।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

যে সকল ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কেবলমাত্র নিজ অধ্যবসায় ও যত্নে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া গিয়াছেন, হরিমোহন মজুমদার মহাশয় তাঁহাদিগের অন্যতম। সাত আট বৎসর বয়সের সময়ে মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর বালক হরিমোহন বিদ্যাশিক্ষার জন্য বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িয়া গ্রামে আসিয়া প্রথমতঃ তথাকার বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন ও দুই তিন বৎসরের মধ্যে কৃতিত্বের সহিত এম,ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজি শিক্ষার জন্য টাকী

গভর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও কেবলমাত্র ফিএর টাকা সংগ্রহ করিতে না পারায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে সক্ষম হন নাই। যৌবনের প্রারম্ভেই বিদ্যানুরাগী হরিমোহন এইরূপে ব্যর্থমনোরথ হইলেও নিশ্চেষ্ট না হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বসিরহাট মহকুমার তদানন্তীন জনৈক মুনসেফবাবুর শরণাপন্ন হন। তিনি এই বিদ্যোৎসাহী বালকের শোচনীয় অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ইতিমধ্যে স্থানান্তরে বদলী হওয়ায় তাঁহাকে নিজ সঙ্গে কর্ম্মস্থলে লইয়া যান। এখানে আসিয়া তিনি তাঁহাকে মোক্তারী পড়িবার সুযোগ করিয়া দেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই হরিমোহন বাবু মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহার এতাদৃশ একাগ্রতা ছিল ও তিনি এতদূর কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন যে, অধিকাংশ সময়ে বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি হাটে ও বাজারে মোট বহিয়া দোকানীদের নিকট হইতে অর্থ লইয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য আবশ্যক পুস্তকাদি ক্রয় করিতেন। প্রতিকূল অবস্থার ভীষণতা ও দারিদ্রের কঠোরতায় নিষ্পেষিত হইয়া এই পরিশ্রমশীল, বিদ্যানুরাগী, কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবকের উপযুক্ত শিক্ষালাভ না হইলেও তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত ছিলেন ও নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া আজীবন সমাগত দরিদ্র ছাত্র-দিগের শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার অন্নে প্রতি-পালিত বহু দরিদ্র সন্তান সুশিক্ষিত ও উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধনে ও সম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

কর্ম্ম ও শেষ জীবন

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অন্যত্র বিশেষ সুযোগ না হওয়ায় অবশেষে

তিনি বসিরহাটে আসিয়া মোক্তারী আরম্ভ করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত ব্যবসায়ে তিনি পসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ব্যবহারা-জীবিগণের অগ্রগণ্য হন এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজ কর্ম্মস্থল বসিরহাটে ও কলিকাতা মহানগরীতে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি খরিদ করেন; কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি কখনও ব্যবসায়ে নীচতা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার সুনাম, সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা সর্ব্বত্রই বিদিত।

মোক্তারী আরম্ভ করিবার কয়েক বৎসর পরেই তিনি স্থানীয় যাবতীয় জনহিতকর সদনুষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন এবং নিজ ব্যবসায়ে ক্ষতিস্বীকার, শারীরিক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্যহ্রাস সত্ত্বেও তিনি বহুসময় ব্যয় করিয়া এই সকল কার্য্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। সন্ধ্যার পরে আপন ব্যবসায় ও জমিদারী কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি করিয়া তিনি প্রত্যহ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই সকল জনহিতকর কার্য্যে ও অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন।

ইংরাজি সন ১৮৮৫ সালে তিনি প্রথম স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বৎসর কাল তৎপদে অবস্থিত ছিলেন। ১৮৯৫ সনে তিনি প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন ও তৎপরে ১৯১১ সন হইতে ১৯১৫ সন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর পুনরায় ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার কার্য্যকালে বসিরহাট মিউনিসিপালিটির অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মিউনিসিপালিটীর কার্য্য ব্যতীত তিনি বসিরহাটের অন্যান্য যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি আজীবন বসিরহাট দাতব্য চিকিৎসালয়ের অনারারী সেক্রেটারী ছিলেন। এই চিকিৎসালয়, মিউনিসিপাল বাজার ও টাউন হলের অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও সাধারণের

জলকষ্ট-নিবারণকল্পে কারমাইকেল ট্যাঙ্ক খনন প্রভৃতি কার্য্যে অর্থ-সংগ্রহের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন মোক্তার লাইব্রেরির সেক্রেটারী ছিলেন এবং তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় উক্ত লাইব্রেরির পাকা গৃহ নির্ম্মিত, স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় ও লোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আজীবন উক্ত বিদ্যালয়ের সদস্য ও লোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও জেলা ২৪ পরগণার এগ্রিকালচারেল এসোসিয়েসনের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি নিজ অর্থব্যয়ে তাঁহার জন্মভূমি ভবানীপুর গ্রামে সাধারণতঃ অনুন্নত শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

উক্ত বহুবিধ সৎকার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি বিশেষ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত সতত কার্য্য করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা ও কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল কঠোর পরিশ্রম,স্বার্থত্যাগ ও নিজ ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়াও তিনি গুরু দায়িত্ব-পূর্ণ জনহিতকর কার্য্যে যেরূপ একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। ইহা বাঙ্গালার স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে কম গৌরবের বিষয় নহে।

হরিমোহন বাবুর চরিত্র আজীবন একভাবেই বর্ত্তমান ছিল। নিঃস্ব অবস্থা হইতে প্রভূত ধনশালী হইয়াও তাঁহার স্বভাব প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, ঘরে ও বাহিরে একভাবেই পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার স্বভাব কেবল বিনয়নম্র নহে, নৈতিক সাহসে পূর্ণ, দেহ অপাপবিদ্ধ এবং মন পবিত্র ও উদার ছিল। তিনি সরল, অকপট, বিদ্যোৎসাহী, পরহিত-সাধনে চিরনিযুক্ত, সর্ব্বসাধারণের হিতৈষী ও নিষ্কাম কর্ম্মী ছিলেন। তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া শুধু নিজের ও আত্মীয়গণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন নাই, দরিদ্রের দুঃখ-নিবারণই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

তিনি আবাল্য উৎসাহী ও উদ্যমশীল পুরুষ ছিলেন। মৃত্যুর দুই তিন দিবস পূর্ব্বেও তিনি অদম্য উৎসাহে দৈনন্দিন কার্য্য করিয়াছেন। শেষ জীবনে কঠোর পরিশ্রমের জন্য এবং মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র সহোদর ও মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর বড় আদরের পৌত্র দুইটীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও তিনি বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি আদালত হইতে অসুস্থ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পাঁচ ছয় দিবস পরেই তাঁহার প্রথমা দৌহিত্রীর বিবাহের দিন স্থির থাকায় ও তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য শনিবার দিবসে তাঁহাকে তাঁহার ৭নং রামমোহন রায় রোড-স্থিত কলিকাতার ভবনে আনয়ন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সুযোগ হইল না—কলিকাতায় পৌছাইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই সন ১৩২৭ সালের ২রা মাঘ শনিবার রাত্রি ৯টা ৪ মিনিটের সময়ে ৬১ বৎসর ৩ মাস বয়সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া সজ্ঞানে সহসা হৃদ্‌রোগে তাঁহার মানব-জীবনের অবসান হইল! পর দিবস প্রাতে সহসা ঐ সংবাদ পৌছিবামাত্র বসিরহাট-বাসী আবালবৃদ্ধবনিতা শোকে মুহ্যমান হইলেন ও স্বর্গীয় মহাত্মার সম্মানের জন্য কোর্ট, স্কুল, মিউনিসিপাল ও লোন আফিস প্রভৃতি ঐ দিবস বন্ধ রহিল। অপরাহ্নে বসিরহাট-বাসী জনসাধারণের একটী মহতী শোক-সভা হয় এবং উক্ত সভার নির্দ্দেশক্রমে দরিদ্রের বন্ধু হরিমোহনবাবুর আত্মার কল্যাণ-কামনায় স্থানীয় দরিদ্রদিগকে একদিবস পরম পরিতৃপ্তির সহিত খাওয়ান হয়। ক্রমে ক্রমে স্কুল, মিউনিসিপাল ও লোন আফিস এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য বহু স্থানে শোকসভা করিয়া ঐ সকল স্থানে স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার তৈলচিত্র রাখার ব্যবস্থা হয়।

পারিবারিক সংবাদ

হরিমোহন বাবু অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সিকরা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কুলীন স্বর্গীয় নন্দলাল ঘোষ মহাশয়ের অষ্টমবর্ষীয়া পরমরূপলাবণ্যময়ী সর্ব্বগুণান্বিতা একমাত্র দুহিতা ও স্বর্গীয় শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মানন্দ রাখাল মহারাজের খুল্লতাত ভগিনী শ্রীমতী শরৎ-মোহিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার উচ্চান্তঃকরণ ও দানশীলতার কথা এতদঞ্চলে কাহারও অবিদিত নাই। স্বামীর মৃত্যুতে ইনি এতাদৃশ শোকাকুলা হন যে, ঐ ঘটনার মাত্র কয়েকমাস পরেই সন ১৩২৮ সালের ৫ই ভাদ্র তারিখে সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সন্তানগণ মাতার সৎকারের জন্য বসিরহাট হইতে শবদেহ গঙ্গাতীরে নিমতলাঘাটে আনয়ন করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তথায় আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সব চিতা জ্বলিতেছে, শুধু যে চিতাটীতে হরিমোহন বাবুর নশ্বর দেহ দাহ করা হইয়াছিল সেইটীই এই সাধ্বীর শেষ কার্য্য করিবার জন্যই বোধ হয় অবশিষ্ট ও শূন্য আছে। পুত্রগণ তাহাতে চন্দন-চিতা রচনা করিয়া মাতার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় হরিমোহনবাবু জননীর কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। ৩৭।৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ঐরূপ বৃহৎ কার্য্য অদ্যাপি এতদঞ্চলে কদাচিৎ হইয়াছে। মৃত্যুর সময়ে হরিমোহনবাবু পাঁচ পুত্র, সাত কন্যা ও প্রায় বিংশতি-সংখ্যক দৌহিত্র ও দৌহিত্রী রাখিয়া যান। কন্যাদিগের মধ্যে ৫টীর বিবাহ হইয়াছে। তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয়, যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কন্যাগুলিকে সৎপাত্রস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা মিষ্টার যতীন্দ্রনাথ বসু, ইমপিরিয়াল ফরেষ্ট অফিসার। ২য় ও ৩য় জামাতা শ্রীললিতকুমার

ও বিনোদবিহারী বসু ওকালতী করেন। ৪র্থ জামাতা শ্রীনীরদকুমার বসু B. A. ব্যবসায় করেন ও ৫ম জামাতা শ্রীপরেশচন্দ্র বসু M. A. B. L. ময়ূরভঞ্জ রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ M. A. B. L.এর সহিত তাঁহার প্রথমা দৌহিত্রী মীরারাণীর বিবাহ হইয়াছে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র অমিয়কুমার বসু B. Sc. বিজ্ঞান কলেজে M. Sc. অধ্যয়ন করিতেছেন।

হরিমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ পিতৃপ্রথানুসারে জমিদারী প্রভৃতি সকল কার্য্যই সুচারুভাবে পরিচালনা করিতেছেন। ইনি পিতার সহৃদয়তা ও মহানুভবতা প্রভৃতি সকল গুণেরই অধিকারী হইয়াছেন। ইনি পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টী স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি-রক্ষা-মানসে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতঃ "ভবানীপুর হরিমোহন অবৈতনিক বিদ্যালয়" নামকরণ করিয়া তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন ও স্বীয় গ্রামে মাতৃদেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে সোপান-পরম্পরা-শোভিত "শরৎ সরোবর" নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়া আপামর জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইনি সন্দেশখালী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণকল্পে পিতৃ-প্রতিশ্রুত অর্থ দান করিয়া অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। হরিমোহন বাবুর পুত্রেরা পিতার পদাঙ্কানুসরণ করতঃ স্থানীয় যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনার, দাতব্য চিকিৎসালয় ও লোন কোম্পানীর অনারারী সেক্রেটারী এবং হিন্দু সভা ও রিলিফ কমিটীর কোষাধ্যক্ষ। তাঁহার ২য় পুত্র শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার M. A. B. L ওকালতী করেন ও ইনি বসিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য। ৩য় পুত্র শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার B. L ওকালতী করেন; ইনি হরিমোহন অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ও বসিরহাট সেবা ও সৎকার সমিতির সেক্রেটারী। তাঁহার

চতুর্থ পুত্র হরেন্দ্রনাথ সিটি কলেজে ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ইনি ইউনিভারসিটী কোরে যোগদান করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন।

হরিমোহন বাবুর পুত্রেরা যথারীতি সংস্কারাদি করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এক্ষণে যাগ-যজ্ঞ-দুর্গোৎসবাদি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিতেছেন। নিম্নে হরিমোহন বাবুর বংশ-তালিকার একাংশ প্রদত্ত হইল :—

হরিমোহন
সুরেন্দ্র
চারুবালা
তরুবালা
ধীরেন্দ্র
নৃপেন্দ্র
সুধারাণী
কন্যা
রসী ও বিভাবতী
(কমলা)
সৌরিন্দ্র
শুভেন্দ্র
নীরেন্দ্র
নীলিমা
নীতেন্দ্র
মিয়
মীরা
ডোরা
খনু
কল্পনা
হাসি
টুনী
তুকী
ডলি
ডেজি
গৌরী
লাবণ্য
বারীন্দ্র
সত্যেন্দ্র
শান্তি
গৌরী
কল্যাণী
শৈল
সুধীরেন্দ্র (নির্ম্মলা)
নৃপবালা
সুবীরাবালা
হরেন্দ্র
বিনরেন্দ্র
প্রতিমা
প্রতিভা
উমা
সত্যেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
দিলীপ
বেবী
দুলাল
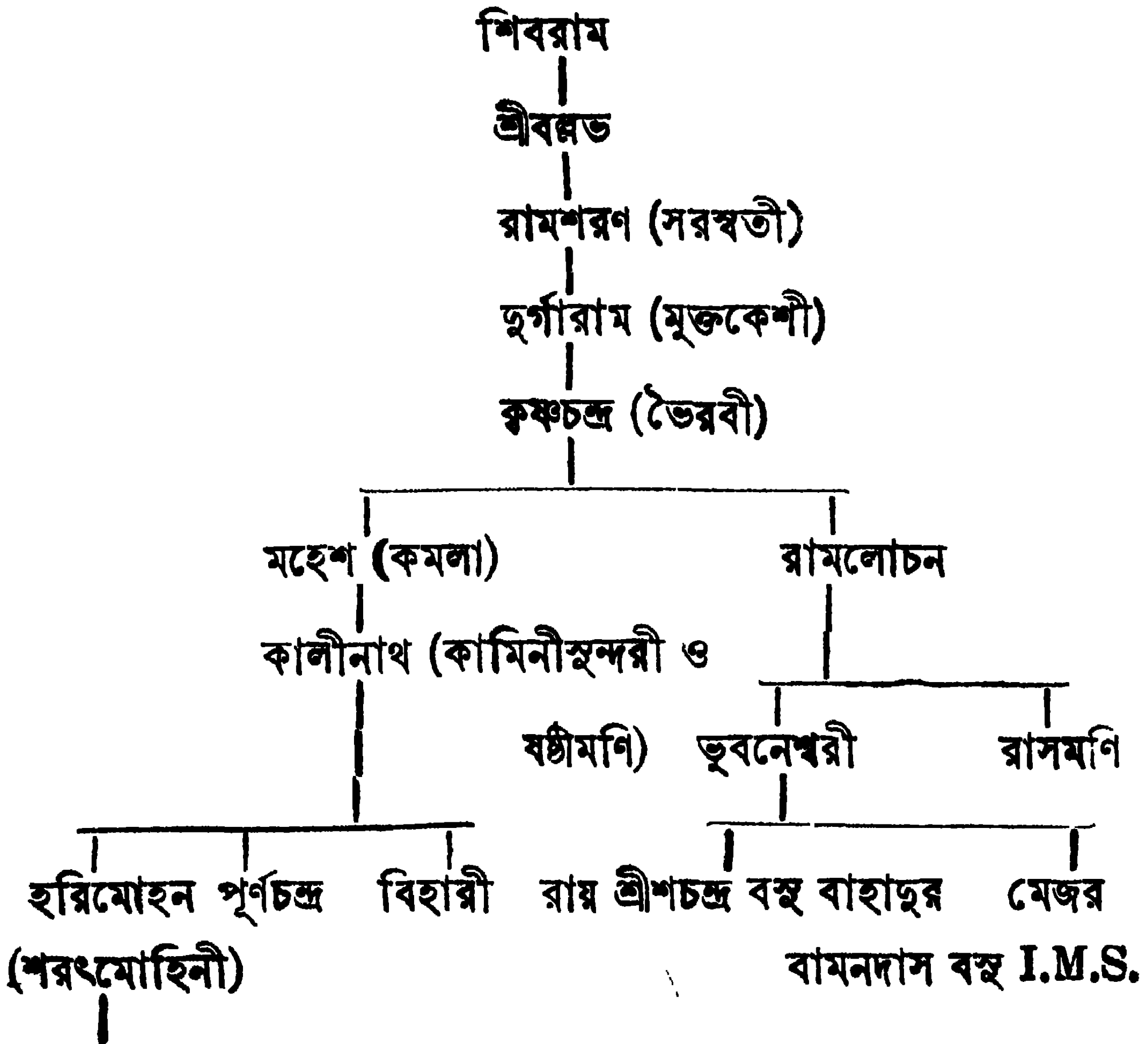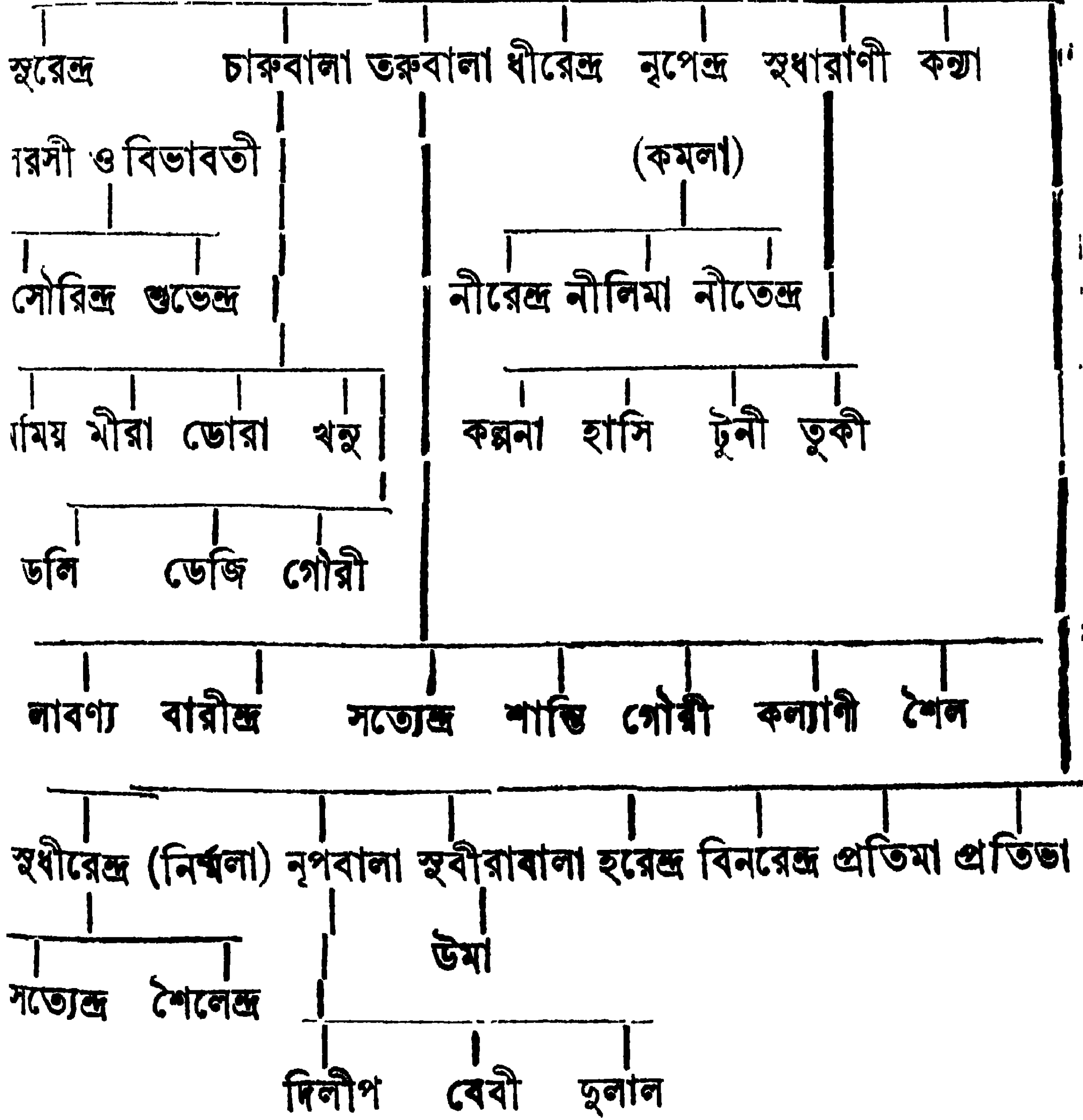
মুক্তাগাছার আচার্য্য-বংশ।

রামরাম আচার্য্যের বংশ-ধারা

মুক্তাগাছার জমিদার-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ও পরগণা আলেপসাহী বা আলাপসিংহের প্রথম মালিক শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের ও তৎপূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় এবং তৎসঙ্গে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র ৺শিবরাম আচার্য্যের বংশধারার পরিচয়, এই "বংশ-পরিচয়" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "মুক্তাগাছার আচার্য্য-বংশ" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে ৺ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের প্রথম বা জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রাম রাম আচার্য্যের বংশ-পরিচয় প্রদান করা গেল।

৺শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মানবলীলা সম্বরণ করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রামরাম আচার্য্য তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা হরিরাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম হইতে পৃথকান্ন হইয়া স্বীয় চারি আনা অংশ পৃথক করিয়া লন এবং তদবধি তাঁহার অংশ "সাবেক চারি আনী" বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

৺রামরাম আচার্য্য তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ রুদ্ররাম, মধ্যম বিজয়রাম, ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র। এই পুত্রত্রয়ের মধ্যে সাবেক চারি আনী সম্পত্তি বাটোয়ারা হইলে যথাক্রমে ইহারা বড় হিস্যা, মধ্যম হিস্যা ও ছোট হিস্যা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

বড় হিস্যার আদিপুরুষ রুদ্ররাম আচার্য্য হরিনারায়ণ আচার্য্য নামক একপুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া স্বর্গগত হন। হরিনারায়ণ আচার্য্য পরম ধার্ম্মিক ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বজন-বিদিত ধর্ম্মানুরাগ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে নানা রূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ঐসব কিম্বদন্তী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলার প্রলোভন ত্যাগ

স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
মৃত্যুর তারিখ ১৩০৮ ১০ই শ্রাবণ

করিতে পারিলাম না। একদা তাঁহাকে কোন এক মোকদ্দমায় অনিবার্য্য কারণে বাধ্য হইয়া সাক্ষ্য দিতে নসিরাবাদে (ময়মনসিংহ টাউনে) গমন করিতে হয়। তৎকালে ময়মনসিংহ-যাতায়াতের পথ সুগম ছিল না এবং জমিদার মহাশয়গণ সাধারণতঃ পাল্কী-যোগেই গমনাগমন করিতেন; কারণ, মুক্তাগাছা হইতে ময়মনসিংহ দশ মাইল দূরবর্ত্তী এবং অন্য কোন যান-বাহনাদির সুবিধা ছিল না। তিনি মর্য্যাদারক্ষার জন্য পাল্কী-বেহারা সঙ্গে লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনুষ্য-স্কন্ধে আরোহণ না করিয়া পদব্রজেই যাতায়াত করিয়াছিলেন। মোকদ্দমার দিবস অতি প্রত্যূষে মাঘের শীতল জলে অবগাহনপূর্ব্বক আবক্ষ-নিমজ্জিত হইয়া যখন সন্ধ্যা-তর্পণাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতেছিলেন, তখন একজন ইংরাজ হাকিম (যিনি হরিনারায়ণের মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন) অশ্বপৃষ্ঠে প্রাতভ্র্মণে বহির্গত হইয়া হরিনারায়ণের এই অসাধারণ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করেন এবং তীরবর্ত্তী খানসামার নিকট গমন করতঃ হরিনারায়ণের পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষ্যের দায় হইতে অব্যাহতি দেন। তিনি যখন জমিদারী-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন তখন তাঁহার স্থাপিত বিগ্রহ ৺গোপালদেব ঠাকুরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অর্থাৎ "গোপাল তুমি জান" এই বলিয়া নথিপত্রাদি দস্তখত করিতেন। বহুলোক তাঁহাকে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন মনে করিয়া তাঁহার নামে হাজত মানস করিত এবং হাজত-সম্পর্কিত ফলগুলি যথাসময়ে তাঁহাকে দেওয়া হইত। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ প্রাচীন দীর্ঘ পুঁথিগুলি আজও তাঁহার বংশধরগণের আবাসে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

হরিনারায়ণ আচার্য্যের পরলোক-প্রাপ্তির পর তাহার চারি পুত্র গঙ্গানারায়ণ, রামনারায়ণ, বিষ্ণুনারায়ণ এবং কৃষ্ণনারায়ণ মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনারায়ণকে হরিনারায়ণের কনিষ্ঠ খুল্লতাত কৃষ্ণচন্দ্র (ছোট হিস্যার

আদি পুরুষ) দত্তক গ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হওয়ার পর, অপর দুই ভ্রাতা সমুদয় সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লয়েন এবং তদবধি জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণের অংশ বড় হিস্যা বড় তরফ নামে ও দ্বিতীয় পুত্র রামনারায়ণের অংশ বড় ছোট তরফ নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

বড় হিস্যা বড় তরফের প্রথম পুরুষ গঙ্গানারায়ণ আচার্য্য তিন পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া স্বর্গগত হন। প্রথম পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ, দ্বিতীয় পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৃতীয় পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ। প্রথম পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী জগন্ময়ী দেবী স্বামীর উইলের বলে এই আচার্য্য-বংশের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের তৃতীয় পুত্র বিষ্ণুরাম আচার্য্যের বংশসম্ভূত ৺কেদারকিশোর আচার্য্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া বংশ রক্ষা করেন। ঐ বংশধরের নাম শ্রীহেমেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য। ইনি সুশিক্ষিত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইনি যেমন সুরসিক, তেমন বহুদর্শী। হেমেন্দ্রনারায়ণ পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতা-অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন নিঃসম্বল অবস্থায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া পড়েন। পদব্রজে তিনি ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। অবশেষে হিমালয়-অঙ্কস্থিত বদ্রিনারায়ণ, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় পুনঃ ফিরিয়া আসেন এবং পাঠে মনঃ-সংযোগ করেন। পঠদ্দশায় এইরূপ দীর্ঘ অবকাশের পর সচরাচর আর কাহারও পাঠে বড় প্রবৃত্তি দেখা যায় না। কিন্তু ইনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না বলিয়াই পর্য্যটনান্তে পুনরায় নবোদ্যমে পাঠে মনোযোগী হইতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা নগরীতে সপরিবারে বাস করিতেছেন। এই দেশের জমিদারগণের অনেকেই

নিষ্কর্ম্মা হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করতঃ বিলাস-ব্যসনে জীবন কর্ত্তন করেন এবং উহার ফলস্বরূপ অনেকের পৌত্রিক সম্পত্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হেমেন্দ্রনারায়ণ এই প্রকৃতির লোক নহেন, কোন প্রকার বিলাস-ব্যসন, এমন কি, নাগরিক জীবনের অপরিহার্য্য দুর্গুণগুলিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। পোষাক-পরিচ্ছদে কিম্বা আচার-ব্যবহারে তিনি সর্ব্বদাই আড়ম্বরশূন্য এবং আলাপ-আপ্যায়নে চিরপ্রফুল্ল। বস্তুতঃ তিনি ভোগ-বিলাসের কেন্দ্রস্থান কলিকাতায় থাকিয়াও ভারতীয় সভ্যতার অনাড়ম্বর জীবনের যে রসাস্বাদ করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হেমেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র—সুরেন্দ্রনারায়ণ, হীরেন্দ্রনারায়ণ ও রাজেন্দ্রনারায়ণ। সুরেন্দ্রনারায়ণ বি-এস্ সি পাশ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। মধ্যম হীরেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় বি-এল পড়িতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ চিররুগ্ন বলিয়া লেখাপড়ায় তাদৃশ উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই।

৺গঙ্গানারায়ণ আচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র ৺হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য একজন সঙ্গীতাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। প্রায় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রেই তাঁহার কিছু না কিছু অধিকার ছিল।

মুক্তাগাছাতে কোন গায়ক বা বাদক আসিলে তাঁহার বৈঠকখানায় ২।১ টী মজুরা না দিয়া যাওয়ার উপায় ছিল না। তিনি নিঃসন্তান ও বিপত্নীক ছিলেন বলিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্র-নারায়ণকে উইল-সম্পাদনে দান করিয়া পরলোক গমন করেন।

গঙ্গানারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ খুব আলাপী লোক ছিলেন। যে কোন লোকই হউক না কেন, একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিজ বংশের, মাতামহ-বংশের, বিবাহিত হইলে শ্বশুর-বংশের ও গ্রামবাসীর পরিচয় না দিয়া পরিত্রাণ পাইতেন না। এই কারণে

তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের বহু পরিবারের পরিচয় জানিতেন। তিনি যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন না, তথাপি তাঁহার জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেও বিস্মিত হইতে হইত। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সর্ব্বদা পড়াশুনায় লিপ্ত থাকিতেন। যখন চক্ষে ভালরূপ দেখিতে পাইতেন না, তখন আমলা কর্ম্মচারী অথবা উপস্থিত কোন ভদ্রলোকের দ্বারা নানাবিধ গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করাইয়া শুনিতেন এবং এতই মেধাবী ছিলেন যে, পঠিত বিষয়গুলি প্রায় সমস্তই তিনি মনে রাখিতে পারিতেন। তিনি বিদ্যানুরাগী, নিজ পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রনারায়ণের সুশিক্ষার জন্য তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মুক্তাগাছা মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। তিনি, মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও ছোট হিশ্যার ৺অমৃতনারায়ণ আচার্য্য এই তিন জনেই উহা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ছোট হিশ্যার অমৃতবাবুর সঙ্গে যোগেন্দ্রনারায়ণের এতই সম্প্রীতি ছিল যে, লোকে উভয়কে "হরিহর আত্মা" বলিত। তিনি বিগত ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসে একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া স্বর্গগত হন। নগেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধিধারী ছিলেন। তিনিই আচার্য্য-বংশের প্রথম গ্রাজুয়েট। ছাত্রজীবনেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮৯ সালে Preparatory class হইতে পরীক্ষা দিয়া অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তিনি কলিকাতা "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী" হইতে "রায় দীননাথ ঘোষ বাহাদুর" পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯০ সালে সর্ব্ববিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় ঐ কলিকাতা "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী" হইতে "কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক" স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।

স্বর্গীয় নগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
মৃত্যুর তারিখ ১৩১৪ সাল ১৫ই ফাল্গুন

নগেন্দ্রনারায়ণ অতি মিষ্টভাষী ও প্রিয়দর্শন ছিলেন এবং সর্ব্ব সৎকার্য্যে সদা অগ্রণী ছিলেন। সুদীর্ঘকাল কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যা-চর্চ্চার পর ১৩০৫ সালের প্রথম ভাগে মুক্তাগাছায় উপস্থিত হইয়া নিজ বাড়ীতে মাত্র ৯ বৎসর বাস করিয়া ১৩১৪ সনের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে ৩৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালমধ্যেই তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে তাঁহার বৈঠকখানায় স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাগম হইত। দেশ-বিদেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখনই মুক্তাগাছায় পদার্পণ করিতেন, তাঁহারা নগেন্দ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ না করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। মহামতি গোখেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং গুজরাটের একটী ভদ্রলোক উকীল (নাম স্মরণ নাই) কার্য্যব্যপদেশে একবার মুক্তাগাছায় আসিয়া তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া ময়মনসিংহের জনসাধারণ, ১৩১২ সালে ময়মনসিংহ সহরে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল ঐ সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য তাঁহাকে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত সমিতির যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি বিদ্যাচর্চ্চাতেই অধিক সময় ব্যয় করিতেন। উহার নিদর্শনস্বরূপ আজও তাঁহার নিজ ভবনে তৎপ্রতিষ্ঠিত "নগেন্দ্রনারায়ণ লাইব্রেরী" বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে।

নগেন্দ্রনারায়ণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত দেশের

দুর্গতি কখনও দূর হইতে পারে না। এবং মাতৃজাতি অশিক্ষিতা থাকিলে তাঁহাদের সন্তানগণ কখনও মানুষ হইতে পারিবে না। এই বিশ্বাসে তিনি ১৩১৩ সালে ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নসহকারে মুক্তাগাছা-স্থিত নিজ ভবনে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু ১৩১৪ সালে তিনি পরলোক গমন করায় এই অত্যল্পকালমধ্যে ঐ বিদ্যালয়ের বিশেষ কিছু উন্নতি করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৩২৬ সালের ১৪ই ভাদ্র পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয় তাঁহার বাড়ীতেই ছিল। তৎপর স্থানীয় বদান্য জমিদার মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য স্থান দান করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩৩৪ সালে ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনারায়ণের বিদুষী পত্নী শ্রীযুক্তা মৃণালিণী দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া ৮০০০৲ টাকার কোম্পানী কাগজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ও শিক্ষকগণের বাসভবন-নির্ম্মাণার্থ নগদ এক সহস্র মুদ্রা উক্ত স্কুল কমিটির বর্ত্তমান সুযোগ্য প্রেসিডেণ্ট সর্ব্বসৎকর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

৺ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের এই বিদুষী পত্নী শ্রীযুক্তা মৃণালিণী দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল ৺ মোহিনীমোহন রায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা। ইনি বালিকা বয়সে এল্, এম্, এস্ পদ্মপুকুর বালিকা বিদ্যালয় হইতে অতি প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর নগেন্দ্রনারায়ণের সহধর্ম্মিণীরূপে শ্বশুর যোগেন্দ্রনারায়ণের বৃহৎ সংসারে প্রবেশ করতঃ সংসারের জনগণকে ভক্তি ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সংসারটিকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কালের কুটিল গতিতে উত্তর কালে পতিবিয়োগজনিত শোকে নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়েন এবং উত্তরোত্তর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীমৃণালিনী দেবী
শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
জন্ম ১৩০৪ সাল ১লা আশ্বিন

অবলম্বন করিয়া বিগত ১৩৩০ সনের কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে স্কন্দপুরাণোক্ত "সর্ব্বজয়া" নামক ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে উক্ত ব্রত যথানিয়মে প্রতিষ্ঠা করেন। বিশিষ্ট হিন্দুমাত্রই অবগত আছেন যে, এই ব্রতের সুকঠিন নিয়ম প্রতিপালন করা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার! এই ব্রত অনুষ্ঠানে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অগ্রহায়ণে—শাক, পৌষে লবণ, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে পুষ্প, চৈত্রে দধি, বৈশাখে অন্ন, জ্যৈষ্ঠে জল, আষাঢ়ে ফল, শ্রাবণে বস্ত্র,ভাদ্রে ব্যজনী, আশ্বিনে ঘৃত ও কার্ত্তিকে শয্যা—এইরূপে প্রতি মাসে নানা কঠোর ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। বৎসর পূর্ণান্তে তিনি ব্রতপ্রতিষ্ঠার দিবসে দেশ-বিদেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণকে ভূরি-ভোজনান্তর একটী করিয়া পিতলের কলসী, এক জোড়া করিয়া ধুতি ও নগদ টাকা দিয়া এবং ব্রাহ্মণ মহিলাগণকে একখানি করিয়া সাড়ী, থালা, বাটী, আয়না, চিরুণী ও গন্ধ দ্রব্য প্রভৃতি দিয়া ভোজনান্তর বিদায় করেন। এতদ্ব্যতীত বহু দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল।

৺ নগেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ, মধ্যম শ্রীমনুজেন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ শ্রীসমরেন্দ্রনারায়ণ। ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত। জ্যেষ্ঠ শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ শ্রীসমরেন্দ্রনারায়ণ বি-এস্ সি বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। অমরেন্দ্র বাবু সাহিত্যানুরাগী। এক সময় মাসিক সাহিত্যে তাঁহার রচিত অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে বাঙ্গালীর সৈন্যদলে যোগদান-উপলক্ষে তিনি একটী সঙ্গীত রচনা করিয়া যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। মধ্যম শ্রীমনুজেন্দ্রনারায়ণ ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করিতে ছিলেন তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়।

তিনি মহাত্মার আহ্বানে কলেজ ত্যাগ করিয়া মুক্তাগাছাস্থ নিজ পৈতৃক ভবনে বাস করতঃ নিজ বিষয়-সম্পত্তির কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইনি পিতার অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন। বিনয়-নম্র ব্যবহারে ইনি সকলেরই চিত্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহার এই লোকানুরঞ্জন-বৃত্তির নিদর্শন পাঠ্যজীবনেই দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই বৃত্তি আজ আরও পরিস্ফুট হইয়া তাঁহার বৈষয়িক জীবন আরও মধুময় করিয়াছে। ইহারই ফলে আশ্রিত, অনাশ্রিত, বন্ধু-বান্ধব, প্রজা, কর্ম্মচারী—সকলেই এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। এই সমদৃষ্টি ও লোকরঞ্জনের প্রবৃত্তির মূলে ধর্ম্মানুরাগই বর্ত্তমান। মনুজেন্দ্রবাবু পিতামাতার আশীর্ব্বাদেই এই ধর্ম্মানুরক্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

জন্ম ১২৯৮ সাল ৬ই বৈশাখ

গোবরাছড়ার মুস্তোফী জমিদার-বংশ।

এই মুস্তোফী বংশ বহুকাল হইতে কুচবেহার রাজ্যে অবস্থিতি করিলেও ইঁহাদের আদিনিবাস ইহা নহে। ইঁহাদের আদিনিবাস হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে ছিল; পরে ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ মধ্যস্থিত সাকোয়া গ্রামে ছিল। এই বংশের আদিপুরুষ অচ্যুতরাম শর্ম্মা বাঙ্গালায় আইসেন। তাহার পর কোন সময় ত্রিবেণী হইতে সাকোয়ায় বাস-পরিবর্ত্তন হয় তাহা এক্ষণে আর নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। ইঁহাদের ভরদ্বাজ গোত্র, সামবেদ ও ইঁহারা রায় পরমানন্দের সন্তান, শুদ্ধশ্রোত্রীয় ভিঙ্গশাঁই গাঁই ও কুথুমি শাখান্তর্গত। ইঁহাদের ভূসম্পত্তি এক্ষণে কুচবেহার রাজ্যে ও পার্শ্ববর্ত্তী রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় আছে। এই বংশীয় ৺দুর্ল্লভনারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র রূপনারায়ণকে তৎকালীন কুচবেহারাধিপতি মহারাজা মোদনারায়ণ অনুমান ইংরাজি ১৬৬৫ সালে সুসঙ্গ হইতে কুচবেহারে আনয়ন করেন। ইনি কুচবেহার রাজসরকারের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন এবং সুসঙ্গ হইতে সগোষ্ঠী ও লোকজন-পরিবৃত হইয়া কুচবেহারে আসেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় মহারাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং ইঁহাকে মুস্তোফী উপাধি প্রদান করেন। ইনি কুচবেহার রাজ্যে দিনহাটা মহকুমার ভিতরকুটী নামক স্থানে বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এককালে ইহা বহুজনপূর্ণ বৃহৎ গ্রাম ছিল। এক্ষণে তথায় এই বংশের প্রতিষ্ঠিত অতি সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত বৃহৎ শিবমন্দির ভিন্ন অতীতের গৌরবজনক স্মৃতির চিহ্নমাত্রও নাই বলিলেই হয়। সবই কালগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে এবং এইস্থান কোচবেহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রঙ্গপুর জেলাস্থ কুচবেহার-মহারাজের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে। গোবরাছাড়া ভিতরকুটীর সন্নিকটে এবং এক্ষণে তথায় এই বংশের বসতবাড়ী। গোবরাছাড়ায়

ইঁহাদের লক্ষ্মীনারায়ণজিউ বিগ্রহ আছেন এবং নিত্যপূজাদি ও অন্যান্য পূজা-পার্ব্বণাদি হয়। এখানে একটী মাইনর স্কুল ও ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

রূপনারায়ণের পুত্র ৺বিশ্বনাথ মুস্তোফী রাজসরকারের মন্ত্রী ছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের আমল অবধি তিনি মন্ত্রিত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ৺কালিকাপ্রসাদ মুস্তোফী স্বর্গীয় মহারাজা রূপনারায়ণের আমল অবধি রাজসকারের মুচ্ছুদি ছিলেন। কালিকাপ্রসাদের তিন পুত্র—গৌরীনন্দন, রঘুনন্দন ও শচীনন্দন; তন্মধ্যে রঘুনন্দন নিঃসন্তান ছিলেন। গৌরীনন্দন স্বর্গীয় মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সময় (বাঙ্গালা ১১২১ সন ইং ১৭১৪ খৃঃ অব্দ) হইতে স্বর্গীয় মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের (বাঙ্গালা ১১৭২ সন ইং ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে আরম্ভ) রাজত্বের কিছু সময় পর্য্যন্ত খাসনবিশ ও সর্ব্বাধ্যক্ষ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহাকে স্বর্গীয় মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ (বাঙ্গলা ১১৭৩ ইং ১৭৬৬ সাল) ও ইঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে (বাঙ্গালা ১১৮২ ইং ১৭৭৫ সাল) ৬৬২৪ বিঘা ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করেন। ইনি বান ও ডঙ্কাদি মনসব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শচীনন্দন স্বর্গীয় মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের খাস মুচ্ছুদ্দি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মনির্ব্বাহ-কারক ছিলেন। এই মহারাজের রাজত্বকালে এ রাজ্যের উপর ভুটিয়াদিগের বিশেষ আধিপত্য ঘটিয়াছিল এবং তাহাদিগের অমনোনীত কোন কার্য্য করা উক্ত মহারাজের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল। এই সকল কুলোকের কুমন্ত্রণায় উক্ত মহারাজা তাঁহার ভ্রাতা রামনারায়ণ দেওয়ানদেওকে বধ করায় ভুটিয়ারা ভোটভোজ-প্রদানের উপলক্ষে উক্ত মহারাজকে ও তাঁহার খাসমুচ্ছুদ্দি শচীনন্দনকে চেবাখাতা ও তথা হইতে ভোটান পর্ব্বতে লইয়া আবদ্ধ করে। স্বর্গীয় মহারাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ (বাঙ্গালা ১১৭৯ ইং ১৭৭২ সাল) রাজা হইলে পর রাজকর্ম্মাধ্যক্ষগণ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন ও কুচবেহার রাজ্যের লালবিন্দি দিতে স্বীকার করিয়া উক্ত ইংরাজ কোম্পানীর সাহায্যে মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ও শচীনন্দন মুস্তোফীকে এবং তাঁহাদের সঙ্গীয় লোকদিগকে উদ্ধারপূর্ব্বক রাজধানীতে আনয়ন করেন। এই ঘটনা হইতেই কোচবেহার রাজ্যের সহিত ইংরাজদের সম্পর্ক সূচিত হয় এবং তখন হইতেই ইহা মিত্র ও করদরাজ্যরূপে পরিগণিত হয়।

স্বর্গীয় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (বাঙ্গালা ১১৯০ ইং ১৭৮৩ সালে) রাজ্য লাভ করেন। সেই সময় এই রাজ্যের বলরামপুর নামক স্থানের খগেন্দ্রনারায়ণ নাজিরদেওর অতিশয় আধিপত্য ছিল; উক্ত নাজিরদেওর তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ কুমারকে রাজা করার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল। এই অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণ কুমার সৈন্যসহ রাজধানী আক্রমণ করিয়া রাজমাতা মহারাণী কমতেশ্বরী ও শিশু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে ধৃত করিয়া বলরামপুরে আবদ্ধ রাখেন। তৎপর শচীনন্দন মুস্তোফী মহাশয়ের ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের প্রার্থনাক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে তাঁহারা নাজিরদেওর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া রাজধানীতে আগমন করেন। গৌরীনন্দনের পুত্র শিবপ্রসাদ মুস্তোফী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময় খাসনবীশী, মুস্তোফীগিরি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আহেলকারী ও সরবরাহকারী, খানগির কর্ম্ম ও দ্বারের কর্ম্মাদি প্রধান প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। তৎপুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ মুস্তোফী মহাশয় রাজসরকারে কর্ম্ম না করিলেও স্বর্গীয় মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের আমলে রাজসরকার হইতে তৎকালীন কুচবেহারে প্রচলিত "নারায়ণী" টাকায় ভাতা পাইতেন; ইহার কন্যা শ্যামাসুন্দরী দেবীর পুত্র ও তৎবংশধরগণ এখনও ভিতরকুটীস্থ শিবমন্দিরের পূজাদি নির্ব্বাহ করাইতেছেন। শচীনন্দন মুস্তোফী মহাশয়ের পুত্র রবিনন্দন মুস্তোফী মহাশয় স্বর্গীয়

মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ও মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের আমলে কিছুকাল মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন; ইনি নিঃসন্তান ছিলেন ও ইঁহার ভ্রাতা হরনন্দন মুস্তোফী রাজসরকারে কুল্লহারের জমানবীশ ছিলেন এবং এইজন্য ইঁহার "হিসাবিয়া" আখ্যা হয়। ইঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় ব্রজনন্দন মুস্তোফী স্বর্গীয় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে (বাঙ্গালা ১২০৪ হইতে ১২১৭ পর্য্যন্ত) নিকাশীর কার্য্যকারকত্ব, দ্বারের কর্ম্ম, খানগির দেওয়ানী ও মুস্তোফীগিরি, দেওয়ানী ও কুচবেহারের মহারাজের জলপাইগুড়ি জেলাস্থিত সুবৃহৎ জমিদারী চাকলাজাতের দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন; ইনি মহারাজের অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন এবং মহারাজের খাস দপ্তরের যে সমস্ত চিঠিপত্র মহারাজের দস্তখত হইত তাহা ইনি লিখিয়া দিতেন। হরনন্দন মুস্তোফী মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় কালীশচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের আমলে দরিবাজে জমির কার্য্যনির্ব্বাহকারক ছিলেন; তৎপর (বাং ১২৬৭ ইং ১৮৬০ সাল) আসা, সোঁটা মসনৰ প্রাপ্ত হয়েন। বাঙ্গালা ১২৬৮ (ইং ১৮৬১) সালে পূর্ব্ব আফিস না থাকায় কোম্পানী-টাকায় খোরাকী প্রাপ্ত হয়েন এবং এই সনে আপীল-আদালতের বিচারকের পদে নিযুক্ত হইয়া ইংরাজি ১৮৬৪ বাং ১২৭১ সন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করেন। কালীশচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয়ের পুত্র ৺শ্যামচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয় রাজসরকারে কোনও কর্ম্ম না করিলেও রাজসরকারের বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন এবং আজীবন ভাতা পাইয়াছিলেন। ইনি এ অঞ্চলে বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। চক্ষুচিকিৎসায় ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল এবং ইঁহার চিকিৎসাগুণে বহুলোক বিনা অস্ত্রোপচারে দুরারোগ্য ও জটিল চক্ষুরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিত। ইঁহার তিন পুত্র—জগদীশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও কামাখ্যাপদ; তন্মধ্যে যোগেশচন্দ্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ও অন্য দুইজন বর্ত্তমান

আছেন। জগদীশচন্দ্রের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র বি·এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিতেছেন।

স্বর্গীয় ব্রজনন্দন মুস্তোফী মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয় রাজসরকারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; ইনি স্বকীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে বহু সম্পত্তি অর্জ্জন ও প্রভূত অর্থাদি মজুত রাখিয়া যান। ইঁহার পুত্র ৺বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুস্তোফী। বৈকুণ্ঠচন্দ্র স্বর্গীয় মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের আমলে (বাঙ্গালা ১২৬৯ ইংরাজি ১৮৬২ সাল) তাঁহার পৈতৃক দৃষ্টান্তে বান ও নাকারা, নিশান, আসা, সোঁটাদি মনসব ও নারায়ণী-টাকায় মাসিক খোরাকী প্রাপ্ত হয়েন। ইনি ইংরাজি ১৮৬১ সালে নিকাশীকার্য্যকারকের পদ প্রাপ্ত হয়েন ও স্বর্গীয় মহারাজা কর্ণেল স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি-সি-আই-ই, সি-বি'র নাবালকী আমলে ইং ১৮৬৪ সালে কমিশনার হটন সাহেবের সময়ে উক্ত পদ রহিত হওয়ায় তৎকালীন দেওয়ান ৺নীলকমল সান্যাল মহাশয়ের এসিষ্ট্যান্ট-পদে নিযুক্ত হন ও ইং ১৮৬৯ সন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল সাহেব বাহাদুর এই রাজ্য পরিদর্শন করিতে আগমন করিলে ইনি উক্ত ছোটলাট বাহাদুরের নামে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য একটী বৃত্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে ১,০০০৲ টাকা দান করেন; অদ্যাপি ঐ বৃত্তি প্রচলিত রহিয়াছে। গৌরীনন্দন ও শচীনন্দন মুস্তোফীকে প্রদত্ত ৬৬২৪ বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি ইং ১৮৭৪ বাং ১২৮১ সাল পর্য্যন্ত ইঁহার দখলে থাকে; তৎপর ঐ ভূমির পরিমাণ কমিশনার আমুটী সাহেবের কৃত লাখেরাজ রেজেষ্টারী বহিতে গড়মিল হওয়ায় বাজেয়াপ্ত হয় ও এই সম্পর্কে ইনি আবেদন করেন। বাঙ্গালা ১২৮৪ সনে ইঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়ায় ইঁহার শিশুপুত্র সতীশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের নাবালকী দরুণ সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে যাওয়ায় ঐ আবেদনে কোনও আদেশ না হইয়া উহা সেরেস্তায় রাখিতে

হুকুম হয়। ইনি একজন সুদক্ষ শিকারী ও ঘোড়সোয়ার ছিলেন। বৈকুণ্ঠচন্দ্র তিন বার দারপরিগ্রহ করেন, প্রথমা পত্নী ৺দুর্গাসুন্দরী জলপাইগুড়ি জেলার পাঠগ্রাম-নিবাসী জমিদার ৺ঈশানচন্দ্র হিসাবিয়া মহাশয়ের কন্যা ছিলেন এবং ইঁহারই দুই পুত্র সতীশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র; দ্বিতীয়া জগৎমোহিনী গোবরডাঙ্গার গঙ্গোপাধ্যায়-বংশীয়া ও তৃতীয়া নগেন্দ্রবালা কলিকাতা ভবানীপুরের হালদার-বংশীয়া; ইঁহারা দুই জনেই জীবিতা আছেন এবং কাহারও সন্তানাদি হয় নাই। সতীশচন্দ্র ১২৭৩ সনের ২৩শে কার্ত্তিক ও সুরেশচন্দ্র ১২৭৯ সনের ১৬ই অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। সতীশচন্দ্র কলিকাতা বহুবাজারের বিখ্যাত ৺হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশের স্বনামধন্য ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী হেমনলিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার তিন পুত্র ও চারি কন্যা; প্রথম পুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম ১২৯৬ সনের ২৩শে আষাঢ়, দ্বিতীয় নির্ম্মলচন্দ্রের জন্ম ১২৯৮ সনের ৩০শে পৌষ, প্রথমা কন্যা সুভাষিণীর জন্ম ১৩০২ সনের ৯ই ভাদ্র, দ্বিতীয়া কন্যা সরোজবাসিনীর জন্ম ১৩০৪ সনের ১৯শে মাঘ, তৃতীয়া কন্যা নীলাব্জ-বাসিনীর জন্ম ১৩০৭ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ, তৃতীয় পুত্র শৈলেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম ১৩০৯ সালের ২৭শে মাঘ ও চতুর্থী কন্যা কল্যাণীর জন্ম ১৩১৯ সালের ১৩ই মাঘ হয়। সকলেই বর্ত্তমান আছেন ও কনিষ্ঠা কন্যা ব্যতীত সকলেরই বিবাহ হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের বিবাহ হাজারিবাগের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী মুকুলকুমারীর সহিত ১৩১০ সালের ১৭ই মাঘ সম্পন্ন হয়। নির্ম্মলচন্দ্রের বিবাহ তেলিনীপাড়ার (হুগলী) বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশীয় জমিদার শ্রীযুক্ত নৃপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী উষাবতীর সহিত ১৩২০ সালের ১৮ই মাঘ সম্পন্ন হয় এবং তৃতীয় পুত্র শৈলেন্দ্র-

চন্দ্রের বিবাহ ১৩৩২ সালের ১৭ই ফাল্গুন কলিকাতা বহুবাজারের বিখ্যাত মতিলাল-বংশের ৺যতীন্দ্রনাথ মতিলাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী উমারাণীর সহিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রের এক পুত্র শ্রীমান্ পৃথ্বীশচন্দ্র (জন্ম ১৩১২ সালের ১০ই মাঘ) ও এক কন্যা শ্রীমতী বাণী দেবী (জন্ম ১৩৩০ সালের ৬ই কার্ত্তিক)। নির্ম্মলচন্দ্রের দুই পুত্র ও এক কন্যা—প্রথম পুত্র বিমলচন্দ্রের জন্ম ১৩২৩ সালের ১৫ই মাঘ, দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম ১৩২৫ সালের ২১শে শ্রাবণ হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী উমারাণী। ১৩৩৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে শৈলেন্দ্রচন্দ্রের একটী পুত্র হইয়াছে। প্রথমা কন্যা সুভাষিণীর বিবাহ কৃষ্ণনগর-নিবাসী কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺রায় দেবেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র রায় বাহাদুর মল্লিনাথ রায়ের সহিত হইয়াছে এবং ইঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা বর্ত্তমান। দ্বিতীয়া সরোজবাসিনীর বিবাহ ঢাকা জেলার বিখ্যাত রোয়াইলের জমিদার-বংশীয় শ্রীযুক্ত অমূল্যমোহন রায়ের সহিত হইয়াছে ও ইঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান। তৃতীয়া নীলাব্জবাসিনীর বিবাহ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র-মোহনের সহিত হইয়াছে; ইঁহার তিনটী পুত্র। সুরেশচন্দ্রের বিবাহ রংপুর জেলার নত্তিভাঙ্গার বিখ্যাত জমিদার রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বক্সী মহাশয়ের সহোদরা ভগিনী শ্রীমতী সরযূবালার সহিত হইয়াছে ও ইঁহার এক কন্যা রাধারাণীর জন্ম ১৩০০ সালের ১৬ই শ্রাবণ হয়। রাধারাণীর বিবাহ গরলগাছা-নিবাসী সবজজ ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত তরুণাঙ্গনাথের সহিত হয় এবং রাধরাণী একটী পুত্র শ্রীমান্ ব্যোমকেশ ও একটী কন্যা শ্রীমতী চণ্ডীকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন; এই পুত্র ও কন্যা এক্ষণে মাতামহের নিকটেই আছে। সতীশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের শৈশবাবস্থায়

কুচবেহারের স্বর্গীয় স্বনামধন্য মহারাজ স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর নাবালক ছিলেন এবং রাজ্য গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ছিল। গভর্ণমেণ্ট নাবালক মহারাজ ও তৎসঙ্গে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতকগুলি বালককে লইয়া একটী ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন (Wards Institution) সৃষ্টি করিয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাশীধাম, পাটনা, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায় পাঠান এবং এইরূপে সতীশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাটনা, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায় যান। সতীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ-সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন ও রাজ্যে প্রচলিত আইনের পরীক্ষায় পাশ করেন। ১২৯২ সনের ১১ই মাঘ ৩৭৬ রাজশকাব্দায় সতীশ-চন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রকে স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ৩৩৫ বিঘা ১৬ ধূর ভূমি ব্রহ্মত্র প্রদান করেন; উভয় ভ্রাতাই বংশের রীত্যনু-যায়ী বিবাহাদি শুভকার্য্যে রাজসরকার হইতে অনুগ্রহ-নিদর্শনস্বরূপ হাতী, সিপাহি, বল্লমবরদার পাইয়াছেন। সতীশচন্দ্র ইং ১৮৯০ সালে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত হন; তৎপর ক্রমে ক্রমে সব-নায়েব আহেলকার, রাজসভার সেক্রেটারী, দার্জ্জিলিং এষ্টেটের একটিং ম্যানেজার, বিভিন্ন মহকুমার ভারপ্রাপ্ত নায়েব-আহেলকার (ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট), ভাইস-চেয়ারম্যান টাউন কমিটি, কুচবেহার রাজ্যের মন্ত্রিসভার মেম্বার ও শিক্ষাসচিব, প্রেসিডেণ্ট কমিটী অফ এপয়েণ্টমেণ্ট (President, Committee of Appointment), প্রেসি-ডেণ্ট এডুকেশন কমিটি (President, Education Committee) এবং সর্ব্বশেষ সুপারিনটেনডেণ্ট অফ এডুকেশন (Superintendent of Education) অবস্থায় ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কুচবেহারের স্বর্গীয় মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ১৮৯৭ সালে ডায়মণ্ড জুবিলি উপলক্ষে সতীশচন্দ্রকে আসা, সোঁটা প্রদান

করেন। ১৯০৩ সালে দিল্লীতে দরবার উপলক্ষে সঙ্গে লইয়া যান এবং "রায় চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত করেন; ঐ সালের ১লা মে তারিখে অনারারি এ-ডি-কং পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৯০৫ সনে তৎকালীন মহামান্য প্রিন্স অফ ওয়েলসের (বর্ত্তমানে মহামান্য ভারত-সম্রাট) লেভীতে উপস্থিত করেন। সতীশচন্দ্র রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ভূম্যধিকারিগণের পক্ষীয় মেম্বর আছেন। সতীশচন্দ্র কর্ম্মময় জীবনে কেবল কর্ম্মেতে থাকিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, ললিতকলারও যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে, আলোকচিত্রে, উদ্ভিদবিদ্যায়, জ্যোতিষশাস্ত্রে ইঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ও খ্যাতি আছে, বয়সকালে দক্ষ শিকারী ছিলেন এবং নানাবিধ ক্রিয়ায় যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। ইনি "ফ্রি ম্যাসন"-(Free Mason) সঙ্ঘের অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি একজন সুনিপুণ সেতারী এবং ইঁহার কুচবেহারের বাসভবনস্থ অর্কিড হাউস (Orchid house) একটী বহুমূল্যবান সামগ্রী এবং এ অঞ্চলে ইঁহার সমকক্ষ নাই বলিলেও হয়। কর্ম্মজীবনের অবসানে এক্ষণে ইনি শিলং শৈলে সুরম্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বৎসরে প্রায় ৬ মাস কাল তথায় অবস্থান করেন এবং উদ্ভিদবিদ্যার ও সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলনে কাল যাপন করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র রাজসরকারে কোন কার্য্য না করিলেও কুচবেহারাধিপতি ভূতপূর্ব্ব মহারাজার তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে ইঁহারও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি এবং সুদক্ষ শিকারী বলিয়া খ্যাতি আছে। স্বর্গীয় মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ইঁহাকে "রায় চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ইনি উক্ত মহারাজ ও তদীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অনারারি এ-ডি-কং ছিলেন এবং ইনিও আসা-সোঁটা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র স্বর্গীয় মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অনারারি

এ-ডি-কং ছিলেন এবং উক্ত মহারাজ কর্ত্তৃক ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে প্রতিষ্ঠিত এডুকেশন কমিটির মেম্বার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত কমিটির উপর কুচবেহার রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগীর যাবতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার ভার ছিল। ইনিও সঙ্গীতানুরাগী এবং নানাবিধ ক্রীড়ায় ও শিকারে ইঁহার দক্ষতা আছে। ইনি কোচবেহার সাহিত্য-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুদিন ইহার সহঃসম্পাদকত্ব করিয়াছেন এবং বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যে ইনি লিপ্ত আছেন। ইনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ফ্রী মেসন সম্প্রদায়ের উচ্চপদারূঢ় হইয়াছেন।

নির্ম্মলচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া গৌহাটীর আইন কলেজ হইতে বি-এল পাস করেন এবং তৎপর ১৯১৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে স্বর্গীয় মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ইঁহাকে দিনহাটা মহকুমার সহকারী নায়েব আহেলকার নিযুক্ত করেন। নন-কো-অপারেশনের ঢেউ যখন এ রাজ্যে প্রবেশ করে তখন ইঁহাকে মাথাভাঙ্গা মহকুমার স্পেশ্যাল (special) নায়েব-আহেলকার করিয়া পাঠান হয়। ইনিও একজন সুদক্ষ শিকারী এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।

শৈলেন্দ্রচন্দ্রের এখনও পাঠ্যাবস্থা; তিনি কুচবেহার ভিক্টোরিয়া কলেজে বি-এসসি পড়িতেছেন।

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত।

বরিশালবাসী—বরিশালবাসী কেন, সমগ্র বঙ্গবাসী যাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, যাঁহার শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ছাত্রগণ জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, বাঙ্গালার জাতীয় যজ্ঞের সেই হোতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পৈতৃক বাসভূমি বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে। এই গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে অশ্বিনীকুমার জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ আদিশূর দত্ত-বংশীয়দিগকে বাসের জন্য এই গ্রামখানি দান করেন। পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর নারায়ণ দত্ত মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে বৈদেশিক সচিব বা "মহাসন্ধিবিগ্রহিক"-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অশ্বিনীকুমার এই নারায়ণ দত্তের বংশ-সম্ভূত। অশ্বিনীকুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ১৭৪৭ শকাব্দের ৩রা আশ্বিন রবিবার বাটা-জোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের উকিল ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজমোহন মুনসেফ-পদে নিযুক্ত হন। মুনসেফ হইবার পর তিনি স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ মনো-মোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী এই প্রসন্নময়ীরই গর্ভে অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। তখন ব্রজমোহন লাউকাঠি চৌকিতে (বর্ত্তমান পটুয়াখালী মহকুমা) মুনেসফী করিতেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় পটুয়াখালি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রজমোহন এই নব-নির্ম্মিত মহকুমায় একাধারে মুনসেফী, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী ও কালেক্টরী এই তিন কাজ করিতেন।

অতঃপর ব্রজমোহন কৃষ্ণনগরে বদলী হইয়া তথাকার ছোট আদালতের জজ হন। ব্রজমোহন অতীব ধার্ম্মিক ছিলেন। তৎপ্রণীত

"মানব" নামক গ্রন্থে তিনি দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে, জগতের পাপপুণ্য সম্বন্ধে অনেক আধ্যাত্মিক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রজমোহন বেদান্তশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাব অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ব্রজমোহন বরিশালেই বাস করিতে থাকেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে "ব্রজমোহন বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অশ্বিনীকুমারেরা তিন ভাই; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যামিনীকুমার কলিকাতায় বি-এ পড়িবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন; তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কামিনীকুমার ইংরাজি, ফরাসী, লাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তিনিও অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কাজেই ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর অশ্বিনীকুমারেরই স্কন্ধে বিধবা জননী, দুই ভগিনী এবং কামিনীকুমারের নাবালক তিন পুত্র ও দুই কন্যার লালন-পালনের ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হয়।

অশ্বিনীকুমার শৈশব ও বাল্যে পিতার সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থানে ঘুরিতেন। যাহাতে পুত্রের চরিত্রে কোনও রূপ কলুষতা প্রবেশ করিতে না পারে সেদিকে ব্রজমোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পুত্রদিগকে শাসন করিতেন না অথবা প্রহারও করিতেন না। যাহাতে অশ্বিনীকুমার কোনও প্রকারে অসৎ সংসর্গে না মিশিতে পারে সেইদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে অশ্বিনীকুমার এফ্ এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতায় মেশে থাকিয়া তিনি যখন এম-এ পড়িতেন, তখন পিতা মাতা নিকটে না থাকিলেও তিনি এমনই ভাবে অসৎ সংসর্গ হইতে আত্মরক্ষা করিতেন যে, কেহ তাহার সম্মুখে কোন প্রকার কুৎসিত কথা বলিতে

সাহস করিত না। একদিন তিনি অপরাহ্ণকালে ভ্রমণ করিয়া মেশে ফিরিবার পর শুনিতে পান যে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুইটি বালক তাঁহার ঘরে বসিয়া অতি কুৎসিত কথা বলিয়াছে। তিনি সেই কথা শুনিয়া এতদূর দুঃখিত হন যে, তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ধৌত করিয়া তবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেন।

বাল্যকাল হইতেই অশ্বিনীকুমার উপাসনাপ্রিয় ছিলেন। তিনি একটি উপাসনা-সমিতি গঠন করিয়া তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা করিতেন। অশ্বিনীকুমার অতি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি এফ্-এ পাস করিবার পর একদিন জানিতে পারেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহার প্রকৃত বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর, অথচ ষোল বৎসরের কমে পরীক্ষা দেওয়া যায় না বলিয়া তাঁহার বয়স ষোল বৎসর লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রথমে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে এই ব্যাপার আনিলেন, কিন্তু কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, তাঁহাদের এবিষয়ে আর এখন কিছু করিবার উপায় নাই। অগত্যা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট সমস্ত কথা বলিলেন, রেজিষ্ট্রার তাঁহার কথা পাগলের পাগলামী বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অতঃপর অশ্বিনীকুমার দুই বৎসর পাঠ বন্ধ রাখিয়া তবে এই মিথ্যার সংশোধন করেন।

ছাত্রজীবনে অশ্বিনীকুমার ৺রামতনু লাহিড়ী-প্রমুখ অনেক মহাপুরুষের সংসর্গ লাভ করিয়া স্বীয় চরিত্রকে উন্নত করিবার অবকাশ লাভ করিয়াছিলেন। ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চরিত্রও অশ্বিনী-কুমারের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্-এ পড়িতে আগমন করেন, তখন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। অশ্বিনীকুমার যে পরিণত বয়সে মহাতেজস্বীপুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার মূলে

ছিল কেশবচন্দ্রের প্রেরণা। ইহা ব্যতীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রেরণাও অশ্বিনীকুমার লাভ করিয়াছিলেন। যে রামকৃষ্ণের সংশ্রবে আসিয়া কলেজের নব্য যুবক নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন, সেই পরমহংসদেবের সংশ্রবে আসিয়া অশ্বিনীকুমার যে খাঁটি সোণায় পরিণত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি !

অশ্বিনীকুমারের বয়স যখন ১৮ বৎসর মাত্র, তখন তিনি যশোহরে একটি "ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিয়া স্বয়ং তথায় উপাসনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। ১৯ বৎসর বয়সে অশ্বিনীকুমার চাতরা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তখন ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জগদীশ মুখোপাধ্যায় তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং উত্তরকালে ইঁহারাই আবার ব্রজমোহন কলেজে অশ্বিনীকুমারের সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারেরই চেষ্টায় চাতরা স্কুলটির অনেক প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের হৃদয় হইতে কলুষ ভাব বিদূরিত হইয়া উহাতে নৈতিক ভাবের আধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি ছাত্রদের সহিত একত্র মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া, এক কথায় তাহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তবে তাহাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতেন। ছাত্রদের সঙ্গে এই ভাবে মেলা-মেশা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পক্ষে অসহ্য হয়। তিনি অশ্বিনীকুমারকে ডাকিয়া ধমক দিয়াও দেন, কিন্তু সেই ধমকে স্বাধীনচেতা অশ্বিনীকুমার আপন সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

অশ্বিনীকুমারের বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর মাত্র এবং যখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, তখন বাখরগঞ্জ জেলার মিরবহর রায়-বংশের কন্যা সরলাবালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রজমোহন বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার টাকাকড়ির বিশেষ অপ্রতুলতা ছিল না, তিনি ছোট আদালতের জজ ছিলেন।

সরলাবালা যদিও নিজে শিক্ষিতা বালিকা ছিলেন না, তথাচ তিনি স্বামীর নিকট শুনিয়া শুনিয়া অথবা স্বামীর সহিত এদেশ ওদেশ নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। তিনি অনেক স্থানের ইতিহাস, ভৌগোলিক বিবরণ, অনেক পুরাতন শাস্ত্রের কথা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন।

অশ্বিনীকুমার বিবাহিত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোনদিন স্ত্রীর সহিত কোন প্রকার কায়িক সংযোগ সাধন করেন নাই, পত্নীকে নিকটে রাখিয়াও যে কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করা যায়, ইহা অশ্বিনী কুমার তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী যখন পঞ্চদশবর্ষীয়া, তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে স্বাভিপ্রায় লিখিয়া জানান যে, তিনি কোনও রূপ কায়িক সংযোগ না রাখিয়াও তাঁহার সহিত স্বামীস্ত্রীর ন্যায় বাস করিবেন। সতী সাধ্বী সরলাবালা কোনও দিন স্বামীর ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক হন নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীকে সেই অনুমতি প্রদান করিলেন। অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছা ছিল কতকগুলি অবিবাহিত যুবক কর্ম্মী গঠন করা। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, বাঙ্গালার ন্যায় দরিদ্র দেশে হাজার শিক্ষিত হইলেও কেহ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধতা হেতু দেশের কোনও কাজ করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সহকর্ম্মী জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ লাহিড়ী ও নগেন্দ্রনারায়ণ রায় বিবাহ করেন নাই।

এম্-এ পাশ করিবার পর অশ্বিনীকুমার এলাহাবাদের প্লীডারশিপ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইচ্ছা করিলে তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করাইতে পারিতেন, কিন্তু গোলামীতে যে মানুষের মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট হয়, এ সত্য ব্রজমোহন নিজে দীর্ঘকাল সরকারী চাকরী করিয়া উপলব্ধি

করিয়াছিলেন। কাজেই অশ্বিনীকুমারকে তিনি স্বাধীনভাবে ওকালতী করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মাত্র তিন বৎসরকাল ওকালতী করিয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিলে পরিণত হইলেন। ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এক সময় বলিয়াছিলেন যে, অশ্বিনীকুমার যদি মনোযোগ দিয়া শুধু আইনের ব্যবসায় করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব হইতে পারিতেন। কিন্তু ওকালতী করিতে গেলে যে মিথ্যা কথা না বলিয়া থাকা যায় না, ইহা অশ্বিনীকুমার দেখিতে পাইলেন এবং অচিরাৎ ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পবিত্র শিক্ষকতা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যেদিন অশ্বিনীকুমার ওকালতী পরিত্যাগ করেন, সেদিন দেশের পক্ষে মহাসৌভাগ্যের দিন, সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহারই ত্যাগের দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তীকালে অনেক যুবককে ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল।

ওকালতী পরিত্যাগ করিবার পর তদীয় পিতৃদেব শিক্ষকতা করিতে অশ্বিনীকুমারের প্রবল আগ্রহ দর্শনে তাঁহার জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা ১৮৮৪ অব্দের ২৭শে জুনের কথা। অশ্বিনীকুমার এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষকতা-পদ গ্রহণ করেন। সরকার হইতে তাঁহাকে কোন এক সরকারী বিদ্যালয়ে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনের শিক্ষকতা দেওয়া হয়, কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা গ্রহণ না করিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করিতে থাকেন। অন্যান্য উচ্চ ইংরাজী স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট যে যে পুস্তক অধ্যাপন করা হইত, ব্রজমোহন বিদ্যালয়েও তাহা করা হইত বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রকে কতকগুলি স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় এবং নৈতিক নিয়ম পালন করিতে হইত। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, উপাদেয় পুস্তকাদি অধ্যয়ন ইত্যাদি প্রকারের অনেক নিয়ম ছাত্রগণকে

মানিতে হইত। অশ্বিনীকুমার প্রতিদিন রাত্রিকালে লণ্ঠন হাতে করিয়া ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেন। তিনি ছাত্রদিগকে বলিতেন, তোমাদের সহিত আমার সম্বন্ধ ১০টা—৪টা পর্য্যন্ত নহে, পরন্তু সর্ব্বসময়েই। অশ্বিনীকুমারের গৃহ সর্ব্বদা লোকে পরিপূর্ণ থাকিত।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন ব্রজমোহন বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার তাঁহার এই কলেজে বি-এ ক্লাস খুলিয়া কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীতে পরিণত করেন। তাঁহার বিশিষ্টতার জন্য বরিশালে সেই সময়ে যে "রাজচন্দ্র কলেজ" ছিল তাহা উঠিয়া যায়। অবশ্য অশ্বিনীকুমার রাজচন্দ্র কলেজটিকে ব্রজমোহন কলেজের সহিত একত্রীভূত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজচন্দ্র কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই সাধুপ্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় কলেজটির ঐরূপ শোচনীয় পরিণতি হয়। ব্রজমোহন কলেজে Band of unity, Band of hope, Band of mercy, the Little Brothers of the poor,Debating Club,Sporting Club প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল, এইগুলির ভিতর দিয়া ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রদের মনে দেশসেবা, আর্ত্তের সেবা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ বিকশিত হইয়া উঠিত। কোথাও কাহারও গৃহে আগুণ লাগিলে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রেরা গিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিত, কোথাও কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে উক্ত কলেজের ছাত্রেরা দ্বারে দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া সেই সমস্ত বুভুক্ষিতের অন্নাভাব দূর করিত। আজ কেবল আমরা কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে সেবা-সমিতি, হিতসাধন-মণ্ডলী প্রভৃতি নানা দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের নাম শুনিতে পাই, কিন্তু এইগুলির প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মনে কল্পিত হইবার পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন কলেজে উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে

শিক্ষা-প্রচার-কার্য্যের সাধু উদ্দেশ্য লইয়া মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিট্যান কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই অশ্বিনীকুমার বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৭।১৮ বৎসরকাল বিনাবেতনে উক্ত কলেজের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন এবং এই কলেজের জন্য ন্যূনকল্পে ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

একাদিক্রমে বিশ বৎসরকাল ব্রজমোহন কলেজের কাজ বেশ নির্ব্বিঘ্নেই চলিল। বড় বড় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, ব্রজমোহন কলেজে ছাত্রগণের চরিত্র যেরূপ গঠিত হয়, সেরূপ আর বঙ্গদেশের কোথাও হয় না। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হইবার পর সরকারী কর্ম্মচারীদের সে মতিগতির পরিবর্ত্তন হইল। যে কলেজের ছাত্রগণ একসময়ে সরকারের নিকট আদর্শস্থানীয় ছিল, আজ তাহারা মস্ত বড় রাজদ্রোহীতে পরিণত হইল। সে ১৯০৫ সালের কথা। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তখন পূর্ব্ববঙ্গের ছোট লাট। তিনি স্থির করিলেন, বরিশালে বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনের এই যে তুমুল আন্দোলন হইতেছে, এ সমস্তের উৎস ব্রজমোহন কলেজ। তখন কর্ত্তৃপক্ষ কলেজের ছাত্রগণকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা ও এফ্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও বৃত্তিলাভ করিতে পারিলেন না, শ্রীমধুসূদন সরকারও প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও বৃত্তি পাইলেন না। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রদের পক্ষে সরকারী কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইল, তাহাদিগকে আর সরকারী চাকুরীতে গ্রহণ করা হইল না। শুধু ইহাই নহে, কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবশূন্য (Disaffiliate) করিবার জন্যও ফুলারী গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার বা ভাইস্-চ্যানসেলার ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি লাট-বেলাটের কুচক্রে পড়িয়া আপন স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি ব্রজমোহন কলেজের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য প্রথমে মিঃ পি কে রায় ও পরে মিঃ জেম্‌স্ ও কানিংহাম সাহেবকে বরিশালে প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিলেন যে, ব্রজমোহন কলেজ সম্বন্ধে যেসকল অভিযোগ হইয়াছে সেসকলই মিথ্যা।

কিন্তু তথাচ লাট ফুলারের জেদ কমিল না, তিনি অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নির্ব্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। অশ্বিনীকুমার তখন বরিশালবাসীর প্রাণের রাজা। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার নির্দ্দেশে তখন বরিশালবাসী উঠে ও বসে। কাজেই ফুলার সাহেব ভাবিলেন, বরিশালবাসীকে স্বদেশী ব্রতের উদ্‌যাপন হইতে নিরস্ত করিতে গেলে অশ্বিনীকুমারকে নির্ব্বাসন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসিত হইলেন। পূর্ব্ববঙ্গের সরকার মনে করিয়াছিলেন, এইবার ব্রজমোহন কলেজ উঠিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা হইল না। প্রিনসিপাল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ বলিলেন, কোন ছাত্র হতাশ হইও না, কলেজ কিছুতেই উঠিবে না, আমি দশ টাকা বেতনে কার্য্য করিতে হয় তাহাও করিব, তত্রাচ কলেজ উঠিতে দিব না। কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া কলেজটিকে একটি কমিটির হস্তে অর্পণ করিতে হয়। কর্তৃপক্ষ কলেজ রক্ষা সম্বন্ধে যে বহুল ব্যয়সাধ্য প্রস্তাব করেন, কলেজের মধ্যবিত্ত স্বত্বাধিকারিগণ সে প্রস্তাবানুসারে কাজ করিতে না পারায় তাঁহারা কলেজটিকে একটি কমিটির হস্তে অর্পণ করেন। কেবল স্কুলটি মাত্র তাঁহাদের অধীন থাকে।

অশ্বিনীকুমার বরিশালকে কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া তাঁহার স্বদেশী সাধনা

উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতের নেতা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করাও তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভের অভিপ্রায় যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই লোকমান্য তিলক অথবা লালা লাজপত রায়ের ন্যায় নিখিল বঙ্গের নেতৃত্বের আসনে বসিতে পারিতেন। সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গ হইবার পর তাঁহাকে তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি জাতীয়পন্থিগণ কংগ্রেসের সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলেও, অশ্বিনীকুমার কখনও সভাপতি-পদে উপবেশন করেন নাই। তিনি বরিশালকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, বরিশাল তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, সিদ্ধি সমস্তই ছিল।

অশ্বিনীকুমার অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা শুধু তাঁহার মৌখিক ইচ্ছা ছিল না। তিনি সত্য সত্যই অস্পৃশ্যদিগের সহিত একাসনে বসিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনের যখন মহাধূম, তখন একটি লোক এক নমঃশূদ্রকে বলিল, তোমরা ত স্বদেশী স্বদেশী বলিয়া এরূপ মাতিয়াছ, একবার যাও দেখি বাবুদের কাছে, কেমন তোমাদিগকে একাসনে লইয়া বসে! এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য এক নমঃশূদ্র যুবক একদিন অশ্বিনীকুমারের নিকট যায়, অশ্বিনীকুমার তখন একখানি ফরাসে বসিয়া। নমঃশূদ্রটি তাঁহাকে অভিবাদন করিবামাত্র তিনি তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন এবং ফরাসে তাহাকে বসিতে দিলেন। তখন অশ্বিনীকুমার আগন্তুককে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, যে কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসা হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

অশ্বিনীকুমার যখন প্রথমে বরিশালে গিয়া কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করেন তখন বরিশালের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। লোকে বিদ্যা অপেক্ষা

ধনকে বড় মনে করিত। বিদেশী ভদ্রলোকের থাকিবার কোনও ঘর কিংবা হোটেল ছিল না, যাহারা থাকিত তাহারা বাধ্য হইয়া বেশ্যালয়ে নিশা যাপন করিত। অশ্বিনীকুমারের চেষ্টায় বরিশাল হইতে মদের দোকান ও পতিতা নারীদের আস্তানা উঠিয়া যায়।

নির্ব্বাসিত হইবার পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার "বিকাশ" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার ও তাহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয়। ১৯০৬ অব্দে বরিশাল সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বহু শত প্রতিনিধি বরিশালে উপস্থিত হন। দেশপূজ্য ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺মতিলাল ঘোষ, ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কলিকাতা হইতে এই কন্‌ফারেন্সে গমন করেন। ব্যারিষ্টার এ রসুল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কর্ত্তৃপক্ষ রাজপথে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে নিষেধ করেন। এই কন্‌ফারেন্সে পুলিশ অযথা লাঠি চালায়; সুরেন্দ্রনাথকে পুলিশ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেবের বাড়ীতে লইয়া যায়। অশ্বিনীকুমার এমার্সনের কক্ষে প্রবেশ করিলে তাঁহার মাথায় টুপি নাই বলিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮ ধারায় সুরেন্দ্রনাথের দুই শত টাকা জরিমানা হইল, সুরেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন আদালত-অবমাননার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের আরও দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাহা না করিয়া বলিলেন—I respectfully decline to apologise. I have done nothing wrong.

সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য হাইকোর্টে আপীল করায় জরিমানার টাকা ফেরত পাইয়াছিলেন। সেই কন্‌ফারেন্সে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে অশ্বিনাকুমার সমাগত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স শেষ হইবার পর বরিশালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অশ্বিনীকুমার দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের সাহায্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার স্নানাহারের পর্য্যন্ত অবকাশ ছিল না। তিনি ১৬০টি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া তথা হইতে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদিগকে চাউল;, ডাইল প্রভৃতি সাহায্য করিতেন।

১৯০৮ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসিত হন। লক্ষ্ণৌ কারাগারে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। তিনি কারাগারে বসিয়া ভগবৎচিন্তা করিতেন। লক্ষ্ণৌ কারাগারে থাকিবার সময় অশ্বিনীকুমার অধ্যয়ন করিবার সবিশেষ অবসর পান এবং এই সময়ে তিনি অনেক ভগবৎ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক অনেক কবিতা এবং গান প্রাচীন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইত। ধর্ম্মমতে তিনি উদারচেতা হিন্দু ছিলেন। সরকার মনে করিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারকে কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া তাঁহারা, তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহা হয় নাই। কারাগারে বরং তিনি এত মনের আনন্দে দিন কাটাইতেন যে, তাঁহার মুখ ও লেখনী দিয়া অনবরত দেশ-প্রেমের স্ফূর্ত্তিমূলক গানসমূহ বাহির হইত। তাঁহার স্বরচিত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ কারাগারে একখানি বাঁধান খাতা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, অশ্বিনীবাবু নিশ্চয়ই স্বরচিত জীবনচরিত লিখিতেছেন। তিনি মুক্তি পাইলে বঙ্গসাহিত্যের আর একটি সম্পদ বাড়িবে বলিয়া অনেকে আশা করিয়া বসিয়াছিলেন। তাই অশ্বিনীবাবু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী মুক্তিলাভ করিয়া আসিবামাত্র তাঁহার ভক্তেরা গিয়া জীবনচরিতের পাণ্ডুলিপি প্রার্থনা করেন। অশ্বিনীবাবু তাঁহাদের হাতে সেই বাঁধান খাতাখানা ফেরত দিয়া বলিলেন, এই লও

আমার জীবনচরিত। সতীশবাবু খাতাখানা উল্‌টাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত পাতা দেখিয়া বলিলেন, এই খাতার সমস্ত পাতাগুলিই যে সাদা! অশ্বিনীবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেখ খাতাখানার উপরের মলাটখানি আমার জন্ম-পত্রিকা আর শেষদিককার মলাটখানি আমার মৃত্যুপত্রিকা। ইহার মাঝে যে সাদা পাতাগুলি দেখিতেছ উহাই আমার জীবন—জীবন-মৃত্যুর মধ্যভাগটা সবই ফাঁকা, বুঝিলে ত? ভক্তেরা সকলে তাঁহার রসিকতার মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অস্তিত্ব দেখিয়া অবাক্ হইল।

অশ্বিনীকুমার বহুভাষাবিৎ ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। উপনিষদ্, গীতা ও ভাগবত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। আর তাঁহার স্মরণ-শক্তির কথা বলিব কি! তিনি টেনিসন্, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, বাইরণ, সেলি প্রভৃতি বড় বড় কবিদের কবিতা অনায়াসে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীকুমার ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতাগুলি শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সেই অমূল্য বক্তৃতা-গুলি একত্র সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার "ভক্তিযোগ" গ্রন্থ রচিত হয়। 'ভক্তিযোগে'র ন্যায় তত্ত্বোপদেশপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ যে বাঙ্গালায় আর নাই, একথা সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে অনেক সাহিত্যরথী একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ'-পাঠে আমরা জানিতে পারি, কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সদালাপ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভগবানে মতি রাখিলে মুক্তি তাহার নিকট আপনিই আসে। কেমন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি পরাজয় করিয়া দাস্য,সখ্য প্রভৃতি দ্বারা ভক্তির সোপানে আরোহণ করা যায় অশ্বিনীকুমার 'ভক্তিযোগে' অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সে সকল বিবৃত করিয়াছেন। ভক্তি-

যোগ ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি নানাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। রোগ-শয্যায় বসিয়া অশ্বিনীকুমার "কর্ম্মযোগ" লেখেন। যদি তিনি সুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে 'কর্ম্মযোগ' যে সুবৃহৎ গ্রন্থ হইত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'কর্ম্মযোগে' অশ্বিনীকুমার ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবমাত্রকেই কর্ম্ম করিতে হয়, কাহারও কর্ম্ম না করিয়া একদণ্ড চুপ করিয়া থাকিবার উপায় নাই। তবে সে কর্ম্ম নিষ্কাম হওয়া চাই।

বাঙ্গালা ১৩০০ অব্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বান্ধব সমিতিতে অশ্বিনীকুমার "প্রেম" সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন। এই তিনটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে "প্রেম" নামে প্রকাশিত হইযাছে। 'প্রেম' পুস্তকেও তিনি ভগবৎপ্রেমই যে জগতের সার বস্তু এই তত্ত্বই নিরূপণ করিয়াছেন। প্রেমলাভ করিতে গেলে ভগবানে গতি থাকা দরকার। স্বার্থবিহীন না হইলে কখনও প্রেমলাভ করা যায় না। প্রেমলাভ করিতে গেলে স্বার্থবিহীন হইতে হয়। যিনি প্রেমিক, তিনি প্রেমাস্পদের নিকট হইতে প্রেমের প্রতিদান চাহেন না, তিনি ভালবাসিয়াই সুখী হন।

তাঁহার অপর একখানি পুস্তকের নাম 'দুর্গোৎসব তত্ত্ব'। এই পুস্তকে তিনি মায়ের সর্ব্বব্যাপিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আদ্যাশক্তি মা—শুধু ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকেন না, চামারের বাড়ীতেও তিনি সমভাবেই অধিষ্ঠিতা হন, এই সত্যটুকুই তিনি 'দুর্গোৎসবতত্ত্বে' লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার সংসারী ছিলেন; জমিদারী, মহাজনী প্রভৃতি বৈষয়িক ও সাংসারিক অনেক বিষয় তাঁহাকে ভাবিতে হইত। কিন্তু এ সমস্ত ভাবনার মধ্যেও তিনি তাঁহার প্রাণকে দেশের দিকে রাখিয়াছিলেন। তিনি একদিকে যেমন মামলা-মোকদ্দমার নথিপত্র দেখিতেন, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে ও ধর্ম্মালোচনায় কখনও আলস্য করিতেন না।

শুকদেব যেমন মিথিলার রাজপথ, অট্টালিকা প্রভৃতি গণনা করিয়াও তাঁহার একটি চোখ রাখিয়াছিলেন তৈলপ্রদীপের দিকে, তেমনি অশ্বিনীকুমারও বিষয়-সরোবরে ডুবিয়া থাকিলেও মন ছিল তাঁহার ভগবানের দিকে। তিনি জীবনে যে কত সাধু মহাত্মাগণের সংসর্গ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। কোন স্থানে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ছুটিতেন। কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী, বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়া বাবা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কোনও সাধুর সহিতই তিনি দেখা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

দীর্ঘ চৌদ্দমাস কাল অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ কারাগারে থাকিয়া যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই নষ্ট স্বাস্থ্য আর তিনি ফিরিয়া পান নাই। নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রজমোহন কলেজটিকে সরকারের হস্তে অর্পণ করেন। যদি সরকারী প্রস্তাবে তিনি রাজি না হইতেন তাহা হইলে কলেজটিকে একেবারে তুলিয়া দিতে হইত ; কিন্তু তাহার ফলে বরিশালবাসী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইবে— শুধু এই আশঙ্কায় অশ্বিনীকুমার কলেজটিকে সরকারের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে দেশবাসী দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমারকে সভাপতির আসনে বরণ করিয়া সমিতিকে গৌরবান্বিত করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি লোকশিক্ষা, স্বাস্থ্য, সালিসী বিচার প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। এই কনফারেনসের পর বহুদিন যাবৎ অশ্বিনীকুমার রোগশয্যায় পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। তিনি হিন্দী, আরবী,

ফারসী, উর্দ্দু, মারাঠি, গুরুমুখী প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কাজেই কোন স্থানেই তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় নাই। যেখানেই যাই-তেন, সেইখানেই লোকের সঙ্গে অবাধে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। লোকমান্য তিলক-মহারাজের "কেশরী" পত্র পড়িবার জন্য তিনি মহারাষ্ট্র ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতার স্পেশাল কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন অনেকেই তাহার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই বরিশালে আবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। অশ্বিনীকুমার এবারও জরাজীর্ণ দেহে প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করেন।

১৯২৩ অব্দের ৭ই নভেম্বর পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার ৫৯নং চক্রবেড়ে রোড ভবানীপুরে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় সে সংবাদ পৌঁছিবা-মাত্র সহস্র সহস্র লোক কেওড়াতলা শ্মশান পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় শ্মশানে গিয়া তাঁহার শবের পদধূলি গ্রহণ করেন। অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুতে দেশের সর্ব্বত্র শোকপ্রকাশ হইয়াছিল।

পর পৃষ্ঠায় স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের বংশ-পত্রিকা দেওয়া হইল :—

বংশ-পত্রিকা
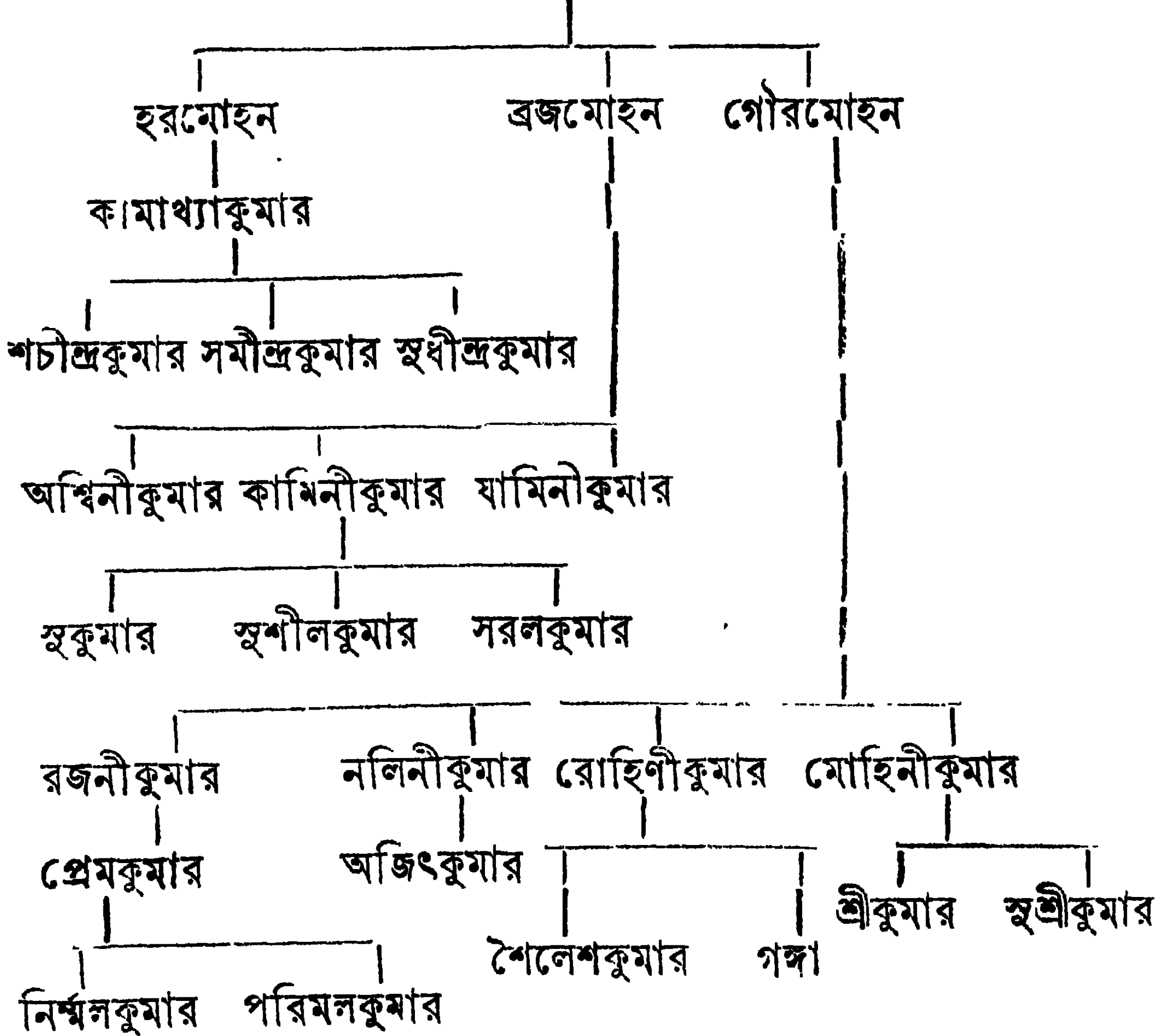
১। নন্দকিশোর দত্ত—ইনি সব সময় জপ-তপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন।

২। হরমোহন দত্ত—ইনি খুব বুদ্ধিমান এবং অনেক স্থান হইতে ইহাকে সালিশ মান্য করিত।

৩। ব্রজমোহন দত্ত—ইনি Small Causes Courtএর Judge ছিলেন।

৪। গৌরমোহন দত্ত—ইনি জজ কোর্টের উকিল ছিলেন।

৫। রজনীকুমার দত্ত—ইনি অনেক সময় জপ-তপ কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন এবং ইহার জীবিতাবস্থায় ইহার নিকট অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন। মাঝে মাঝে ইহার সমাধিতে সাধু সন্ন্যাসী আসেন।

৬। সুকুমার দত্ত—ইনি এম-এ, বি-এল্। ওকালতী করেন না। ইঁহার প্রণীত দুইখানি অমূল্য ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ইনি দিল্লী রামজাস কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

৭। সুশীলকুমার দত্ত—এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।

৮। সরলকুমার দত্ত—এম-এ; ইনি কিছুদিন অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া দেশমাতৃকার আহ্বানে দেশের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে ইনি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত বিভুচরণ গুহ ঠাকুরতার কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। সাবিত্রী দেবী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত টাকী-নিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা ও ডাক্তার এস-এন রায়ের ভগিনী শ্রীমতী জ্যোতিঃ দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। জ্যোতিঃ দেবী আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত পাবনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। হেমলতা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট।

ইঁহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল সরকার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গুহের সহিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল ইঁহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা জেলার পাওয়াদিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশের সন্তান।

নদীয়ার মল্লিকবংশ।

নদীয়া জিলার মধ্যে মাটীয়ারীর মল্লিকবংশ একটী অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। মাটিয়ারী তাঁহাদের আদি বাসস্থান। এই মাটিয়ারী গ্রামে নদীয়া রাজবংশের স্থাপয়িতা ভবানন্দ মজুমদার বাদসাহ আকবরের নিকট ফারমান প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম স্বীয় রাজধানী

আবাস

স্থাপন করেন। কালের কুটীল গতিতে এই মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। যৎকালে ভবানন্দ মজুমদার এই সমৃদ্ধ পল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই মল্লিকগণ এখানে বসবাস করিতেছিলেন। মল্লিকগণ মান-সম্ভ্রমে ও বিদ্যায় তত্রত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। "মল্লিক" উপাধি তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আদি উপাধি "পাল"।

এই বংশের গৌরবশালী বংশধর শ্রীনারায়ণ স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে দিল্লীদরবার হইতে "মল্লিক" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি এই বংশীয়েরা বাদশাহ-দত্ত এই সম্মানকে গৌরবাত্মক মনে করিয়া আপনাদের উপাধিস্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ভবানন্দ মজুমদারের শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ নামে তিন পুত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে মধ্যম গোপাল পিতৃ-অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। এই হেতু ভবানন্দ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে মাসোহারা বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পিতার এই পক্ষপাতে রুষ্ট হইয়া একজন বিশ্বস্ত, কার্য্যক্ষম ও বহু-ভাষাবিদ্ মন্ত্রী নারায়ণের সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করেন এবং তথায়

নারায়ণ মল্লিক

আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে এবং উক্ত মন্ত্রির লিপি-কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া উখড়া প্রভৃতি কয়েকটী পরগণার চিরস্থায়ী দখলের ফারমান লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

করেন। উক্ত মন্ত্রীর লিপিকুশলতায় প্রীত হইয়া বাদসাহ তাঁহাকে "মল্লিক" অর্থাৎ সুলেখক এই উপাধি দেন।

বাদসাহ-দত্ত সম্মান ও ভূম্যধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার দেহাবসান হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল যাবতীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব পিতৃ-রাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটিয়ারী হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই রেউই বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হইলেও রাজা গোপাল মন্ত্রী নারায়ণকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দেন নাই। এই সময় হইতেই নদীয়া-রাজবংশের সহিত মল্লিক-বংশের যেন একটী স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

মাটীয়ারী হইতে কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে মল্লিকগণও রাজপরিবারের সহিত রেউইতে আইসেন এবং তথায় বসতবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সময় মল্লিকদিগের আত্মীয়-স্বজন ও অনুগত জন এত অধিক ছিল যে, রেউইয়ের যে অংশে তাঁহারা সুরম্য বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন উহা "মল্লিক-পল্লী" নামে খ্যাত হইয়া উঠিল এবং ফুল ও ফলের বাগানে ঐকান্তিক আনুরক্তি হেতু তাঁহাদের বংশ 'বাগানের মল্লিক' নামে খ্যাত হয়। রেউই কৃষ্ণনগর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং মল্লিক-বংশও কালক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া দেশ-দেশান্তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত মল্লিকপল্লী ও সুবিস্তীর্ণ মল্লিক-পুষ্করিণী প্রভৃতি কৃষ্ণনগরে আজিও মল্লিকগণের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

কৃষ্ণনগর মল্লিকপল্লী

মল্লিকগণ কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করিতে থাকিলে নদীয়াধিপতি রাজা রাঘব মল্লিকবংশের প্রতি তাঁহার বংশের স্বভাবগত ভালবাসা ও

করুণা প্রদর্শন করিবার জন্ত বংশানুক্রমিক এই বংশীয়গণকে তাঁহার প্রধান করদাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন এবং প্রতিবৎসর শুভ পুণ্যাহের দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কর-গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন।

মল্লিকবংশীয়গণ পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের ভূস্বামিদত্ত এই সম্মান বহুদিন যাবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত রাজ-সংসারের সহিত এই বংশীয়গণের বিশিষ্ট সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে কাহাকেও পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুভদৃষ্টি ব্যতীত সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিত না।

বারোয়ারী পূজা।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরে আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা যায়। সেটী মল্লিকদিগের বারোয়ারী পূজা। কথিত আছে, এরূপ সমারোহে বারোয়ারী পূজা বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কার্য্যের অধ্যক্ষতা করিতেন। এই বারোয়ারী মণ্ডপে দশভুজার সম্মুখে প্রতি বৎসর লক্ষ বলি প্রদান করা হইত।

মসলিনের ব্যবসায়

এই সময় এই বংশীয় কতিপয় উদ্যমশালী যুবক ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গঞ্জ হইতে সূক্ষ্ম মসলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে রপ্তানি করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে, তাঁহারা ঢাকা, এনাতগঞ্জ, কলিকাতা ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের আড়ত খুলিয়া দেন এবং রাণাঘাটে একটী নীলকুঠী স্থাপন করেন। মসলিনের ব্যবসায়ে তাঁহাদের এরূপ উন্নতি হইয়াছিল যে, কথিত আছে,—মল্লিক পরিবারের দাস-দাসীরাও ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিত। এই সকল আড়তের মধ্যে

রাণাঘাট শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহারা রাণাঘাটের আড়তের প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের লোকান্তর হইলে পরম ভাগবত হরেকৃষ্ণ মল্লিক রাণাঘাটে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রাণাঘাটের সিদ্ধেশ্বরীতলায় সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা যেরূপ সমৃদ্ধির সহিত বার মাসে তের পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করিতেন তাহা রাণাঘাটে আজিও প্রবাদের ন্যায় আছে।

রাণাঘাটের পালচৌধুরীগণেরও এই সময়ে সবিশেষ অভ্যুদয় হয়।

রাণাঘাট ত্যাগ

কৃষ্ণপান্তী স্বীয় অধ্যবসায় ও উন্নত চরিত্রবলে যে কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়া যায়েন তদীয় দেহান্তে তাঁহার বংশধরগণ বিষয়মদে মত্ত হইয়া মল্লিকদিগের সহিত নানাছলে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে মল্লিকদিগের বস্ত্র-ব্যবসায়ের অবনতি হইতে থাকায় তাঁহারা পালচৌধুরীদিগের সহিত নিরর্থক কলহে ব্যাপৃত না হইয়া ১২৫০ সালে তাঁহাদিগের বিপদসম্পদের সহায় গৃহদেবতা শ্রীধরকে লইয়া রাণাঘাট ত্যাগ করেন।

রাণাঘাট হইতে পতিতপাবন মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার সাত ভাই সপরিবারে কলিকাতায় তাঁহাদের প্রিয় সুহৃদ্ নবীনকৃষ্ণ সিংহের নিকট গমন করেন এবং তথায় তাঁহার সাহায্যে বংশবাটীতে নীলের কুঠী চালাইয়া লক্ষ্মীর কৃপালাভ করেন। তাঁহার জীবন পুরুষোচিত গুণাবলীতে পূর্ণ ছিল। নীলের ব্যবসায়ে তাঁহার বিশেষ অভ্যুদয় হয়। তিনি ১২৫৩

রাণাঘাটে পুনরাগমন

সালে কলিকাতায় মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন এবং তদুপলক্ষে রাণাঘাটের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও তিলি সমাজকে নিমন্ত্রিত করিয়া কলিকাতায় তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করেন। বিশেষতঃ এই উপলক্ষে কলিকাতার কায়স্থ সমাজের মধ্যে সিংহবাবুদের ও শোভাবাজারের রাজবংশের সর্ব্বপ্রথম সমন্বয় হয়। রাণাঘাটের পালচৌধুরীগণ তাঁহাদের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া মল্লিকদিগকে বৈবাহিক

সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে রাণাঘাটে আনয়ন করেন। তদবধি ইঁহারা রাণাঘাটে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের আধুনিক বংশধরগণের মধ্যে ৺কালীকুমার ও ৺রাখালদাস মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাবু কালীকুমার রাণাঘাটের যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট দিলেন। স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে রাণাঘাটে যে বৎসর মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়, সেই বৎসর হইতে একাধিক্রমে তত্রত্য অধিবাসিবর্গ তাঁহাকে অন্যতম কমিশনার নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি যেরূপ সকলের মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেন তদ্রূপ বন্ধুবৎসল ও সহৃদয় দরিদ্রবন্ধু ছিলেন। ১৩১৮ সালের ১৩ই আষাঢ় ৫২ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

কালীকুমার

কালীকুমারের দুই পুত্র—কুমুদনাথ ও নৃপেন্দ্রনাথ। কুমুদনাথ ১২৮৭ সালের ১৬ই ভাদ্র তারিখে রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি দেখা যায় এবং তখন হইতেই তিনি কবিতা ও গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার লিখিবার শক্তি উৎকর্ষ লাভ করে। কলিকাতার জেনারাল এসেমব্লির অধ্যক্ষ মরিসন সাহেবের নিকট ইংরাজি সাহিত্য ও সুবিখ্যাত দার্শনিক ষ্টিফেন্সের নিকট দর্শনশাস্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট নবন্যায় অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে নানা সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহিত এই সময়ে তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই সম্পাদিত ও বংশবাটীর রাজকুমারগণের দ্বারা প্রচলিত 'পূর্ণিমা'নাম্নী মাসিক পত্রিকায় কুমুদনাথ ধারাবাহিকরূপে নদীয়া-কাহিনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধপাঠে জনসাধারণের বিশেষ আনুরক্তি

কুমুদনাথ

দেখিয়া ও সাময়িক সমস্ত সংবাদপত্রাদিতে উচ্চতম প্রশংসা লাভ করিয়া তিনি নদীয়ার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক ১৩১৭ সনের ১৪ই ভাদ্র তারিখে তাঁহার 'নদীয়া কাহিনী' প্রকাশ করেন। জনসাধারণ এই পুস্তক সাদরে গ্রহণ করেন; ফলে ছয় মাসের মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্য, সতীদাহ, চাঁদমুখ, হজরত মহম্মদ, মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পুস্তকও বিশেষ সমাদৃত হয়। কুমুদনাথের সাহিত্যানুরাগে প্রীত হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'পণ্ডিতরত্ন' উপাধি দেন এবং মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় মৌলবীগণ "জাওহারে মুরারে রাখিন' অর্থাৎ ইতিহাস-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই উপাধি প্রদান করেন। সম্প্রতি তিনি Annals of Nadia এবং Sati Rite নামক দুইখানি ইংরাজি পুস্তক সঙ্কলন করিতেছেন। বৈষয়িক কর্ম্মে সতত নিরত থাকিলেও তাঁহার লেখনীর বিশ্রাম নাই।

বাঙ্গালাদেশে কৃষির অবনতি দেখিয়া তিনি উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থ স্বয়ং প্রচুর অর্থব্যয়ে কৃষিকার্য্যে রত আছেন। তিনি ও তাঁহারা সহোদর এতদর্থে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন। রাণাঘাটে ও সৎসন্নিহিত কয়েকটী স্থানে স্থাপিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র দেখিতে দূরদূরান্তর হইতে লোকে নিত্য আসিতেছে। কৃষিবিষয়ক অভিনব প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন দেখাইয়া লোকশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। যে কেহ সেখানে যাইয়া বিনাব্যয়ে অনায়াসে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতে পারেন। গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট কুমুদনাথের এইসকল সদ্গুণের পুরস্কারস্বরূপ ১৯২২ সালের ৩রা জুন তারিখে মহামান্য ভারতসম্রাট সপ্তম জর্জ্জের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রকাশ্য দরবারে বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুর কুমুদ-

বাবুকে খেলাত প্রদান-কালে নিম্নলিখিত ভাষায় অভিনন্দিত করেন—

"Your loyalty and your anxiety to improve the agricultural condition of your tenants have shown you to be a model of what a Zemindar should be. Your attitude is deserving all commendations."

কুমুদনাথের একমাত্র সন্তান শ্রীশচীন্দ্রনাথ সন ১৩১১ সালের ২৩শে আষাঢ় তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউটে, ঢাকা গবর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে ও ভোপাল রাজ্যের মন্ত্রী কৃষিবিশারদ অনারেবল হাদীর নিকট কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পিতার প্রতিষ্ঠিত ফার্ম্মে কৃষিবিভাগের ভারগ্রহণ করিয়াছেন এবং নৃপেন্দ্রবাবুকে সাহায্য করিতেছেন।

কুমুদনাথের সহোদর নৃপেন্দ্রনাথ ১৮০৭ শকে ১০ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত রাণাঘাটের যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রাণস্বরূপ। তাঁহার পাঁচ পুত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ, জয়নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও ধ্রুবনারায়ণ এবং দুইটী কন্যা—বাসন্তী ও স্নেহলতা। কুমুদনাথ ও নৃপেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন বাঙ্গালার এক অতি প্রাচীন বংশসম্ভূত তেমনি আবার তাঁহারা নদীয়ার অপর বিখ্যাত বংশ দে চৌধুরী বাবুদের স্বনামধন্য রামলাল দে চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র। স্বনামধন্য রামলাল দে চৌধুরী ১২৭৪ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে একমাত্র দুহিতা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কুমুদনাথের পিতা সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরী-বংশীয় জ্যেষ্ঠ শাখার জয়গোপাল পাল চৌধুরীর দৌহিত্র। বাবু জয়গোপালও অতি অল্প বয়সে একমাত্র দুহিতা রাখিয়া পরলোক

গমন করেন। কালীকুমার বাবুরা তিন সহোদর। কনিষ্ঠ রাজেন্দ্র-কুমার অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মধ্যম মহেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রের নাম ভুজেন্দ্রনাথ।

তাঁতিবন্ধ জমিদার-বংশ।

উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ত্তমান তাঁতিবন্ধ জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ, জমিদার-বংশ এবং জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ; ইঁহার পূর্ব্ব উপাধি সান্যাল ছিল। ১১৪০ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। ইনি অনেক দেবদেবী ও বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভক্তিযোগ দ্বারা ইনি দেবী মহামায়ার সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ বিগ্রহ স্থাপন করেন। ভগবানের নাম সর্ব্বদা স্মরণ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার পুত্রের নামের সহিত তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ বিগ্রহের নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ঐ প্রথানুসারে তাঁহার বংশধরগণের নামকরণ হইয়া আসিতেছে। ইঁহার একমাত্র পুত্র গঙ্গাগোবিন্দের সময়ে অনেক ভূসম্পত্তির সৃষ্টি হয়। ইনি বসতবাড়ীর দক্ষিণে দীর্ঘ ছয় বিঘা স্থান-ব্যাপী বিস্তীর্ণ একটী পুষ্করিণী খনন এবং প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার নামানুসারে "গঙ্গাসাগর" বলিয়া উহা অভিহিত হয়। অদ্যাপি ঐ পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে। গঙ্গাগোবিন্দের প্রথম পক্ষের পুত্র গুরুগোবিন্দ এবং দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দুর্গাগোবিন্দ ও বরদাগোবিন্দ। এই গুরুগোবিন্দ হইতে বর্ত্তমান বড় তরফ ও নওয়া তরফের সৃষ্টি হইয়াছে এবং দুর্গাগোবিন্দ হইতে মধ্যম তরফ ও বরদাগোবিন্দ হইতে ছোট তরফ সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহাদের সময়ে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। এই গুরুগোবিন্দের সময় সম্পত্তির আয় কিঞ্চিদধিক লক্ষ মুদ্রা হইয়াছিল। ইনি অনেক বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া তন্মধ্যে তিনটী বপুঃ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত পাবনা জেলার অন্তর্গত সুজানগর গ্রামে

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার নাম তদঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। তাহার সেবার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত তিনি করিয়া গিয়াছেন।

এই গুরুগোবিন্দের সময় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ "গোবিন্দ রায়ে"র দোলযাত্রার জন্য একটী প্রসিদ্ধ দোলমঞ্চ বিখ্যাত মুর্শিদাবাদের শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হয়। নয় গম্বুজ বিশিষ্ট ঐ চৌতল দোলমঞ্চের সর্ব্বোচ্চ গম্বুজের উপরিস্থ গগনস্পর্শী চূড়া ভারতীয় শিল্পকলার পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছে। ১২৪৮ বঙ্গাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে উহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৩৫০ সনে শেষ হয়।

গুরুগোবিন্দের প্রথম পক্ষের পুত্র বিজয়গোবিন্দ বিখ্যাত বাবু ও সৌখীন পুরুষ ছিলেন। বিজয়বাবুকে না চিনিত বা তাঁহার নাম না শুনিয়াছিল এরূপ লোক তৎকালে বিরল ছিল। তিনি অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি পুষ্করিণী আদির পঙ্কোদ্ধার ও নূতন রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁতিবন্ধ হইতে সুজানগর যাইবার জন্য তিনি প্রায় অর্দ্ধমাইল পরিমিত স্থান "সড়ক" বা রাস্তা নির্ম্মাণ করতঃ সর্ব্বসাধারণের যাতায়াত সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বসত-বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণী হইতে উত্তর দিকে মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া তথা হইতে বর্ষাকালে যথেচ্ছ গমনাগমন জন্য পুষ্করিণী হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল পরিমিতস্থান তিনি প্রণালী কাটাইয়া উত্তর দিকস্থ বিলের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ রাস্তায় তাঁহার বজরা (Boat) যাতায়াত করিত। ইহাতে বর্ষাকালে সর্ব্বস্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়-ব্যপদেশে ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে বড় বড় নৌকাদি এই রাস্তায় তাঁতিবন্ধ যাতায়াত করিয়া থাকে। ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহকালে ইনি ইংরেজ সরকার বাহাদুরের সহায়তা করিয়া গভর্ণমেণ্টের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ইনি একজন সুদক্ষ শিকারী ছিলেন। সাহেব-মহলে

ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। শিকার-উপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত সাহেব তাঁতিবন্ধে যাতায়াত করিতেন। বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণের সঙ্গে তিনি যখন শিকারে বাহির হইতেন, সে অপূর্ব্ব দৃশ্যে নয়ন-মন মুগ্ধ হইত এবং হস্তীর বৃংহতি, অশ্বের হ্রেষারবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিত। তৎকালীন জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত সাহেব অধিকাংশ সময় অতিথিরূপে তাঁহার তাঁতিবন্ধ খাস ভবনে অবস্থান করিতেন। তৎকালীন রাজসাহী বিভাগের কমিশনার নোলেন সাহেব তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শিকার উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতের তৎকালীন গবর্ণর জেনারল লর্ড মেয়ো বাহাদুর সদলবলে ইহার প্রাসাদে শুভাগমন করতঃ রাজভক্তির পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত এই বংশের চির সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একটী কামান ও যথেচ্ছ বন্দুক, তরোয়াল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বিনা লাইসেন্সে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, লর্ড মেয়ো এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই আন্দামানে যান এবং তথায় গুপ্তঘাতক-হস্তে নিহত হন; নতুবা তিনি উপাধি-দানে এই বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

৺অভয়গোবিন্দ বাবু অতি সরল এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী আদির পঙ্কোদ্ধার, গ্রাম্য রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। ইনিই পাবনা ব্যাঙ্কের সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের হিতকল্পে ইনি প্রথমতঃ ইহার পাবনাস্থ বাটীতে অল্প সুদে টাকা দিবার ব্যবস্থায় একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। কালক্রমে ইহাই পাবনা ব্যাঙ্ক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পাবনা দাতব্য চিকিৎসালয়ে কলেরা রোগীর থাকিবার ও চিকিৎসার কোন

বন্দোবস্ত ছিল না। ইনি নিজ ব্যয়ে উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে কলেরা রোগীর থাকিবার বন্দোবস্ত জন্য "কলেরা ওয়ার্ড" প্রস্তুত করাইয়া দিয়া জনসাধারণের মহদুপকার সাধনা করেন। কত বিপদগ্রস্থ দুঃস্থ রোগী উক্ত ওয়ার্ডে অবস্থান করতঃ চিকিৎসিত হইয়া কল্যাণকারী মহাপুরুষের মঙ্গল-কামনায় দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পাবনা সহরে জুবিলী ট্যাঙ্ক (লক্ষ্মীসাগর) নামীয় জলাশয় যে ভূমিখণ্ডের উপর খনন করা হয় তাহা তিনি দান করিয়াছিলেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষীরোদগোবিন্দ অতি অমায়িক এবং দেবতুল্য পুরুষ। স্বজনবাৎসল্য এবং আত্মীয়প্রীতি ইঁহাতে সমধিক বর্ত্তমান। ইঁহার সময়ে নূতন সম্পত্তি আদি অর্জ্জন দ্বারা সম্পত্তির আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। মুক্তাগাছার বিখ্যাত রাজবংশের অন্যতম সরিক ৺অমৃত-নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ মহাসমা-রোহে সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহে নবদ্বীপের বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং কুলীন সমীকরণ হইয়াছিল। ইনি দীর্ঘকাল অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইঁহার পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান।

অভয়গোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র তারকগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি। বিষয়কর্ম্মে ইনি অত্যন্ত সুদক্ষ। জমিদারী, মহাজনী প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার প্রভূত তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নিজে "জমিদারী শিক্ষা" "মহাজনী শিক্ষা" প্রভৃতি পুস্তকপ্রণেতা; ইনি পাবনার বিখ্যাত শিল্পসঞ্জীবনী কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ। ইঁহারই অদম্য যত্ন ও বুদ্ধিবলে উক্ত শিল্পসঞ্জীবনীর বিস্তৃত কারখানা পরিচালিত হইতেছে এবং শিল্পকলার ক্রমোন্নতিতে পাবনার উক্ত কোম্পানীর গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার প্রভৃতি বঙ্গদেশে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। পাবনার অধিকাংশ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরস্বরূপ কার্য্য করিয়া

তিনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান। ভূম্যধিকারিগণের সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় ও সম্পত্তিও নষ্টপ্রায় হয়। তন্নিবারণকল্পে ইনি প্রাইভেট জমিদারী কোম্পানী গঠিত করিয়া সম্পত্তি-ধ্বংস-পথ-রোধের চেষ্টা করিতেছেন।

অভয়গোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তারাগোবিন্দ উদ্যমশীল যুবক। তিনি জ্ঞানদাগোবিন্দ প্রভৃতি জমিদারবর্গের সহযোগিতায় তথায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নিজেরা এষ্টেট হইতে মোটা সাহায্য-প্রদানে এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট আংশিক সাহায্য-গ্রহণে উহা পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষার বিস্তারকল্পেও তাঁহার চেষ্টা ও আন্তরিক সহানুভূতি আছে। অত্রত্য অধিবাসিগণ বিষয়-কর্ম্ম-উপলক্ষে অধিকাংশই বিদেশবাসী হওয়ায় স্থানীয় এণ্ট্রান্স স্কুলটি উঠিয়া যায়। তৎপর হইতেই শিক্ষার কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। মৃত নলিনীনাথ বাগচীর যত্নে ও চেষ্টায় এবং ইঁহার সহযোগিতায় এই গ্রামে পুনরায় একটী মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে এবং দরিদ্র পল্লীবাসিগণের সন্তান-সন্ততিগণ শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইঁহার অদম্য চেষ্টায় তাঁতিবন্ধে একটি কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দুর্গাগোবিন্দের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। ইনি এবং বরদাগোবিন্দ একত্র একটি গগনস্পর্শী নয় গম্বুজবিশিষ্ট চৌতল দোলমঞ্চ বিখ্যাত মুর্শিদাবাদের শিল্পিগণ দ্বারা প্রস্তুত করান। ইহা ছোট দোলমঞ্চ নামে অভিহিত। উভয় দোলমঞ্চই প্রায় সমসাময়িক। দত্তক সুখদাগোবিন্দের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান তাঁহার সময়ে হইতে পারে নাই।

তাঁহার পুত্র শ্রীগোবিন্দ একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক; অনেক সৎকার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাগ, যজ্ঞ, পুরশ্চরণ প্রভৃতিতে

তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং ১৮০ কালীপূজা দ্বারা তিনি মহাকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তিনি একজন স্বভাব কবি ও শক্তি সাধক। ভ্রান্তিবিলাস, নুরজাহান, মালা, বাঁশী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। সংস্কৃতে তাঁহার রচিত বহু শ্লোক আছে, অথচ তিনি কোনও দিন সংস্কৃত পড়েন নাই, ইহার আরও আশ্চর্য্যের বিষয়।

বরদাগোবিন্দের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত দোল-মঞ্চ প্রতিষ্ঠা ইহার একটী কীর্ত্তি। ভগবান ইহাকে অকালে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লওয়ায় সৎকার্য্যসমূহ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

দত্তক অন্নদাগোবিন্দ অতি সরল উদারহৃদয় ছিলেন। অনেক সৎকার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি পাবনা জেলার টাউনের উপর একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন, অদ্যাপি উহা "অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী" নামে খ্যাত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহার চারি পুত্র বর্ত্তমান।

জ্যেষ্ঠ জ্ঞানদাগোবিন্দ অতি অমায়িক, উদারহৃদয় এবং বিষয়-কর্ম্মে অতি দক্ষ, কিন্তু সহসা পত্নী-পুত্র-বিয়োগে নানাপ্রকার শোক-দুঃখে এবং অকালে তাঁহার স্মরণশক্তি লুপ্ত হওয়ায় তিনি এক্ষণে ভগবৎ-চিন্তায় দিন কাটাইতেছেন। ইহার উদ্যোগেই তাঁতিবন্ধে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইনিই উহার প্রাণস্বরূপ বলিতে হইবে। তিনি এ যাবৎ স্বীয় এষ্টেট হইতে সাহায্য-প্রদানে ঐ সৎকার্য্যটী বজায় রাখিয়াছেন। ইনি স্থানীয় হিন্দুসভার প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক।

মধ্যম পুত্র প্রমদাগোবিন্দ অতি সজ্জন পুরুষ। ইনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি প্রকাণ্ড হোমিওপ্যাথিক লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। ইনি ধনী-নির্ধন সকলকেই হোমিওপ্যাথিক-মতে

চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ভারতমঙ্গল কটন মিল নামে একটী গেঞ্জির কারখানা পাবনা সহরে ইনি সম্প্রতি স্থাপন করিয়াছেন। ইনি পাবনাতে প্রাণ্ড শিল্প-সঞ্জীবনী নামে একটী মোজা গেঞ্জির কারখানা খুলিয়াছিলেন এবং স্বদেশজাত দ্রব্য সুলভে প্রচার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম পাবনায় একটী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেশের লোকের স্বদেশী দ্রব্যের উপর অনুরাগ সৃষ্টি করাইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ইঁহারা সকলেই সহরবাসী।

ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়গোবিন্দ অতি উদ্যমশীল পুরুষ। ইনি একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বিখ্যাত শিকারী। শিকারে ইঁহার সমধিক আগ্রহ দেখা যায়।

সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রাণগোবিন্দ সবে মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে অনেক সৎ কার্য্য সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইঁহাদের প্রায় সকলেরই বহু সন্তান-সন্ততি হইয়াছে। তাঁতিবন্দের দুর্গোৎসব এই জমিদার-বংশের একটী উজ্জ্বল কীর্ত্তি। বুধ নবমী হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়াদশমী পর্য্যন্ত ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। মলমাস পড়িলে দেড় মাস পূজা হয়।

(ক)

(খ)
গুরুগোবিন্দ চৌধুরী
প্রথম পক্ষ
বিজয়গোবিন্দ
গোপালগোবিন্দ (দত্তক)
শ্রীশগোবিন্দ (দত্তক)
বর্ত্তমান বড়তরফ
দ্বিতীয় পক্ষ
অভয়গোবিন্দ
ক্ষীরোদগোবিন্দ
তারকগোবিন্দ
তারাগোবিন্দ
বর্ত্তমান নওয়া তরফ
(গ)
দুর্গাগোবিন্দ
সারদাগোবিন্দ
(মৃত)
সুখদাগোবিন্দ
(দত্তক)
শ্রীগোবিন্দ
(ঘ)
বরদাগোবিন্দ
অন্নদাগোবিন্দ
(দত্তক)
জ্ঞানদা-
গোবিন্দ
প্রমদা-
গোবিন্দ
হৃদয়-
গোবিন্দ
প্রাণ-
গোবিন্দ
কন্যা
৭টী
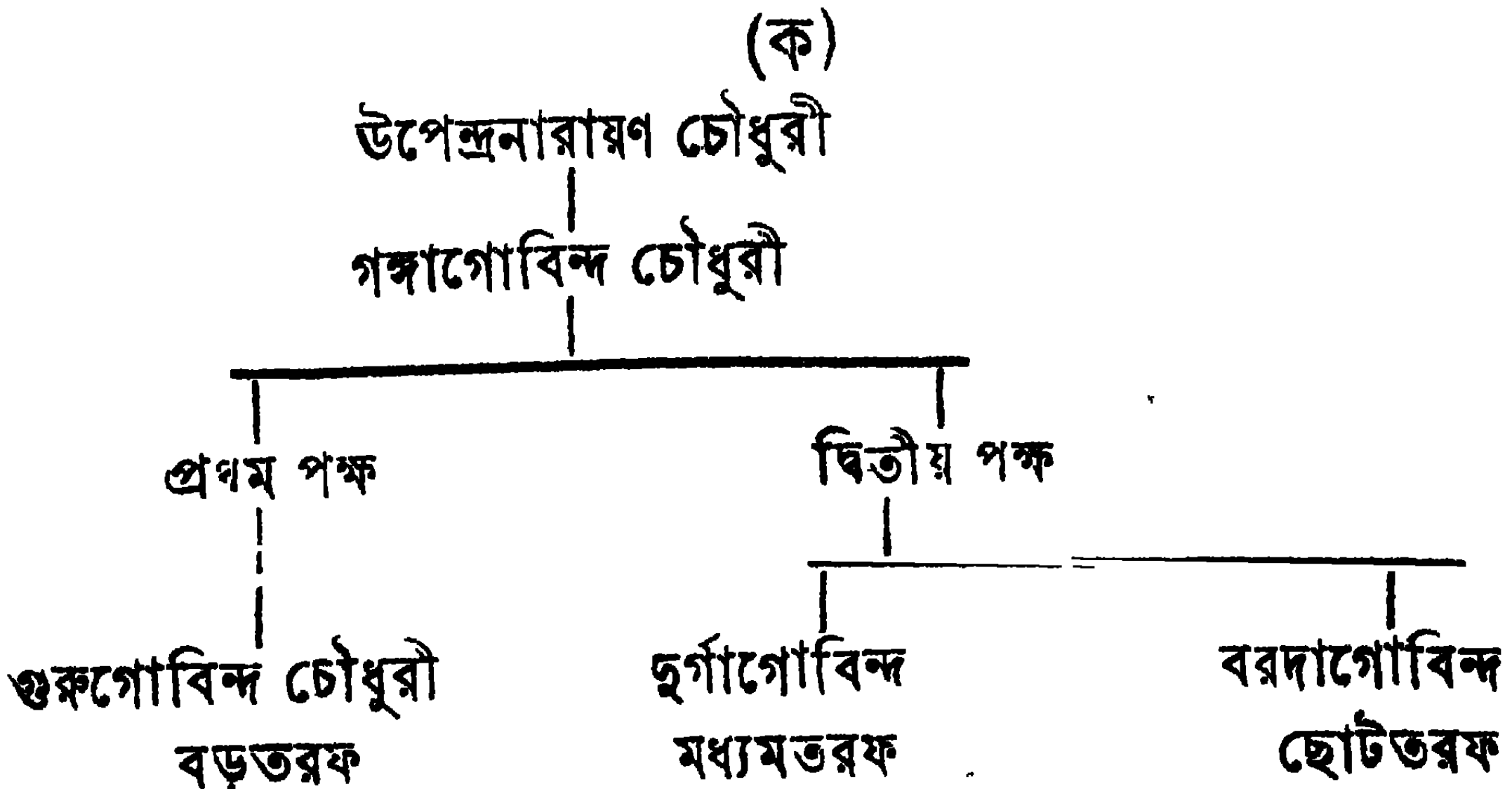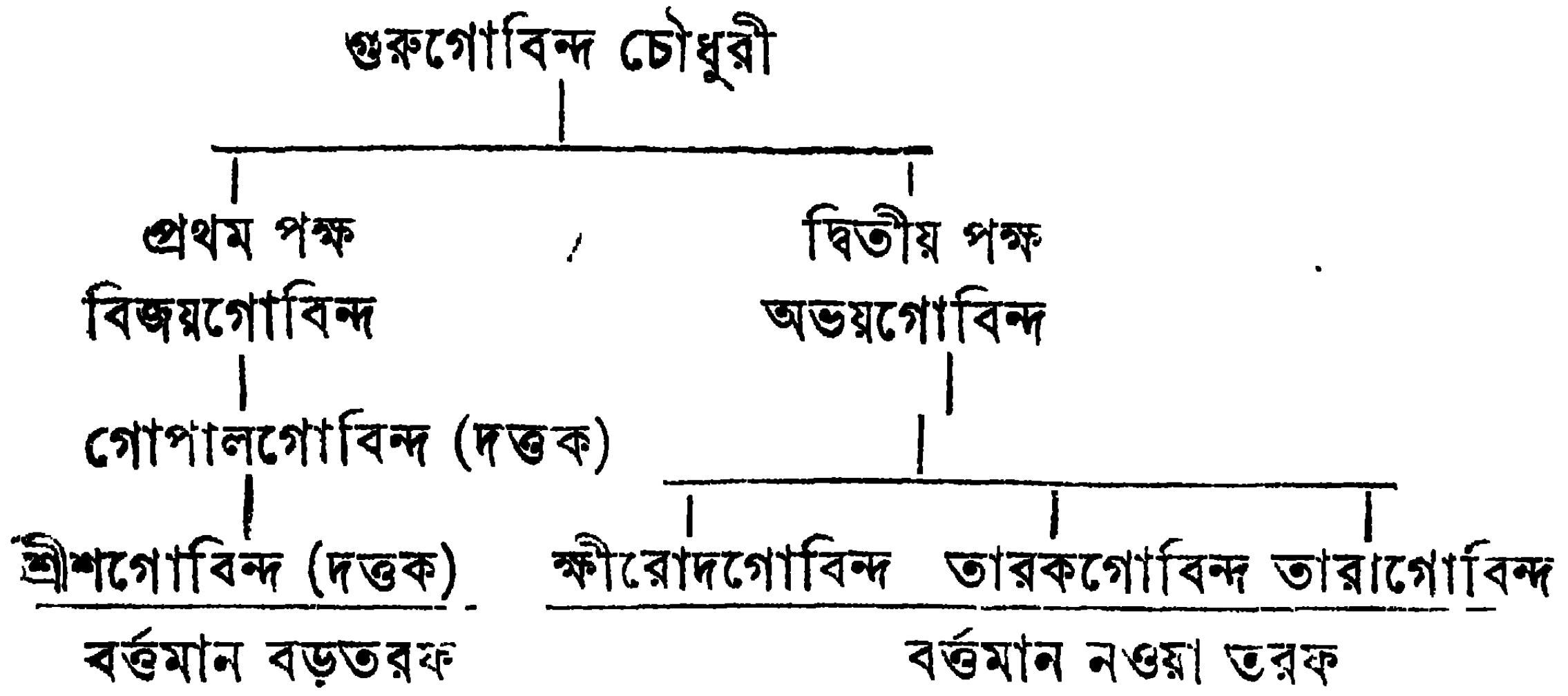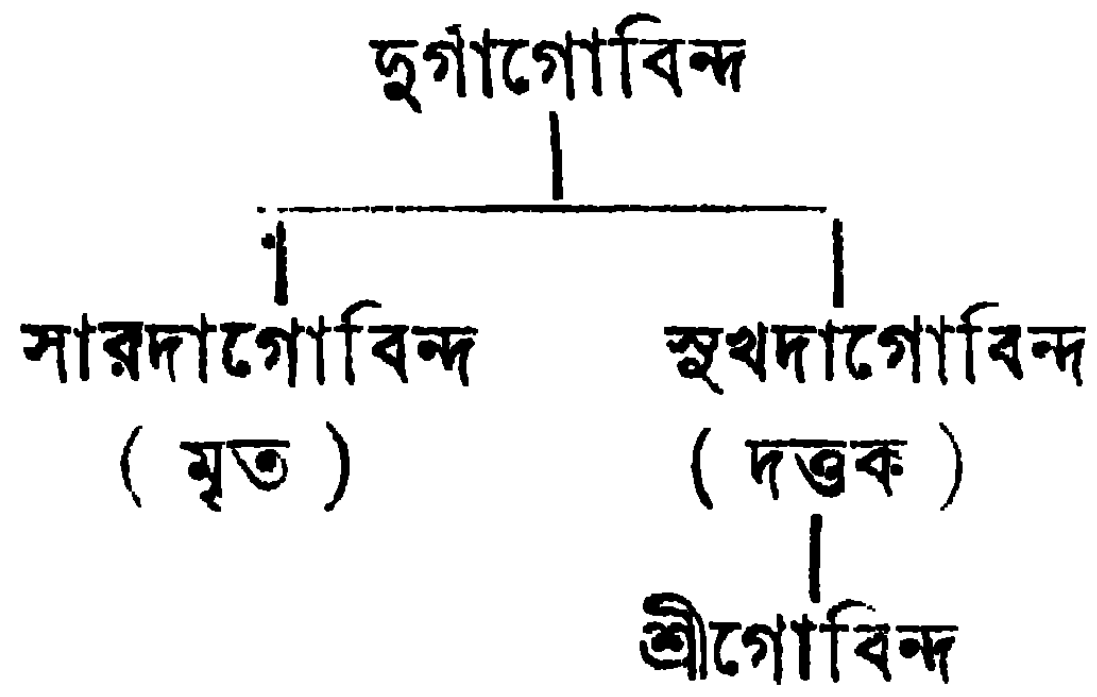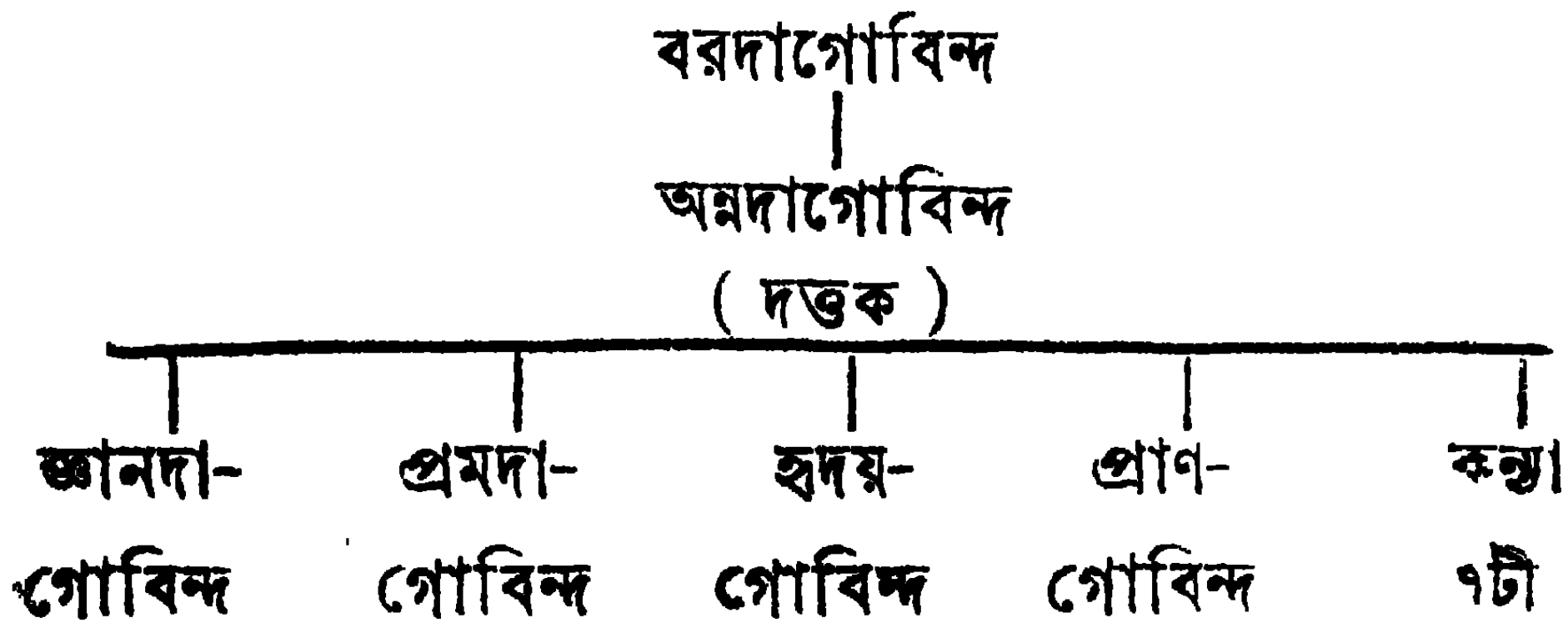
মিঃ আর-কে দাশ, বি-এ, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-সরস্বতী, বার-এট্-ল।

শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাশের পিতা ৺নবুকান্ত দাশ ময়মনসিংহ জেলার বীরসিংহ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রমণীকান্ত তাঁহার তৃতীয় পুত্র। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা পূর্ণিমা দেবী ৺পদ্মলোচন গুহের সপ্তম কন্যা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। এই বংশের "রায়" উপাধি কালক্রমে লোপ পায়। এই বংশ বীরসিংহ হইতে টাঙ্গাইল মহকুমার বহুড়িয়াতে যাইয়া বাস করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভবানীকান্ত দাশ ধুবড়ির গভর্ণমেণ্ট প্লীডার। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দাশ বারাকপুরের ডাক্তার। রমণীকান্ত ফরিদপুর জেলার মাণিকদহের জমিদার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে যান এবং কিছুকাল ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন। ১৯০১ সালে তিনি লিনকন্স ইন হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন।

তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় আইন ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক-গুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি দুইখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরীক্ষক করা হইয়া থাকে। তিনি অনেক কাগজে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তাঁহার সাহিত্যানুরাগের

নিমিত্ত দুইটী প্রসিদ্ধ সাহিত্য-পরিষদ্ তাঁহাকে "বিদ্যাবিনোদ" ও "সাহিত্য-সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। তিনি সাহিত্যসেবা ব্যতীত অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছেন। সমাজ ও শিক্ষা-বিষয়ে তিনি অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। তিনি ঢাকা মাদক-নিবারণী সমিতির প্রবর্ত্তক। মদ্যপানাদি নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই সমিতির চেষ্টায় ১৯২০ ও ১৯২১ সালে মাদকতা-নিবারণী প্রদর্শনী হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারের প্রদর্শনী তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে উদ্বোধন করেন। কয়েক বৎসর মিঃ দাশ বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত জাতিদের উন্নতি-বিধায়িনী সভার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাকে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটেরা সিনেট সভায় সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। ঢাকা মিউজিয়মের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক সভ্য। ইহা ছাড়া তিনি কয়েক বৎসর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কমিশনার-রূপে কাজ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমতে দাশ মহাশয় একেশ্বরবাদী, তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, রাজনীতিতে তিনি মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত। বিধিসঙ্গতভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উত্তরোত্তর অধিকার লাভ করাই তাঁহার রাজনীতির লক্ষ্য। তিনি সকল কার্য্যেই কৃত্রিমতা-শূন্য এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতি—কোনও ক্ষেত্রেই তাঁহার সঙ্কীর্ণতা নাই। তিনি সুবক্তা ও সুলেখক।

তাড়াশ নন্দীতরফ রায়-বংশ

বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী মালতী নগরে ৺ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিবাস ছিল। তাঁহার দুই বিবাহ। তাঁহার পত্নী শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে কিশোরীলাল জন্মগ্রহণ করেন। এই কিশোরীলালকে তাড়াশের জমিদার স্বর্গীয় গোবিন্দলাল রায় মহাশয় দত্তক পুত্ররূপে পালন করিবার জন্য রাত্রিকালে বালককে বিমাতার সহিত চক্রান্ত করিয়া লইয়া যান। পুত্রকে দত্তক প্রদান করায় পিতা ভগবানচন্দ্র প্রভূত টাকা পাইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে ভগবানচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন মাতা শ্যামাসুন্দরী মধ্যে মধ্যে নিজেই তাড়াশে গিয়া পুত্রকে রাখিয়া ও দেখিয়া আসিতেন। ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাসাদের মধ্যে বাস করিয়াও কিশোরীলাল মালতীনগরের ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ও মায়ের অগাধ স্নেহ কখনও ভুলিতে পারিত না। কিছুদিন পরে শ্যামাসুন্দরীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

বালক কিশোরীলালের শিক্ষার জন্য দত্তকমাতা উজ্জ্বলমণি চৌধুরাণী একজন মুন্সী রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেই কিশোরীলাল উর্দ্দূ, ফার্সী প্রভৃতি শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই কিশোরীলালের অনন্যসাধারণ মেধা ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। কিছুদিন পরে তাহার দত্তকমাতা স্বর্গারোহণ করিলেন। দেওয়ান লক্ষীকান্ত তাহার সমস্ত অর্থ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাবতীয় অলঙ্কার আত্মসাৎ করিলেন। বালক কিশোরীলাল দত্তকমাতার মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি শোক পাইলেন।

অতঃপর গবর্ণমেণ্ট উজ্জ্বলমণির জমিদারীর পারচালনভার গ্রহণ করিলেন এবং কিশোরীলালকে কলিকাতায় ওয়ার্ডস ইন্‌ষ্টিটিসউনে লইয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া কোচবিহারের মহারাজা, পাইকপাড়ার মহারাজা, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় প্রভৃতির

সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য হয়। ইঁহারা সকলেই তখন বালক। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথের সহিত বিশেষভাবে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়, যেহেতু তিনি কিশোরীলালের সহপাঠী ছিলেন। কবিবর ৺নবীনচন্দ্র দাস ইঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। এই ওয়ার্ড্স ইন্ষ্টিটিউসনে কয়েক বৎসর থাকিয়া কিশোরীলাল এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। সাবালকত্বে উপনীত হওয়ায় কোর্ট অব ওয়ার্ড্স্ তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং এক লক্ষ টাকাও দিলেন। কিশোরীলাল তাড়াশের জমিদারী পরিচালনার সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিবার পর পাবনা রামনগরের ৺জগদানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের কিছু দিন পরে তিনি কলিকাতা বরাহনগরে আসিয়া বাস করেন। কুমার দৌলতচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন, পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ভূকৈলাশের স্বর্গীয় মহারাজের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

১২৭৬ সালের ৩০শে আশ্বিন কিশোরীলালের একটি কন্যা হয়। শরৎকালে কন্যাটি জন্মগ্রহণ করে বলিয়া তাহার নাম শরৎকুমারী রাখা হয়। তার পর ৭।৮ বৎসর পরে কিশোরীলাল দমদমার নিকট আসিয়া একটি প্রকাণ্ড রাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে তিনি ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ভূস্বর্গ কাশ্মীর পরিদর্শন করেন। কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তাঁহাকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ফিরিয়া আসিয়া নবনির্ম্মিত প্রাসাদের নাম "শ্রীনগর ভিলা" রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সভাসদ্গণের অন্যতম ৺রসিকলাল ঘোষ বিদ্যারত্ন সেই প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে পিত্তল ফলকে যাহা লিখিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে। সেই কথাগুলি এই :—

"শুভ শকাব্দ ১৭৯৮ সংবৎসরের ক্ষত্রিয় নামান্তর কায়স্থজাতীয়

বারেন্দ্রশ্রেণী চূড়ামণি পুরুষানুক্রম-গত "রায়" উপাধিধারী শ্রীল কিশোরীলাল নামক রাজা স্বকীয় রাজধানী রাজসাহীর অন্তঃপাতী তাড়াশ নামক স্থান ত্যাগ পূর্ব্বক এই ক্ষীরদধি সদৃশ হর্ম্ম্যরাজি পরিশোভিত শ্রীনগর নাম্নী নগরী স্থাপন করিয়া বাস করেন। ইঁহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম যথাক্রমে গোবিন্দলাল, রাজকৃষ্ণ, রাজা রামকান্ত ও রাঘবচন্দ্র রায়। ইনি পঞ্চদ্বিংশদ্বর্ষীয় যুবা প্রত্যপ্ত অথচ প্রিয়দর্শন, ধার্ম্মিক, কীর্ত্তিমান, বহুবিধ ভাষায় কবিত্ব এবং দূরদর্শিত্বসম্পন্ন এবং সাধু ও সুপণ্ডিতগণ দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকেন।"

১২৮৮ সালের ১১ই ফাল্গুন বুধবার ৺কেশবানন্দ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত যাদবানন্দ রায়ের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহে কিশোরীলাল কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বহু অর্থব্যয়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন। যাদবানন্দ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ এবং রিপণ কলেজ হইতে বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছুদিন হাইকোর্টে ওকালতী করেন।

কিশোরীলাল সাহিত্যানুশীলন করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের সহিত অধিকাংশ সময় সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহার শিক্ষাগুরু নবীনচন্দ্র দাসকে নিজ এষ্টেটের পরিচালকপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভগবৎ-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কিশোরীলাল অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। ঠাকুরবাড়ীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাধ্যক্ষ ৺শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গিয়া তিনি সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিতেন। তিনি দরিদ্রদিগকে অকাতরে দান করিতেন। শুনা যায়, মহিমবাবু নামক এক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট চিকিৎসার ব্যয় বাবদ সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে এককালে ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে লোকে তাঁহাকে

"রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিত। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

কিশোরীলাল অনেক হিন্দুবিধবা ও দরিদ্রকে মাসিক বৃত্তির বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন।

১২৯৮ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে কিশোরীলাল সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করেন।

কিশোরীলালের জামাতা যাদবানন্দ রায়, এম্-এ,বি-এল্। যাদবানন্দ বাবুর বাড়ী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মেদোবাড়ী গ্রামে। তিনি কুলীন। তাঁহার চারিপুত্র ও চারি কন্যা। (১) প্রথম পুত্র শ্রীসচ্চিদানন্দ রায় এম্-এ, বি-এল্, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল (২) দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিমলানন্দ রায়, বি-এ (৩) তৃতীয় পুত্র শ্রীনির্ম্মলানন্দ রায়, বি-এস্-সি (৪) চতুর্থ পুত্র শ্রীঅসীমানন্দ রায়, বি-এস্-সি শ্রেণীর ছাত্র।

প্রথম পুত্র জেলা-জজ মিঃ কুমুদনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পুত্র তাড়াশের রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তৃতীয় পুত্র টেপার রায় বাহাদুর অন্নদামোহন রায়চৌধুরীর পৌত্রী ও হেমেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা কন্যার সহিত এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র রায়ের বিবাহ হয়। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ পাবনা-পয়দার জমিদার শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র রায়ের সহিত, তৃতীয়া কন্যার বিবাহ কৃষ্ণনগরের রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় বি-এল্, এম্-বি-ই-সি-আই-ইর পুত্র শৈলজারঞ্জন রায় এম্-এস্-সি, বি-এল্এর সহিত এবং চতুর্থা কন্যার বিবাহ জেলা-জজ মিঃ কুমুদনাথ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র মণীন্দ্রনাথ রায়ের সহিত হইয়াছে। মণীন্দ্রনাথ City Engineering Worksএর মালিক।

উলা দক্ষিণপাড়ার "ছোট মিত্র"-বংশ

উলা বাঙ্গালার অতি প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট পুরাতন গ্রাম। লোক-সংখ্যায় এবং পরিমাণে ইহার মত গণ্ডগ্রাম সেকালে বাঙ্গালায় বিরল ছিল। ইহা বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের জন্মভূমি। উলা নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার ও থানার এলেকা-ভুক্ত এবং রাণাঘাট হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। উলার অন্য নাম "বীরনগর"। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উলাতে ভীষণ মহামারী হয়। তাহাতেই এই সুবৃহৎ গ্রামটী ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

এই উলা গ্রামের দক্ষিণপাড়ার "ছোট মিত্র"-বংশ নদীয়া জেলার কায়স্থসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ। নদীয়া জেলার প্রাচীন কায়স্থ-বংশের মধ্যে এই বংশ অন্যতম। ইহারা মিত্র উপাধিধারী দক্ষিণরাঢ়ী কুলীন এবং টেকা সমাজভুক্ত।

"কালিদাস মিত্র হইতে সপ্তদশ পর্য্যায় রাজীব মিত্রের পাঁচটি পুত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহাদিগের নাম কন্দর্প, মোহন, কাশীশ্বর, রামকৃষ্ণ ও রামদেব। মোহনের বংশই উলার বিখ্যাত "মুস্তৌফী" বংশ এবং কাশীশ্বরের বংশ উলার "ছোট মিত্র" বংশ বলিয়া খ্যাত। এই উভয় বংশের পূর্ব্বপুরুষ মোহন ও কাশীশ্বর ভ্রাতৃগণসহ একসঙ্গে টেকা গ্রাম হইতে উঠিয়া আসেন।"* এই উভয় বংশ পরস্পরের জ্ঞাতি। কাশীশ্বর মুস্তৌফী-বাটীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে কারুকার্য্য-সমন্বিত এক বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

"গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় মুস্তৌফী-বাটীর উত্তরপূর্ব্ব দিকে এবং সরকারি রাস্তার মোড়ের পূর্ব্বদিকে যে একটী কারুকার্য্যবিশিষ্ট একচূড় মন্দির আছে, উহা উলার অভগ্ন মন্দিরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

---

* "উলা বীরনগর" পুস্তকের ২১১ পৃষ্ঠা।

প্রাচীন। মন্দিরটীর সম্মুখদেশে দেওয়ালের ইষ্টকে খোদাই করা নানা-প্রকার চিত্র, দেবদেবীর মূর্ত্তি, শিবলিঙ্গ, পুত্তলিকা, নক্সা ও পদ্মপুষ্পাদি আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে এরূপ উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির অধিক নাই। মন্দির মধ্যে একটি শালগ্রাম শিলা আছেন, তাঁহার নিত্যসেবা হয়। গর্ভমন্দিরের এক কোণায় একটি কারুকার্য্য-বিমণ্ডিত কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র রথ আছে। এই মন্দিরের খিলানগুলি চূণ ও সুরকীর দ্বারা গাঁথা। কিন্তু ইহার দেওয়ালের গাঁথনি কাদার। আজিও মন্দিরের দেওয়ালের কোন স্থানে ফাট ধরে নাই। মন্দিরটী ১৬০১ শকে (১০৮৫ সনে, ১৬৭৮।৭৯ খৃষ্টাব্দে) কাশীশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখদেশে ললাটের স্মৃতিফলকে বাঙ্গালা অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে :—

শুভমস্তু শকাব্দাঙ্কে ভূমিবিন্দু মহীপতৌ।
শ্রীকাশীশ্বর মিত্রেন বিষ্ণবেস্ত সমর্পিতম্॥"

এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে কয়েক হস্ত দূরে একটী অতি ক্ষুদ্র একতলা প্রাচীন কোঠাঘর আছে। উহার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন কৃষ্ণপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ ছিল। ইহা ছোট মিত্রদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। প্রায় ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে একদিন দেখা গেল যে, উক্ত লিঙ্গটীর মস্তক আপনা হইতে ফাটিয়া গিয়াছে। তখন উহাকে নদীতে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল।"*

কাশীশ্বর মিত্রের দুই পুত্র;—জয়রাম ও পরশুরাম। পরশুরাম মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া 'মুন্সি' খেতাব প্রাপ্ত হন ও প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। এইজন্য ইঁহার বংশধরগণ 'মুন্সি-মিত্র' বলিয়া অভিহিত হন।

পরশুরামের পুত্র গন্ধর্ব্বনারায়ণ; গন্ধর্ব্বের চারি পুত্র—আত্মারাম,

* "উলা বা বীরনগর" পুস্তকের ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা।

রামকিশোর, মাণিকরাম ও চুণীলাল। আত্মারাম মিত্রের প্রপৌত্র কালীকুমার মিত্র সামান্য অবস্থা হইতে পরে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি হইয়া ছিলেন। ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সেকালে বড় বড় জমিদারের বাটীতে কবির দল থাকিত। উলার প্রসিদ্ধ জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতেও এইরূপ একটী কবির দল ছিল। একদিন অপর এক কবির দল আসিয়া বামনদাসের বাড়ীর কবির দলের সহিত লড়াই আরম্ভ করে। আগন্তুক দল এমন একটী 'চাপান' দিল যে, বামনদাসের কবির দল তাহার উত্তর দিতে পারিতেছিল না। সেই সময়ে কালীকুমার তথায় কবির গান শুনিতেছিলেন। তিনি তখন দরিদ্র ও অজ্ঞাতনামা। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—'নবাগত দলের 'চাপানে'র উত্তর আমি দিতে পারি।' বামনদাস তাহাতে সম্মতি দিলে পর কালীকুমার তখনই 'চাপানে'র ঠিকমত উত্তর দিলেন। বামনদাস কালীকুমারের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ জমিদারীতে একটী কর্ম্ম করিয়া দিলেন। কালীকুমারের তখন নিতান্ত অসচ্ছল অবস্থা। পরে এই কর্ম্ম করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ম্মোপলক্ষে তিনি বহুদিন রঙ্গপুরে ছিলেন। সেখানে তাঁহার নামে একটী রাস্তা আছে। কালীকুমার স্বোপার্জ্জিত অর্থে বাটী, বাগান, বৃহৎ পূজার দালান নির্ম্মাণ করিয়া ও দুইটী পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়াছিলেন। মিত্র-বাটীর "মতিঝিল" নামক পুষ্করিণী কালীকুমারের কীর্ত্তি। তিনি বড় সৌখীন লোক ছিলেন। উলায় অবস্থানকালে তিনি বাবুদের বাড়ীতে যাইতে হইলেও তাঞ্জামে চড়িয়া যাইতেন। দক্ষিণপাড়ার বারোয়ারীর চাঁদনী নির্ম্মাণের জন্য তিনি বহু অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি বৃদ্ধবয়সে দৃষ্টিশক্তি-হীন হইয়াছিলেন। অনুমান বাঙ্গালা ১২৭১—৭২ সালে ৬৪।৬৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালীকুমারের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ চন্দ্রকুমার ও কনিষ্ঠ ঘনশ্যাম।

চন্দ্রকুমার মুন্সেফ ছিলেন এবং উলায় যখন মুনসেফী আদালত ছিল, তখন তিনি ছয়মাস উলায় মুন্সেফী করিয়াছিলেন। অনুমান সন ১২৮২ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়; তখন ইঁহার বয়স হইয়াছিল ৪৯ বৎসর।

চন্দ্রকুমারের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ হরিদাস মিত্র ও কনিষ্ঠ হেমচন্দ্র মিত্র।

হরিদাস মিত্র কলিকাতার হাটখোলায় কারবার করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পরিদর্শনের অভাবে কারবারটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উলার জনৈক মুখোপাধ্যায়-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ এই কারবারের অংশী ছিলেন; তিনি উঁহার অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। হরিদাস মিত্রের যখন কারবারের অবস্থা ভাল ছিল এবং তিনি যখন দুই হস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তখন তিনি অত্যন্ত সৌখীন ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার বৈঠকখানার সাজসজ্জাই দর্শনীয় বস্তু ছিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিভূতিভূষণের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যে বিরাট সমারোহ এবং যাত্রা, নাচ, গান ও ভূরিভোজনের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, উলার লোকে এখনও তাহার উল্লেখ করিয়া থাকে। তিনি এই অন্নপ্রাশনে প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি দক্ষিণপাড়ার বারোয়ারীর কর্ত্তা ছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উলায় বাস করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র মিত্র সন ১২৬৮ সালের (১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) চৈত্রমাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি কোন্নগর স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি ও স্কুল হইতে একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের পরে হেমচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের উলার বাটীতে একটি থিয়েটারের ক্লাব ও লাইব্রেরী স্থাপন করেন। এই সখের থিয়েটারে

"মেঘনাদবধ কাব্য" অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। হেমচন্দ্র উহাতে মেঘনাদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বি-এল্ পাশ করিয়া তিনি উকীল হন এবং রঙ্গপুরে ওকালতী আরম্ভ করিয়া তথাকার ফৌজদারী আদালতের শ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। রঙ্গপুরে অবস্থানের সময়ে তিনি সেখানে একটী অবৈতনিক নাট্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সখের থিয়েটারেও 'মেঘনাদবধ" ও "পলাশীর যুদ্ধ" প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। "মেঘনাদবধে" মেঘনাদের এবং "পলাশীর যুদ্ধে" ক্লাইবের ভূমিকা তিনি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর রঙ্গপুরে থাকিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং সেইজন বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। রঙ্গপুর ত্যাগ করিবার সময়ে তথাকার সম্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দেন ও পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার রঙ্গপুর-ত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিরা বক্তৃতা করেন। হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত Bengal Spinning and Weaving Co. নামক কাপড়ের কলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ইহাই নব কলেবর ও নূতন নাম ধারণ করিয়া এক্ষণে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে তিনি কলিকাতা ২৯নং হুজুরী মল লেন-স্থিত স্বীয় ভবনে লোকান্তরিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। হেমচন্দ্র মিত্র সুলেখক এবং সু-সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি আইনগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাহিত্য-গ্রন্থ-রচনায়ও তাঁহার কৃতিত্ব অল্প নহে। তাঁহার রচিত সাহিত্যগ্রন্থগুলির নাম এই :—

(১) পার্ব্বতী (উপন্যাস), (২) কলিনা (উপন্যাস), (৩) নরসিংহ

(বায়রণের Manfred নাটকের ছায়া-অবলম্বনে রচিত নাটক, (৪) পতিদান (নাটক) ও (৫) বীরাঙ্গনা-পত্রোত্তর কাব্য। এই শেষোক্ত পুস্তকখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তক। ইহা কবিবর মাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পত্রসমূহের প্রত্যুত্তর এবং মাইকেল মধুসূদনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ১৩০০ সালে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্র-বিরচিত "বীরাঙ্গনা-পত্রোত্তর কাব্য" সম্বন্ধে 'উলা বা বীরনগর' গ্রন্থে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছে :—

"মাইকেলের "বীরাঙ্গনা কাব্য" পাঠ করিয়া উহার নায়িকাদিগের পত্রগুলির প্রত্যুত্তর শুনিবার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক। হেমচন্দ্রেব এই পত্রোত্তর সেই অভাবপূরণ করিয়াছে এবং পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণে সমর্থ হইয়াছে। এই পয়ারপ্লাবিত দেশের লোকের নিকটে মাইকেল কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেকালের লোকের নিকটে প্রথমে আদৃত হয় নাই। তথাপি মাইকেলের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাপন প্রতিভাবলে সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এইসকল প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে চিরকালই লোকে অনুকরণ করিয়া থাকে। মাইকেলকে অনুকরণ করা অতি কঠিন—তাঁহার কবিত্ব, ভাব, বর্ণনা, রচনা ও অলঙ্কার-প্রয়োগ অনুকরণ করা সহজ কথা নহে। মাইকেলের "বীরাঙ্গনা" কাব্যখানি উহার পদবিন্যাসের কৌশল, ভাবের উচ্ছ্বাস ও সুমিষ্ট ভাষার জন্য সাধারণের প্রিয়। হেমচন্দ্রের 'বীরাঙ্গনা-পত্রোত্তর কাব্যে'র ভাষা, ছন্দ ও পদবিন্যাস মাইকেলের অনুরূপ। ইহার অনেক স্থানের লেখা মাইকেলের লেখা বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার ভাষা মার্জ্জিত ও সুন্দর। উত্তর রচনা করিতে যে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে হয় তাহা অতি কঠিন। কোন্ কথার কি উত্তর হওয়া উচিত এবং কতগুলি কথা দ্বারা কোন্ কথার উত্তর লিপিবদ্ধ হইলে শ্রুতিসুখকর হইবে তাহা

নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। বহু চিন্তার ফলে এই ক্ষমতা জন্মায়। পত্রের মর্ম্ম সঠিক বুঝিয়া উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত কথা ব্যবহার করতঃ উত্তর লিপিবদ্ধ করা একমাত্র শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। হেমচন্দ্রের পত্রোত্তর কাব্যে সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নানাস্থানে অতি উচ্চ ধরণের উক্তি, উপমা ও কবিত্ব আছে।"

হেমচন্দ্র মিত্রের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ বিভূতিভূষণ ও কনিষ্ঠ ইন্দুভূষণ।

বিভূতিভূষণ সন ১২৯৬ সালের ৫ই চৈত্র (১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ) উলার বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সংস্কৃত পাস কোর্সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "গঙ্গামণি দেবী" রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার পূর্ব্ব-রাত্রিতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বিভূতিভূষণ বি-এল্ পাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ওকালতি করেন না। তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আইন পুস্তকরচনায় প্রবৃত্ত হন। তদবধি তিনি আইন-গ্রন্থ-প্রণয়নেই ব্রতী আছেন। পূর্ব্বপুরুষের ও স্বকীয় জন্মভূমি উলার প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে, উলার স্বাস্থ্যোন্নতি-সাধনের জন্য তাঁহার কীর্ত্তিকলাপই উহার নিদর্শন। উলা-বাসীর কল্যাণের জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেছেন। উলাবাসী যাহাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রাপ্ত হয় সেইজন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে ছয়টী গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। বীরনগর পল্লীমণ্ডলী নামক ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি তাঁহার প্রদত্ত অর্থসাহায্যের বলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিকর বহু কার্য্য করিতেছেন। বিভূতিভূষণ উলাচণ্ডীতলা ও দক্ষিণপাড়ার বারোয়ারীর গৃহাদি মেরামত

করিয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে বারোয়ারীর চাঁদনীর ছাদ মেরামত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা ৺হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে উলায় তাঁহাদের বড় যাতায়াত ছিল না; ফলে অযত্নে উলার বাটী প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে। বিভূতিভূষণ উলায় বাস করেন না বটে, কিন্তু উলার প্রতি তাঁহার মায়া-মমতার সীমা নাই। উলার কল্যাণকল্পে তিনি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেজন্য নামের ভিখারী তিনি নহেন। উলার উন্নতি-সাধনের জন্য বিভূতিভূষণ যে দান করিয়াছেন সেরূপ দান উলার অতীত ও বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহই করেন নাই। তিনি অনাড়ম্বর, ধর্ম্মপ্রাণ, দানশৌণ্ড, দয়ার্দ্রহৃদয়, সচ্চরিত্র, নম্রস্বভাব এবং স্বদেশানুরাগী। বিভূতিভূষণ অনেকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরেজী আইনের পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার রচিত "Criminal Procedure Code," "Trasfer of Property Act" প্রভৃতি কয়েকখানি ইংরেজী আইনের বহি আছে এবং "আইন ও আদালত," "ফৌজদারী কার্য্যবধি আইন," "দণ্ডবিধি আইন" প্রভৃতি অনেকগুলি বাঙ্গালা আইনগ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত ইংরেজী আইন পুস্তকগুলি সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

বিভূতিভূষণ নীরস আইন পুস্তক-রচনায় ব্যাপৃত আছেন বলিয়া মনে করিবেন না যে, তিনি সাহিত্য-রসের রসিক নহেন। বাঙ্গালার প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ কবিগণের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি "কাব্যরত্নমালা" নাম দিয়া একখানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। এই পুস্তক তিন খণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণ ও তাঁহার ভ্রাতা ইন্দুভূষণ ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

কালীকুমারের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ঘনশ্যাম মিত্র। ইনি গীতবাদ্যে পারদর্শী ছিলেন। গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত সঙ্গীত-কলাবিৎ জ্ঞানদা-প্রসন্ন বাবু ঘনশ্যামের গান-বাজনার প্রশংসা করিতেন। ইনি উলার বাটীতেই থাকিতেন। ইনি নির্ব্বিবাদ নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন।

ঘনশ্যামের তিন পুত্রের মধ্যে একমাত্র মন্মথনাথ মিত্র এখন জীবিত আছেন এবং উলার বাটীতে বাস করিতেছেন। ইনিও উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

আত্মারামের আর এক প্রপৌত্র যজ্ঞেশ্বর মিত্র ভ্রাতার সহিত উলা গ্রাম হইতে এলাহাবাদে গমন করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসতি করেন। যজ্ঞেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালদাস মিত্র তথায় একাউণ্টটেণ্ট-জেনারেলের আফিসে কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। গোপালদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমার এলাহাবাদে হাইকোর্টে ওকালতী করেন।

গন্ধর্ব্বনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রামকিশোর নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্ব-বিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি মহারাজার নিকট হইতে উলার পুরাতন দীঘির পশ্চিম পাড়ে ১২ বিঘা মহত্তারণ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া পুরাতন ভিটা ত্যাগ করেন ও তথায় বসবাস স্থাপন করেন। এক্ষণে ছোট মিত্রদিগের উলাবাসিগণ এইস্থানে বাস করিতেছেন।

রামকিশোরের প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র। ইঁহার সময়ে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উলায় মহামারী আরম্ভ হইয়াছিল। মারীভয়ের জন্য মহেশচন্দ্র ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সপরিবারে এবং জ্ঞাতি কালীকুমার, গোপীকৃষ্ণ ও কান্তিচন্দ্রের সহিত উলা ত্যাগ করিয়া হাবড়ার অন্তর্গত খুরুট রোডে বাস করেন। মহামারীর প্রকোপ প্রশমিত হইলে মহেশচন্দ্র তাঁহার মধ্যম পুত্র

উপেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে লইয়া উলায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামলাল হাবড়ায় বাস করিতে লাগিলেন।

শ্যামলাল কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করিতেন। চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি লৌহ ও কাষ্ঠের ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়াছিলেন। চাকুরী ও ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন এবং সেই অর্থে হাবড়া ও অন্যান্য স্থানে ভূসম্পত্তি করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্যামলাল লোকান্তরিত হন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ হইয়াছিল। তিনি হাবড়ার একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

শ্যামলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র খগেন্দ্রনাথ হাবড়ায় ওকালতী করিতেন। তিনি জনহিতৈষী ছিলেন। তিনি হাবড়া মিউনিসিপালিটির কমিশনর ও ব্যাঁটরা অনাথ-বন্ধু সমিতির কর্ণধাররূপে লোকসেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় হাবড়ার খুরুট অঞ্চলে একটি স্কুল স্থাপিত হয়। খগেন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবী ছিলেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর পরিচালিত "সাহিত্য-সমাচার" নামক মাসিক পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। খগেন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনা একত্র করিয়া "নবরত্ন" নামক পুস্তকে প্রকাশিত করা হইয়াছে। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমাজের কল্যাণকারী ব্যক্তির তিরোভাব ঘটে। খগেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গ এক্ষণে হাবড়ায় বাস করিতেছেন।

শ্যামলালের কনিষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ, বি-এল্ প্রথমে রিপণ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পরে কিছুদিন হাবড়ায় ওকালতীও করেন। অতঃপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত হন। মধ্যে কয়েক বৎসর ইনি হাবড়া মিউনিসিপালিটির ডেপুটী চেয়ারম্যান

হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি পুনরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার চেষ্টায় হাবড়ায় সর্ব্বপ্রথম অবৈতনিক শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইনি ৺ঠাকুর হরনাথের প্রিয় শিষ্য।

রামকিশোরের আর এক প্রপৌত্র গোকুলচন্দ্র মিত্র উলার বাস ত্যাগ করিয়া কাশীধামে বসবাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র—সতীশ, জগদীশ ও ক্ষিতীশ। জগদীশ ও ক্ষিতীশ রুড়কীর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র ষ্টেট স্কলারসিপ পাইয়া বিলাতে ইলেক্‌ট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন এবং বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া Oudh and Rohilkhand State Railwayতে Electrical Engineerএর পদ পাইয়াছিলেন। সতীশ সুলতানপুরে কর্ম্ম করিতেন। দুঃখের বিষয়, এই তিন ভ্রাতাই অকাল-মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

শ্যামলাল মিত্রের মধ্যম ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথমে গোয়ালন্দের, পরে কলিকাতার কোনও সওদাগরী আফিসে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র মণীন্দ্রনাথ উলার পৈতৃক ভিটা বজায় রাখিয়াছেন।

শ্যামলাল মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতার এক মাড়োয়ারী আফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি কিছুকাল উলা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় দক্ষিণপাড়ার বারোয়ারী পূজায় যে মহিষ-বলি হইত তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ মাড়োয়ারী আফিসে পিতার কর্ম্ম পাইয়াছেন। ইঁহারা এখন উলার বাস উঠাইয়া দমদমায় বাস করিতেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; উহার নাম—"Measurement and Freight Calculation Table"। পুস্তকখানি পাট-

ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধীরেন্দ্রনাথ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গন্ধর্ব্বনারায়ণের তৃতীয় পুত্র মাণিকরামের অন্যতম প্রপৌত্র কান্তিচন্দ্র ১৮০৭ খৃঃ মহামারীর ভয়ে উলা ছাড়িয়া হাবড়ায় পলাইয়া আসেন এবং তথায় কিছুকাল থাকিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। হাবড়ায় থাকিবার সময়েই কান্তিচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী হন। পরে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি কেশবচন্দ্রের পরম ভক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্র কান্তিচন্দ্রের অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে আপনার পার্শ্বচর করিয়াছিলেন। কান্তিচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা হইয়াছিলেন। তিনি ঋষির ন্যায় পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতেন। কেশবচন্দ্রের কন্যারা তাঁহাকে কাকাবাবু বলিতেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরলোক গমন করেন। কান্তিচন্দ্রের অপর তিনটী ভ্রাতার মধ্যে শক্তিচন্দ্র কুচবিহারের মহারাণী (কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার) প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। ইনিও ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। এক্ষণে ইঁহাদের বংশধরগণ কলিকাতার দক্ষিণে বালিগঞ্জ অঞ্চলে বাস করিতেছেন এবং উলার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন।

উলার "ছোট মিত্র"-বংশ।

——:০:——

(দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ, বিশ্বামিত্র গোত্র)

——:০:——

কালিদাস মিত্র।

*　　*　　*　　*　　*

১ শ্রীধর (দক্ষিণরাঢ়ীয়)　　২ অশ্বপতি (বঙ্গজ)

৩ শুক্তি

৪ সোভরি (?)

৫ হরি

৬ সোম

৭ কেশব

৮ মৃত্যুঞ্জয়
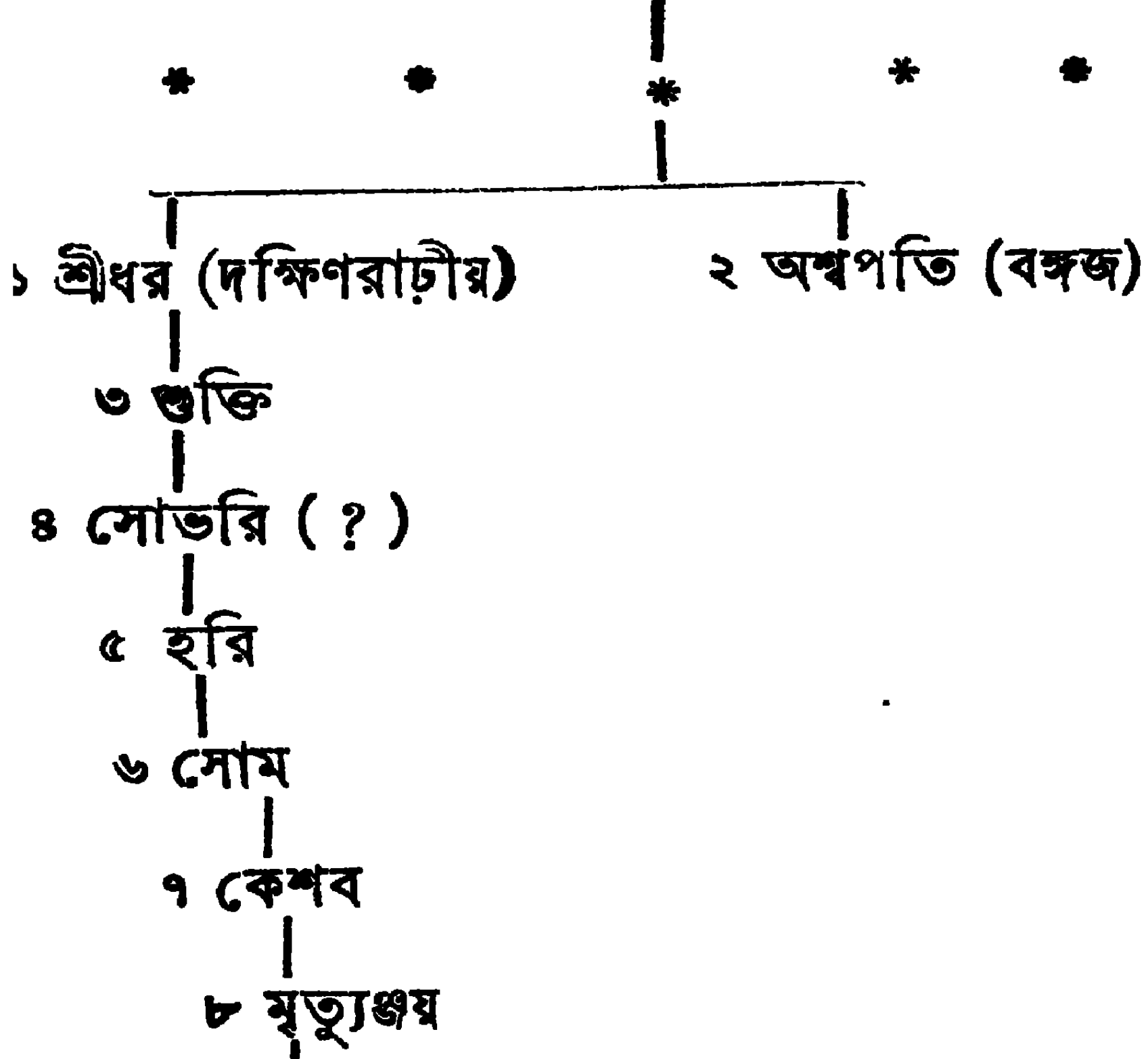
৯ ধুঁইকুমার (বড়িষা সমাজ)　　৯ গুঁইকুমার (টেকাসমাজ)

১০ ভৌমিক　　রাম　　১০ হলধর　　নীলাম্বর　　রাঘব

১১ রঘু　　অচ্যুত　　১১ বাণেশ্বর　　পীতাম্বর

১১ বাণেশ্বর
১২ সুরেশ্বর
১৩ শ্রীধর
সদানন্দ
১৩ গৌড়েশ্বর
১৪ কলাধর
কেশব
গোপাল
বলভদ্র
১৫ মাধব
কৃষ্ণানন্দ
রঘুপতি
১৫ শ্রীপতি
পরমানন্দ
১৬ রামচন্দ্র
১৬ চাঁদ
১৭ রাজীব (মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো)
১৭ মথুরা
১৮কন্দর্প মোহন
১৮কাশীশ্বর (উলার ছোট মিত্র-বংশ)
রামকৃষ্ণ
রামদেব
১৯ রামেশ্বর (উলার মুস্তৌফী-বংশ
১৯ জয়রাম
১৯ পরশুরাম
২০ গন্ধর্ব্বনারায়ণ
২১ আত্মারাম বা অযোধ্যারাম
১ ২ ৩
২২ রঘুনাথ
২২ রামহরি
২৩ রাধানাথ
২৩ রামনাথ
২৩কৃষ্ণমোহন
রাধামোহন
রামধন
২৪ কালীকুমার
দুর্গাদাস
২৪ নকুড়চাঁদ
বিশ্বেশ্বর
যজ্ঞেশ্বর

২৪ কালীকুমার
যজ্ঞেশ্বর
২৫ চন্দ্রকুমার
২৫ ঘনশ্যাম
২৫ গোপাল
নিবারণ
২৫ অবিনাশ
২৬ অনিল
২৬ হরিদাস
২৬ হেমচন্দ্র
২৬ সুশীলকুমার
বিনয়
২৭ বিভূতিভূষণ
ইন্দূভূষণ
২৬ অশ্বিনী
২৬ মন্মথনাথ
২৬ গোপেশ্বর
২৭ ললিতমোহন
২৭ কৃষ্ণকমল
রামকমল
শ্যাম

২১ রামকিশোর = ১
২২ হরিনারায়ণ
২২ উদয়নারায়ণ
২২ রামগোপাল = খ
২৩ গৌরীশঙ্কর
২৩ রাজনারায়ণ
২৩ রাজকৃষ্ণ = ক
২৪ হরশঙ্কর
২৪ গিরীশচন্দ্র
২৪ মহেশ
রামগতি
নৃসিংহ
ঈশ্বরচন্দ্র
২৫ শ্যামলাল
উপেন্দ্র
২৫ নগেন্দ্র
২৬মণীন্দ্র

নগেন্দ্র
শ্যামলাল
ক
খ
২৬ বীরেন্দ্র হীরেন্দ্র শৈলেন্দ্র ভূপেন্দ্র
খগেন্দ্রনাথ
২৬ যতীন্দ্রনাথ
২৭ সমরেন্দ্র বীরেন্দ্র বরেন্দ্র অশোকেন্দ্র অজয়েন্দ্র
সত্যেন্দ্র বারীন্দ্র রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র
২০ নসীরাম গোপীকৃষ্ণ গোকুল ২৪ কালীকুমার
২৫ মহেন্দ্র
২৫ যোগেন্দ্র
২৬ দেবেন্দ্র
২৫ সতীশ ২৫ জগদীশ ক্ষিতীশ
২৬ দেবদাস আশুতোষ
হরিদাস ঠাকুরদাস চণ্ডীদাস
গোবিন্দ রামকুমার কালিদাস তারিণী কালীকান্ত
কাশীনাথ ২৪ নবকুমার
২১ মাণিকরাম—২
২১ চুণীলাল—৩
গৌরহরি ২২ ভবানীচরণ
২২ হরিহর
গঙ্গাগোবিন্দ—গ ২৩ ঈশ্বরচন্দ্র—ঘ
২৩ উমেশ কৈলাস

গ
ঘ
.৪ দোলগোবিন্দ
২৪ কীর্ত্তিচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
কান্তিচন্দ্র
২৪ শক্তি
২৫ যতীন্দ্রনাথ
২৫ নৃপেন্দ্রনাথ
২৬ বিকাশ
প্রকাশ
প্রতাপ
২৬ প্রভাস
পৃথ্বীশ

টাকীর জমিদারবাবুদের বংশ।

পশ্চিমের বাটী

টাকীর জমিদারগণ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশ-সম্ভূত। ইঁহারা যশোহর-সমাজমধ্যে সমাজপতি ও কুলীনশ্রেষ্ঠ বঙ্গজ কায়স্থ। ইঁহাদের বংশ অতীব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। ইঁহাদের বাটী পঞ্চাংশে বিভক্ত; যথা—উত্তরের বাটী, দক্ষিণের বাটী, পূর্ব্বের বাটী, পশ্চিমের বাটী ও আটচালার বাটী।

পশ্চিমের বাটীর স্বর্গীয় স্বনামধন্য বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়েরা পাঁচ ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ, মধ্যম মৃত্যুঞ্জয়, তৃতীয় গঙ্গাধর, চতুর্থ ও কনিষ্ঠ লব ও কুশ। লব ও কুশ যমজ ভ্রাতা ছিলেন। বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রভূত বিদ্যাবলে এবং পিতৃব্য রামকান্ত মুন্সীর সাহায্যে তিনি বর্দ্ধমান রাজসরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেওয়ান বিশ্বনাথ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার হৃদয় অতি মহৎ ছিল এবং দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া ছিল। তিনি সাতিশয় স্বধর্ম্মানুরাগী ও দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিল না, কেবলমাত্র দুইটি কন্যা ছিলেন। তিনি কন্যাদ্বয়কে সৈদপুর-নিবাসী কুলীন বসুবংশে বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। তিনি অপুত্রক হওয়াতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুঞ্জয় ও গঙ্গাধর এই দুই ভ্রাতাকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দেন। বিশ্বনাথ টাকীতে বর্দ্ধমান-রাজবাটীর অনুরূপ প্রাসাদতুল্য বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন; অদ্যাপি সেই প্রাচীন অট্টালিকা বর্ত্তমান থাকিয়া

অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। লব ও কুশের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়। কথিত আছে, যখন বিশ্বনাথবাবু তুলাদণ্ডে করিয়া মাপিয়া রৌপ্য বাসন দুই ভ্রাতাকে বিভাগ করিয়া দেন, তখন তাঁহার একটী দৌহিত্র বলেন, "দাদামহাশয় আমাকে একটী রূপার গেলাস দিন, আমি জল খাইব।" তদুত্তরে বিশ্বনাথ বলেন, "ভাই রূপার গেলাস লইয়া তুমি কি করিবে? তোমাদের বাটী হইতে চোরে উহা চুরী করিয়া লইয়া যাইবে। আমার ভাইদিগকে দিতেছি, উঁহারা পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করিবেন ও আমার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া যত্নে রাখিবেন।" এখনকার দিনে এই প্রকার সৌভ্রাত্র অতি বিরল। ইঁহার জমিদারীর মধ্যে ভালুকা পরগণা, হাবেলী, রমজান নগর (পানিতর) বৈকারি, আবাদ পাটলী, যুবারজীপুর, আগড়পাড়া ও সাইহাটীই প্রধান ছিল। ধূমঘাটার অনেক জমী অনাবাদী পতিত ছিল। অদ্যাপি ৺দুর্গাপূজার সময় ধূমঘাটায় রাজা প্রতাপাদিত্যের কালীমন্দিরে সকল বাবুদের বাড়ী হইতে পুরোহিত, চাকর, কর্ম্মচারিগণ ও সমস্ত পূজোপকরণ ঈশ্বরীপূজার তিন দিনের পূজার জন্য পাঠান হয়। ইনিই প্রতাপাদিত্যের কুলদেবী। প্রবাদ এই,—যখন প্রতাপাদিত্য অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন, তখন দেবী প্রতাপকে কন্যা-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বলেন, "বাবা আমি এখন যাই?" প্রতাপাদিত্য দুইবার বলেন, "মা তুমি কোথায় যাইবে? অন্দরে যাও।" বার বার তিনবারের বার মহারাজা প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া বলেন, "যাও, চলিয়া যাও"। তৎক্ষণাৎ দেবী অন্তর্হিতা হইলেন ও পুরোহিত আসিয়া মহারাজাকে বলিলেন, "মহারাজ এ কি সর্ব্বনাশ হইল? দেবীমূর্ত্তি মুখ ঘুরাইয়া লইয়াছেন।" মহারাজা প্রতাপাদিত্য গিয়া দেখিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন, "মাতা! তুমি সত্যই আমার অনুমতি লইয়া আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে! এতদিনে আমার দুর্ভাগ্যের সূচনা হইল।" মহারাজা অতিশয়

কালীসাধক ছিলেন ও দেবী তাঁহার ভক্তিতে যশোহর-রাজবাটীতে প্রিয় ভক্তের সাধনায় আবদ্ধ ছিলেন।

গঙ্গাধরের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ তারাশঙ্কর ও কনিষ্ঠ প্রতাপশঙ্কর। তারাশঙ্কর টাকীর চর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ উকীল গৌরাঙ্গচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরমা সুন্দরী কন্যা শ্রীমতী জগৎতারাকে বিবাহ করেন। গৌরাঙ্গ ঘোষ কলিকাতায় ভবানীপুরে বেলতলায় তাঁহার নিজ বাটীতে থাকিয়া ওকালতী করিতেন। তখন বেলতলা জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল। তারাশঙ্করের মালগুজারির টাকা গৌরাঙ্গবাবুর নিকট আসিত ও তিনি তাহা কালেক্টরীতে দাখিল করিয়া দিতেন।

লাটের পূর্ব্বদিন টাকী হইতে খাজনার টাকা গৌরাঙ্গবাবুর নিকট আসে। দস্যুগণ তাহা দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্যকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বলে, "তুমি যদি রাত্রে আমাদের দরজা খুলিয়া দাও, তবে তোমায় অনেক টাকা দিব।" নির্ব্বোধ চাকরটী টাকার প্রলোভনে ভুলিয়া বলে, "আমি দরজা খুলিয়া দিব কিন্তু তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার মুনিবের প্রতি তোমরা কোন অত্যাচার করিবে না।" দস্যুগণ তখন তাহাতেই স্বীকৃত হয়। ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গ ঘোষ মহাশয় টাকা আসিবা মাত্র কালেক্টরীতে জমা করিয়া দেন। ডাকাতেরা তাহা জানিতে পারে নাই। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত গভীর নিশীথে চাকরটী দরজা খুলিয়া দিলে ডাকাতগণ হল্লা করিয়া দোতলার উপর উঠিয়া সিঁড়ির দ্বারে করাঘাত করায় একটি পাচক ব্রাহ্মণ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া কি ঘটনা দেখিতে আসে, তৎক্ষণাৎ দস্যুরা দ্বার-সমীপে ব্রাহ্মণকে খাঁড়া দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, ব্রাহ্মণের কোন শব্দ করিবার অবসর হয় নাই। তৎপরে ডাকাতেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া গৌরাঙ্গবাবুকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে। সে সময় গৌরাঙ্গবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার দুইটী নাবালক পুত্রকে লইয়া টাকীতে ছিলেন। গৌরাঙ্গবাবুর একটি পুত্র

বাবু কেদারনাথ ঘোষ অদ্যাপি জীবিত আছেন। দস্যুরা ঘরে যে সামান্য অর্থাদি ছিল তাহা লইয়া পলায়ন করে, সমস্ত বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া বিশেষ কিছুই পায় নাই। একটি নলকের মুক্তা স্নধু তাঁহার হাত-বাক্সের কোণে পতিত ছিল। সেইটী জগৎতারা চৌধুরাণীর নিকটে পাঠান হয়। সেই মুক্তাটী অদ্যাপি তাঁহার বংশধরের নিকটে আছে।

তৎকালে কলিকাতা হইতে টাকী যাইতে নৌকা-যোগে ২।৩দিন লাগিত। তখন রেলপথ ছিল না। তারাশঙ্করবাবুর একটি পুত্র হইয়াছিল; তাঁহার নাম গিরিজাশঙ্কর রাখা হয়। প্রতাপশঙ্কর বাবুর অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। জগৎতারা চৌধুরাণী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন, তাঁহার শ্বশুর গঙ্গাধরবাবু ও স্বামী তারাশঙ্করবাবু তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বিষয়কার্য্য করিতেন, সকল কর্ম্মেই তাঁহার মত লওয়া হইত। গিরিজাশঙ্কর বাবুর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মৃত্যু হয়। একমাত্র বংশধরের মৃত্যুতে, গঙ্গাধরবাবু, তারাশঙ্করবাবু, পিতামহী ও মাতা জগৎতারা শোকে একান্ত আকুল হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে অধীরা পুত্রশোকাতুরা মাতাকে লইয়া শ্বশুর ও স্বামী মহাশয় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হয়েন। তখনকার দিনে তীর্থ-পর্য্যটন অত্যন্ত কষ্টকর ও বিপদ-সঙ্কুল ছিল। বহু তীর্থে ঘুরিয়া আর একটি পুত্রসন্তান হওয়ার জন্য স্থানে স্থানে পূজা, অর্চ্চনা ও মানসিক করিয়া উঁহারা দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জগৎতারা চৌধুরাণীর আর কোনই সন্তানাদি হইল না। কিছুদিন অপেক্ষার পর শ্বশুর-কূলের বংশনাশের আশঙ্কায় তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া স্বামীর পুনরায় বিবাহ দেন। দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহে তারাশঙ্করবাবুর আদৌ ইচ্ছা ছিল না এবং তাঁহার পিতা-মাতাও পুত্র-শোকাতুরা সাধ্বা বধূর মনে সপত্নী-বেদনা দিতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। তারাশঙ্করবাবু তাঁহার সুশীলা পত্নীকে অতিশয় স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং এই বিবাহে তিনি কিছুতেই সম্মত

হন নাই। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী মাজপাড়া-নিবাসী বাবু রামকুমার বসুর কন্যা শ্রীমতী প্রাণকুমারী চৌধুরাণী। রামকুমারবাবু একটী বড় হৌসের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তারাশঙ্কর বাবুর পত্নীভাগ্য ভাল ছিল, এই কন্যাও অতিশয় সুশ্রী ও সুরূপা ছিলেন। রামবাবুরা রাক্‌সার বসু-বংশীয় ছিলেন, তাঁহাদের কলিকাতায় চূণাপুকুরে নিজ বাটী ছিল ও তিনি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। শ্রীমতী প্রাণকুমারীর বিবাহের পর প্রায় ষোড়শ বর্ষ অতীত হইল কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি না হওয়াতে জগৎতারা চৌধুরাণী অত্যন্ত নিরাশ ও মনঃক্ষুন্ন হইয়া পড়েন। যে শ্বশুর-কুলের বংশ-রক্ষার জন্য নিজের সুখ ও স্বার্থ বলি দিয়া সপত্নীকে ঘরে আনেন, সেই সপত্নীর পুত্র না হওয়াতে তিনি বড়ই অধীরা হইয়া স্বামীকে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিয়া তুলেন। তারাশঙ্করবাবু অত্যন্ত হৃদয়বান্ ও মিষ্টভাষী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃদেবী ভানুমতী চৌধুরাণীর নামে কালীঘাটে গঙ্গার ঘাট বাঁধাইয়া দেন ও সেই ঘাটের উপর দোতালা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া মাতার গঙ্গাবাসের ব্যবস্থা করেন। অন্নমেরু এবং তুলা প্রভৃতি ব্রত তাঁহার মাতৃদেবীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩।৪ মাস অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত টাকীর বাড়ীতে দেওয়া হয়। এই সময় তিনি স্বয়ং সমাগত ব্রাহ্মণদিগের পাদ প্রক্ষালন করিয়া মার্জ্জনা করিয়া দিতেন। মহাভারত শেষ হওয়ার সময় অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল এবং স্বয়ং দক্ষিণের বাটীর বাবু মথুরানাথ মুন্সী মহাশয় কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারাশঙ্করবাবু টাকীতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

দত্তক-গ্রহণের কিছুদিন পরেই বাবু তারাশঙ্করের মৃত্যু হয়। তখন দত্তক অক্ষয়কুমার ষষ্ঠবর্ষীয় বালকমাত্র। বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ তখন ২৪ পরগণার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটি কলেক্টার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই টাকী, দেভোগ ইত্যাদি পরিদর্শনে যাইতেন, তৎসূত্রে তারাশঙ্করের

সহিত তাঁহার অতিশয় সৌহৃদ্য জন্মে। দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সুপ্রতিষ্ঠ স্বর্গীয় স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের পিতা। তৎকালে চন্দ্রমাধবের জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যার জন্ম-সংবাদ শুনিবামাত্র তারাশঙ্কর বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বলেন "আপনার পৌত্রীকে আমি পুত্রবধূ করিব।" দুই বন্ধুতে এই প্রতিজ্ঞা হয়। তারাশঙ্কর বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পত্নী পঞ্চতপা ইত্যাদি অতিশয় কঠোর ব্রত সাধন করেন।

অক্ষয়কুমার পঞ্চদশবর্ষীয় হইলে জগৎতারা চৌধুরাণী স্বামী মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ সম্পাদন করেন। এই এই বিবাহ-উপলক্ষে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ নানা প্রকার বিপ্লব উপস্থিত করেন। কিন্তু এই মনস্বিনী মহিলা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বামীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। জগৎতারা চৌধুরাণী তাঁহার পুত্রবধূকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্বামী তারাশঙ্কর বাবুর মৃত্যুর পর জগৎতারা চৌধুরাণী বহুদিন জীবিতা ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা ও দেশের ইতর ভদ্র সকলের জননীস্বরূপা ছিলেন। দরিদ্রদের অভাব তিনি সাধ্যমত পূরণ করিতেন। পুরাতন চাউল, পুরাতন তেঁতুল, পুরাতন ঘৃত, পুরাতন গুড়, পুরাতন কম্বল—এই সব তিনি সযত্নে সঞ্চিত রাখিতেন। দরিদ্রদের অসুখ হইলেই তাহারা আসিয়া বড় মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে পথ্যের সামগ্রী লইয়া যাইত। পল্লীগ্রামে কুকুরের উপদ্রব বেশী; কুক্কুর-দংশনে পুরাতন কম্বল ও পুরাতন গুড় মহৌষধিস্বরূপ। তাঁহার মৃতদেহ যখন বৈকাল বেলায় বিল্বমূলে নামান হয়,তখনও দুইজন লোক দূর গ্রামান্তর হইতে রোগীর পথ্যের জন্য পুরাতন চাউল লইতে আসে ও তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল

হয়। জগৎতারা চৌধুরাণীর মৃত্যুতে আপামরসাধারণ সকলেই শোকার্ত্ত হয়েন। বাবু তারাশঙ্করের কনিষ্ঠা পত্নী শ্রীমতী প্রাণকুমারী চৌধুরাণীর বিগত বর্ষে কাশীধামে মৃত্যু হয়।

জগৎতারা চৌধুরাণী তাঁহার নামের অমরত্ব সাধন করিয়া গিয়াছেন। এখনও শত শত লোক নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ঔষধ লইতে ও চিকিৎসিত হইতে আসে। তারাশঙ্করবাবু এমন দয়ার্দ্রহৃদয় ছিলেন যে, তিনি তাঁহার গঙ্গার ধারের বাটীতে একদিন রাত্রে যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখন হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, একটি প্রৌঢ়া ধীবর-রমণী তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দীন দরিদ্র ধীবর-কুটীরে গমন করিয়া, পুত্রশোকাতুরা জননীকে বলেন, "মা আমি তোমার পুত্র; তুমি আর কাঁদিও না, অদ্যাবধি আমি তোমাকে মা বলিয়া ডাকিব।" তিনি তদবধি সেই দুঃখিনী রমণীকে "দুঃখিনী মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও তাহার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু তারাশঙ্কর প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার ভগিনী-পুত্র শ্রীপুর-নিবাসী ভারতচন্দ্র বসু মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র পঞ্চমবর্ষীয় বালক শ্রীমান্ কিশোরীমোহন বসুকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম অক্ষয়কুমার রায়চৌধুরী রাখা হয়। অক্ষয় বাবু কুমার-প্রতিম রূপবান্ ও অতিশয় প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার সৎ স্বভাব ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি পঞ্চদশবর্ষকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য উকীল চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা নবমবর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী ষোড়শীবালার পাণিগ্রহণ করেন। বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ পরে হাইকোর্টের জজ হয়েন ও একাদিক্রমে বাইশ বৎসর জজিয়তি করিয়া পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন প্রাপ্ত হন। অক্ষয়কুমার এণ্ট্রান্স পাস করিয়া এফ-এ

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় দুরন্ত কাল আসিয়া অকালে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা পত্নী তাঁহার মাতার সহিত পশ্চিম প্রদেশে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্ত গিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ও চন্দ্রমাধববাবুরা সকলেই সেখানে ছিলেন। শুধু কলেজ ও কোর্ট খোলার জন্য চন্দ্রমাধব বাবু জামাতা ও পুত্রগণকে লইয়া দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ ওলাউঠা রোগে পাঁচ দিনের দিন অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। তিনি তরুণবয়স্ক হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বলেন, "আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা; যদি এই গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মে তবেই ভাল, নচেৎ আমার স্ত্রী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া আমার বংশ রক্ষা করিবেন।" তিনি তাঁহার পত্নীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। তৎপরে তাঁহার একটী কন্যাসন্তান জন্মে; এই মেয়েটীর নাম চারুশীলা। এই মেয়েটী দুই বৎসরের হইয়া মারা যায়। বালিকা চারুশীলার মৃত্যুতে চন্দ্রমাধব বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শোকে একেবারে মূহ্যমান হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের হতভাগিনী কন্যাকে নানাদেশে তীর্থভ্রমণে লইয়া যান। কিছুদিন অতীত হইলে ও শোকানলের কিঞ্চিৎ শমতা হইলে ষোড়শীবালার শ্বশ্রূমাতা জগৎতারা চৌধুরাণী বধূর দত্তক গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে চন্দ্রমাধববাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালার স্বামী শ্রীপুর-নিবাসী জগদীশচন্দ্র গুহ রায়চৌধুরী মহাশয় পোষ্টাল ইনস্পেকটর হইয়া টাকীতে পরিদর্শনে যান ও সেখানে জগৎতারা চৌধুরাণী তাঁহার পুত্রবধূ ষোড়শীবালার জন্য জগদীশবাবুর নিকট কাতরে একটি পুত্র ভিক্ষা চাহেন। তখন জগদীশচন্দ্র মোটে দুইটী শিশুপুত্রের জনক। তিনি জগৎতারা চৌধুরাণীর করুণ প্রার্থনায় অতীব

ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার স্ত্রী সসত্ত্বা, এই গর্ভে স্তত্রানপুস জন্মিলে আমি আপনাদের দান করিব।" বাবু জগদীশচন্দ্র তাঁহার শ্যালিকাকে মাতৃসমা শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নলিনীবালার সেই গর্ভে একটি স্থকুমারী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তখন জগৎতারা চৌধুরাণী অত্যন্ত নিরাশ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বৈবাহিক চন্দ্রমাধববাবুকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যাহাতে জগদীশবাবু তাঁহার কানষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সরোজকুমারকে ষোড়শীবালার হস্তে দান করেন। তখন সরোজকুমার চারিবৎসর বয়স্ক বালকমাত্র। সরোজকুমার অত্যন্ত সুদর্শন ও পিতা-মাতার অতিশয় প্রীতিভাজন ছিলেন। অনেক উপরোধ-অনুরোধের পর জগদীশ তাঁহার প্রিয় পুত্রটীকে দত্তক দিতে সম্মত হয়েন। এই সময় চন্দ্রমাধববাবু হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন ও জগদীশবাবু সাব ডেপুটীর পদে ওপিয়াম এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাসমারোহে ভবানীপুরে ষোড়শীবালা চৌধুরাণী দত্তক গ্রহণ করেন ও বালকের নাম অশোককুমার রায়চৌধুরী রাখা হয়। জগদীশবাবুরা টাকীর বাবুদের সপিণ্ড জ্ঞাতি। শ্রীমান্ অশোককুমার অতিশয় মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন, ইনি ত্রয়োদশ বর্ষে ডভেটন কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েন ও স্কুলের মেডেল প্রাপ্ত হন। এইরূপে পঞ্চদশ বর্ষে এফ-এ, এবং সপ্তদশ বর্ষে বি-এ ও উনবিংশ বর্ষ বয়সে এম-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপরে ইনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই সময় উলপুর-নিবাসী তারাপ্রসাদ বসু রায়চৌধুরী মহাশয়ের চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী চারুলতার সহিত ইঁহার শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। উলপুরের বসুবংশ কুলীন ও টাকী-সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্। টাকীর অধিকাংশ বড় ঘরের সমস্ত বধূই উলপুরের রায়-চৌধুরীদের কন্যা। হাইকোর্টে দুই বৎসর ওকালতী করার পর অশোককুমারের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। তাঁহার ব্যারিষ্টর হইবার

প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার শরীর সুস্থ হয় ও সেখান হইতে তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি নিরাপদে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হয়েন। তিনি পঞ্চদশ বর্ষ ব্যারিষ্টারী করিতেছেন ও একজন প্রতিভাশালী ব্যারিষ্টার। স্বর্গীয় তারাশঙ্করবাবু টাকীতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন অশোককুমার অদ্যাপি তাহা এবং অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পশ্চিমের বাটীতে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি অতি সমারোহে সম্পন্ন হয় এবং কাঙ্গালী-ভোজন ও বস্ত্রাদি দান করা হয়। অশোককুমারের একটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। কন্যাটীর নাম শ্রীমতী প্রভা ও পুত্রটীর নাম শ্রীমান্ অজয়কুমার রায়চৌধুরী। অজয়কুমার এক্ষণে ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক ও মিত্র ইনিষ্টিটিউসনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। অশোককুমারের স্বসম্পর্কীয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র গুহ রায়চৌধুরী মহাশয় টাকীর বাটীতে থাকিয়া সযত্নে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা, দেবসেবা ও লোক-লৌকিকতা রক্ষা করিতেছেন।

বংশ-তালিকা

শ্যামসুন্দর
বিশ্বনাথ (দেওয়ান)
মৃত্যুঞ্জয়
গঙ্গাধর
কৃশকৃষ্ণ (লব ও কুশ)
তারাশঙ্কর
প্রতাপশঙ্কর
অক্ষয়কুমার
অশোককুমার
অজয়কুমার
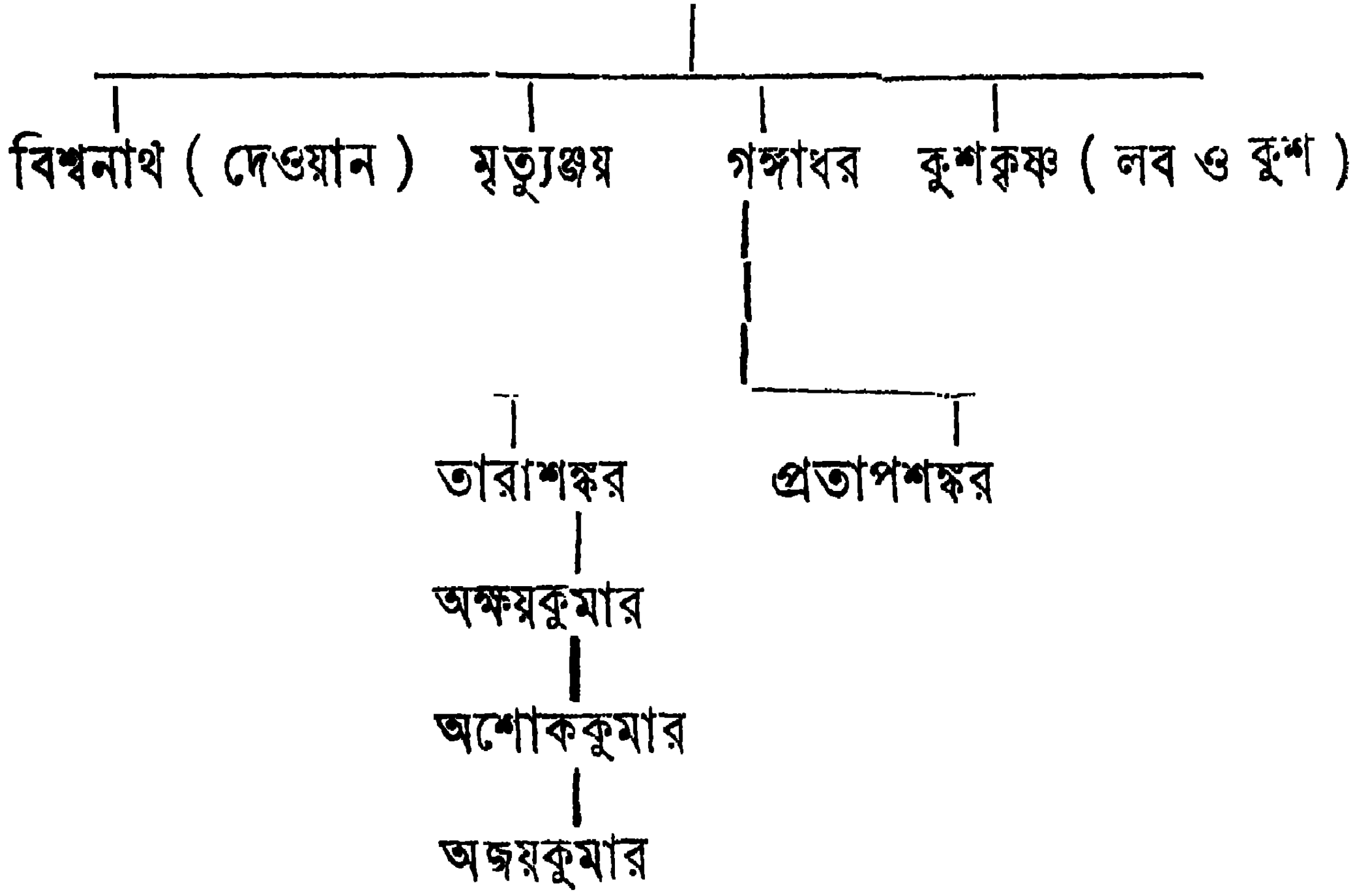
স্বর্গীয় রঘুনাথ দাস।

স্বর্গীয় রঘুনাথ দাস ঢাকার একজন লক্ষপতি জমিদার ও ব্যাঙ্কার ছিলেন। তিনি ঢাকার অন্যতম প্রাচীন বংশজাত। ১৮৫৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বরূপচন্দ্র দাস ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মত সদাচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সনাতন দাস, সনাতন বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রূপলাল দাস তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র।

অভিরাম পোদ্দার হইতে এই বংশের উৎপত্তি। তিনি অবস্থাপন্ন ছিলেন। মথুরামোহন পোদ্দারের সময় হইতে অবস্থা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। বড়বাজার ৪৯ নং বাঁশতলা ষ্ট্রীটে তাঁহার ব্যাঙ্কের প্রধান অফিস ছিল। এই ব্যাঙ্ক ঢাকা ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত ছিল। এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রত্যহ প্রায় ৫ লক্ষ টাকার আদান-প্রদান হইত। সকাল ৭টা হইতে বেলা ১২টা অবধি এবং সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১১॥০টা পর্য্যন্ত টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দ কেবল শ্রুতিগোচর হইত। মথুরামোহন পোদ্দারের ফার্ম্মের সহিত অনেক মাড়োয়ারী ও পার্শী ফার্ম্ম এবং অধিকাংশ ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনা ছিল। বাঁশতলা, শিবতলা ষ্ট্রীট, জোড়াবাগান, হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে দেশীয় ফার্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত গোলমাল হইত তাহা এই ফার্ম্মের গোমস্তা আপোষে মিটাইয়া দিতেন। এই বংশ রূপলাল দাস ও রঘুনাথ দাসের সময়ে সবিশেষ সমৃদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করে। এই সময়ে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিণ ঢাকা ডাল বাজারে ইঁহাদের সম্মিলিত প্রাসাদে ভোজন করিয়া ইঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদটি বুড়ী গঙ্গার

উত্তর তীরে অবস্থিত এবং বৈদ্যুতিক আলোক-সুশোভিত। নদীপথ হইতে এই প্রাসাদের শোভা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে অতি মনোরম।

রঘুনাথ দাস যদিও তেমন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন না, তবুও তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতি উদার ও মহৎ ছিল। দেশ-বিদেশের যাবতীয় সংবাদ তিনি রাখিতেন। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রূপলাল দাসের আর্থিক সাহায্যে অধ্যয়ন করিত। প্রসাদদাস ও দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের বাটীতে থাকিয়াই লেখাপড়া শিখেন। অন্নদাপ্রসাদ কবি ছিলেন এবং দ্বারকানাথ মুন্সিগঞ্জে রূপলাল রঘুনাথ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘ বার বৎসর কাল এই স্কুলটি চলিবার পর গৃহ-বিবাদের জন্য তাহা উঠিয়া যায়। ঢাকা বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ লট্‌মন জন্‌সন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গৃহবিবাদ মিটাইয়া দেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা "জন্‌সন্ হল" নামে একটি সুন্দর হল নদীর ধারে নির্ম্মাণ করেন। এই হলে সহরের ভদ্রলোকগণ সমবেত হইয়া সন্ধ্যাকালে বিলিয়ার্ড খেলেন। রঘুনাথ ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দান করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস ব্যারিষ্টার ৺লালমোহন ঘোষকে পার্লমেণ্টের সভ্য হইবার জন্য টাকা দান করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বাবু ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে বাড়ী হইতে স্কুলে আনা ও বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য একখানি গাড়ী দান করিয়াছিলেন। বাগ-বাগিচা করিবার জন্য তাঁহার খুবই আগ্রহ ছিল এবং তাঁহার এই সম্পর্কীয় অনেক পুস্তক আছে। ফরিদাবাদে তাঁহার একটি বড় বাগান আছে। সেই বাগিচায় সম্মুখে একটি পুষ্করিণী এবং দুই ধারে দুইটি পুষ্করিণী আছে। সেই বাগিচা নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে সমাকীর্ণ। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তিনি তীর্থ-ভ্রমণ-সম্পর্কে ভারতের অনেক প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়া

স্বভাবের অনেক সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি সুন্দররূপে অশ্বচালনা করিতে পারিতেন এবং সঙ্গীতে আমুরক্তি থাকায় অনেক গায়ককে তিনি প্রতিপালন করিতেন। রঘুনাথ দাস একজন উচ্চ শ্রেণীর ফটোগ্রাফার ছিলেন। এই বিদ্যা শিখিবার জন্য তিনি অনেক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি একজন রাসায়নিক ছিলেন। ঔষধপত্রসম্বন্ধেও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল, অনেক রোগী এখনও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৯১৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রঘুনাথ দাস অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত -হন। তাঁহার মৃত্যুতে ঢাকার দরিদ্রদিগের যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

তাঁহার পত্নী সৌদামিনী দাস্যা তাঁহার সম্পত্তির একমাত্র কার্য্য-নির্ব্বাহিকা। তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার স্বামীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে এত অধিক টাকা ব্যয় কদাচিৎ দেখা যায় না। কাশীধামের ও বাঙ্গালার বহু পণ্ডিত এই শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত হইয়া সভার পবিত্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সহরের বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকও নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এতদুপলক্ষে প্রায় দশ সহস্র ভিক্ষুককে অকাতরে খাওয়ান হইয়াছিল এবং প্রত্যেককে ১৲ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় মাধব তর্কচূড়ামণি এবং ঢাকাস্থ তাঁহার সংস্কৃত টোলের ছাত্রগণ এই শ্রাদ্ধকার্য্যে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রঘুবাবু এই টোলকে সাহায্য করিতেন। রাখালচন্দ্র দাস ও রায় প্যারীলাল দাস বাহাদুর প্রভৃতির চেষ্টায় এই শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল।

রমানাথ দাস রঘুনাথ দাসের পোষ্য পুত্র। বয়সে তিনি যুবক হইলেও তাঁহার শাসন ও কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তিনি "জমিদারী-সোপান" নামে একখানি জমিদারী-সংক্রান্ত পুস্তক

লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানিতে জমিদার ও প্রজা উভয় পক্ষের অনেক জানিবার আছে। লর্ড সিংহ এই পুস্তকখানির বিশেষ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার ন্যায় ঢাকা জেলার অন্যতম অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বে-সরকারী জেল-পরিদর্শক। ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি লর্ড রোনাল্ডসে ও সহরের সমস্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদিগকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করেন। লর্ড রোনাল্ডসের এই পরিদর্শনের স্মৃতি-রক্ষার্থে তিনি অনেক টাকা দান করেন। জমিদারী শাসনাদি ব্যাপারে রমানাথবাবু পরলোকগত ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্তের সমকক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রণীত "জমিদারী-সোপান" পুস্তকই তৎসম্বন্ধে জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, সি-আই-ই।

রায় ডাঃ চুণীলাল বসু বাহাদুর, সি-আই-ই, আই এস্‌-ও, এম-বি, এফ্‌-সি-এস্‌ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ্চ তারিখে শ্যামবাজারের স্বর্গীয় দীননাথ বসুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস চব্বিশপরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামের নিকট চিংড়িপোতায়। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ কলিকাতা জোড়াবাগানে আসিয়া প্রথমে বাস করেন।

ডাক্তার বসু শ্যামবাজার উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। এক্ষণে উক্ত বিদ্যালয় শ্যামবাজার এংগ্লো-ভার্ণাকিউলার স্কুলে পরিণত হইয়াছে। তিনি উক্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং জেনারেল এসেমব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসন (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) হইতে এফ্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। মেডিকেল কলেজে তিনি বটানি, প্যাথলজি, মেডিসিন্‌ প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য সুবর্ণ পদক ও শারীরবিদ্যা, অস্ত্র-চিকিৎসা প্রভৃতিতে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে এম্‌-বি পরীক্ষা পাশ করিয়া এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরূপে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক ও মেডিকেল কলেজের রসায়ন-শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু নিযুক্ত হইবার পর মুহূর্ত্তেই উত্তর ব্রহ্মদেশের টংডুইঞ্জিবা নামক স্থানের সিভিল হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় চলিয়া যান। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মেডিকেল কলেজের কেমিকেল লেবরেটরীতে স্থায়ী পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রায় তারাপ্রসন্ন রায় বাহাদুর অবসর গ্রহণ

করিলে তিনি গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত কেমিকেল পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে তিনি গবর্ণমেণ্টের কেমিকেল পরীক্ষক ও মেডিকেল কলেজের রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে প্রথম ভারতীয় মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, ডাক্তার বসু তাহার সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। সেই কংগ্রেসে তিনি ডাক্তার ইভানসের সহিত একত্রে "বঙ্গে অবাধে বিষ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিতে হইলে ১৯০৪ সালে "বিষ বিক্রয় বন্ধের আইন" প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের কেমিকেল সোসাইটীর সভ্যপদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এতাবৎ কাল তিনি কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-বিজ্ঞানের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ হইতে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-সভাগৃহে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ১৯১৯ সালে তিনি এই সভার সহকারী সভাপতি ও অন্যতম ট্রাষ্টি নিযুক্ত হন। তিন বৎসর যাবৎ "Calcutta Medical Journal"এর সম্পাদক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং সাহিত্য-সভার, শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী ও কলিকাতা অনাথ আশ্রমের সম্পাদক। তিনি হাবড়া জেলার ব্রাহ্মণপাড়া এম্-ই স্কুলের সভাপতি এবং কলিকাতা ওয়ার্কিং মেনস্ ইনষ্টিটিউসন ও কলিকাতা টেম্প্যারেসন ফেডারেশনের সহকারী সভাপতি। বহু বৎসর যাবৎ তিনি বাঙ্গালার টেক্‌সট্ বুক কমিটির

সভ্য ছিলেন। কলিকাতা আরও অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভায় Commercial Analysis Class নামে একটি বিভাগ খুলিয়া ছাত্রগণের খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি বিশ্লেষণ শিক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া দেন। বহুদিন হইতে তিনি বেলগেছিয়া কারমাইকেল্ মেডিকেল কলেজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছেন। এই কলেজ যখন স্কুল ছিল তখন তিনি ইহার শিক্ষক ছিলেন; তাহার পর ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন, অবশেষে ইহার আজীবন সভ্য হইয়াছেন। ডাক্তার বসু এদেশের ও বিলাতের অনেক মাসিক ও সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার সবিস্তার আলোচনা করা এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীবনীতে সম্ভবপর নহে। ডাক্তার বসু নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি লিখিয়াছেন :—(১) ফলিত রসায়ন (২) রসায়নসূত্র (৩) জল (৪) বায়ু (৫) খাদ্য (৬) শারীর স্বাস্থ্যবিধান (৭) A lump of coal (৮) A pinch of common salt. (৯) The tip of a match. (১০) Combustion. (১১) চা (১২) Marriage dowry (১৩) কাগজ (১৪) পুরী যাইবার পথে (১৫) The health of Indian students. (১৬) পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন। (১৭) Some practical hints to improve the dietary of the Bengalees. (১৮) The milk supply of Calcutta. (১৮) (১৯) Prevention of small pox. (২০) A few hints on sanitary reconstruction. (২১) The Science Association and its founder (২২) Some common food-stuffs. (২৩) Life of Sir Gooroodass Banerjee ইত্যাদি।

১৯১৫ সালের ৩রা জুন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আই-এস্-ও (Imperial Service Order) উপাধি প্রদান করেন।

১৯১৭ সালে কলিকাতায় যে নিখিল ভারতীয় মাদক-নিবারণী কান্‌ফারেন্স হয় তিনি তাহার সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে নাগপুরে যে সপ্তম বিজ্ঞান কমিটি হয় তিনি তাহাতে Choise of food সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯২০ সালের মার্চ্চ মাসে ঢাকা শিল্প-সামাজিক প্রদর্শনীতে তিনি খাদ্য সম্বন্ধে দুইটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, বিজ্ঞান-সভা প্রভৃতিতে যে কত বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। ১৯২০ সালে কলিকাতার টাউন হলে Child Welfare Exhibitionএ Impure air and Infant mortality সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করেন।

স্যার লিওনার্ড রজার্স কুষ্ঠব্যাধি সম্বন্ধে যে ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, ডাক্তার বসু সে বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকদের প্রকোষ্ঠে ডাক্তার বসুর একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

১৯২০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সরকারের অধীনে ৩৪ বৎসর ৫ মাস ও ১৩ দিন কাজ করিবার পর রায় বাহাদুর অবসর গ্রহণ করেন। ডাক্তার বসু হাবড়া ব্রাহ্মণপাড়ার স্বর্গীয় গৌরকিশোর সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলপ্রকাশ বসু এম্-এ বারিষ্টার এবং কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ বসু এম-বি বহুমূত্র রোগ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা-কার্য্যে কলিকাতা ট্রপিকাল্ স্কুলে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

১৯২১ সালে ডাক্তার বসু কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হন। ডাক্তার বসু বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মেণ্ডিকেন্সী কমিটি, ট্রামওয়ে ধর্ম্মঘট কমিটি, হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ে ধর্ম্মঘট কমিটিতে সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯২১ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্যানিটারী বোর্ডের সভ্যপদে নিযুক্ত করেন।

১৩২৯ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি-পদে বরিত হইয়াছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রাহা বাহাদুর বিদ্যাবিনোদ।

খুলনা জেলা-কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রাহা বাহাদুর উক্ত জেলার নলধা গ্রামে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুলনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য ও মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই তাঁহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে বলেন; কিন্তু অমৃতলালের নিকট তাঁহাদের পরামর্শ মনোমত বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। এক বৎসর কাল বিশ্রাম লাভ করিয়া অমৃতলাল কিছু টাকা লইয়া গোপনে কলিকাতায় আসেন এবং জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে ভর্ত্তি হন। তাঁহার পিতা অবশ্য তাঁহাকে পড়িতে অনেক প্রকারে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অমৃতলাল তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। এফ্-এ পরীক্ষা দিবার দুই মাসে পূর্ব্ব অমৃতলালের পিতা হৃদ্‌রোগে মারা যান; কাজেই সমস্ত সংসারের ভার অমৃতলালের উপর পতিত হয়। কিন্তু এই সংসারের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া অমৃতলাল পরীক্ষায় উপস্থিত হন এবং পাশ করেন। অতঃপর দীর্ঘ পনের মাস কাল তাঁহাকে বিষয়-সম্পত্তির উদ্ধার-কল্পে মামলা-মোকদ্দমা করিতে হইয়াছিল। তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উপরোক্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খুলনা কোর্টের উকিল-শ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৮৬

রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর।

খৃষ্টাব্দে তিনি খুলনা জেলা-বোর্ডের সভ্য হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ্চ তিনি খুলনা জেলা-বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান হন। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে কার্য্য করিবার পর তিনি উক্ত জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতা-দর্শনে তাঁহাকে দুইখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি সাত বৎসরকাল খুলনা উড্‌বর্ণ হাসপাতালের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এই হাসপাতালের ডিস্‌পেনসারী-গৃহ তৈয়ারী হয়। এই হাসপাতালের জন্য অমৃতলাল যে অসাধারণ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার মিঃ ব্যাকৃল্যাণ্ড হাসপাতালের দ্বারোদ্‌ঘাটনকালে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন। খুলনায় যে সমস্ত কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী হইয়াছিল, তিনি সেগুলির অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি খুলনা শাখা দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের খুলনা-শাখার সম্পাদক ছিলেন।

অমৃতলাল অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন। অমৃতলালের মাতা বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণ-মহিলা ছিলেন। অমৃতলাল যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহা মাতার হস্তে আনিয়া অর্পণ করিতেন। তাঁহার মাতা ১৯০৭ সালে স্বর্গারোহণ করেন। মাতার স্মৃতি-রক্ষার্থ তিনি বহু অর্থব্যয়ে খুলনা জেলার ডিস্‌পেন্সারীর সন্নিকটে "দীনমণি কলেরা ওয়ার্ড" নামে একটি স্বতন্ত্র ওয়ার্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। এখন উক্ত বিদ্যালয়টি একটি প্রশস্ত অট্টালিকায় অবস্থিত। সরকারী ও বে-সরকারী সকল লোকই সমভাবে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার পাঁজিয়া গ্রাম-নিবাসী দেওয়ান রুক্মিণীকান্ত ও রাজা পরেশনাথ বসুর বংশে তিনি বিবাহ করেন।

তিনি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা অবধি উক্ত ব্যাঙ্কের ডেপুটী চেয়ারম্যান-পদে নিযুক্ত আছেন। খুলনা জেলার ঋণ-দান কোম্পানীর (Loan Company) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। খুলনা করোনেশন শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে অমৃতলালেরই সবিশেষ চেষ্টা নিহিত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে দেশব্যাপী প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দুর্ভিক্ষদমন-কল্পে যে ভাণ্ডার ও সাহায্যদানসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, অমৃতলাল তাহার সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রবল বাত্যায় বঙ্গদেশ ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইলে তিনি যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া বাত্যা-পীড়িতদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন ও একখানি সার্টিফিকেট দিয়াছেন। গত দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত জেলা-বোর্ড দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত উত্তরবঙ্গ-বন্যার সময় খুলনায় যে সাহায্য-কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল অমৃতলাল তাহার সভাপতি ছিলেন। তিনি দরিদ্র ভদ্রমহিলাগণের বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য একটি ফণ্ড করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ চিকিৎসাকার্য্য, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রচার, স্বাস্থ্যরক্ষা ও জল-সরবরাহ-কল্পে উঁহার নেতৃত্বাধীনে খুলনা জেলা-বোর্ড যাহা করিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের কোন জেলা-বোর্ড সেরূপ করিতে পারেন নাই। তিনি জনসাধারণের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক। কৃষ্ণনগর ডাকাতির মামলার ও খুলনা যশোহর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলার জন্য যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের গঠন হয়, তিনি সেই দুইটী ট্রাইব্যুনালেরই জজ নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

তিনি খুলনা জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল। তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা ও প্রগাঢ় আইন-জ্ঞানের জন্য উকিল, মোক্তার হইতে জজ, মুন্সেফ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। গত ৩৯ বৎসর কাল যাবৎ খুলনা দেওয়ানী কোর্টে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য দেওয়ানী মোকদ্দমা হয় নাই যাহাতে

অমৃতলাল প্রধান উকিলের স্থান অধিকার না করিয়াছেন। স্যর রাসবিহারী ঘোষ, ৺শ্রীনাথ দাস, ৺মোহিনী রায় প্রমুখ কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিলগণ একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, অমৃতলাল দেওয়ানী মামলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব। খুলনা জেলার প্রায় যাবতীয় বড় বড় জমিদারের তিনি বাঁধা উকিল। আজ দুই বৎসর হইল নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে "বিদ্যাবিনোদ,"-উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

বজ্রযোগিনীর গুহ-বংশ।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমা-ভুক্ত বিক্রমপুর পরগণাস্থিত বজ্রযোগিনী গ্রামের গুহ-বংশ বঙ্গজ কায়স্থসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। বজ্রযোগিনী বিক্রমপুরের একটী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শোভারাম গুহ। স্বর্গীয় জয়চন্দ্র গুহ ও কালীকিশোর গুহ এই বংশের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহাদের সম-সময়ে যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে জয়চন্দ্র ও কালীকিশোর শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জয়চন্দ্র ও কালীকিশোর দুই ভ্রাতা। অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই দুইজনের নামই বিক্রমপুর অঞ্চলে বিখ্যাত। জয়চন্দ্র অগ্রজ; কালীকিশোর তাঁহার অনুজ।

জয়চন্দ্র প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যা-বুদ্ধিতে ও অভিজ্ঞতায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি তখনকার দিনে অত্যন্ত বিরল ছিল। এদেশে তখন ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কাল। তাঁহার যোগ্যতার জন্য তিনি প্রথমে সেরিস্তাদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। সে সময়ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেশীয়গণের পক্ষে উচ্চতম রাজপদরূপেই পরিগণিত ছিল। জয়চন্দ্র তাঁহার সমকক্ষ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষমতা-দর্শনে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি অকালে—মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জয়চন্দ্র যেরূপ সুরূপ ও সুকান্তি, তেমনই গুণশালী ছিলেন। তাঁহাতে রূপ-গুণের সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি শিষ্টাচার-বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ও নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সকলের সহিত মিশিতেন এবং

সকলের সুখ-দুঃখের তত্ত্ব লইতেন। তিনি সাধ্যমত সকলের অভাব-মোচন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, কংগ্রেসের উনবিংশ অধিবেশনের সভাপতি স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ জয়চন্দ্রের জামাতা ছিলেন।

জয়চন্দ্রের অনুজ কালীকিশোর বাঙ্গালা ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার তেমন প্রচলন হয় নাই। কাজেই সেকালের রীতি অনুসারে তিনি পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি কিছুদিন ময়মনসিংহ দেওয়ানী আদালতের নাজির ছিলেন। কর্ম্মসূত্রে তাঁহাকে বহু লোকের সম্পর্কে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বভাব এতই মধুর ছিল যে, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে তৃপ্তিলাভ করিত। কালীকিশোর বাবু লক্ষ্মণের ন্যায় পরম ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার মত অগ্রজের প্রতি ভক্তিমান্ ভ্রাতা সচরাচর দৃষ্ট হইত না। অগ্রজের আদেশ তিনি দেবতার আদেশের মত জ্ঞান করিতেন এবং তাহা প্রতিপালনের জন্য প্রাণপণ করিতেন। কালীকিশোর অসাধারণ পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী ছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং তাহাতে বিপুল জমিদারী ক্রয় করা হয়। বজ্রযোগিনী গ্রামে ইঁহাদের যে বাস্তুভিটা ছিল, তাহার উপর যে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা কালীকিশোরবাবুই করিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ জয়চন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর কালীকিশোর বাবু জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ ও বিষয়-সম্পত্তি-পরিদর্শনের জন্য নাজিরী ত্যাগ করিয়া বাটী চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কারস্বরূপ উক্ত পদ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করেন। সে যুগে চরিত্র রক্ষা করিয়া চলা বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু শত প্রলোভনের মধ্যেও কালীকিশোর তদীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তখন পানাসক্তিশূন্য ব্যক্তি ভদ্র সমাজেও

ক্বচিৎ দৃষ্ট হইত। কিন্তু পানাসক্তি ত দূরের কথা,তামাক,পান পর্য্যন্ত তিনি খাইতেন না। একদিকে তিনি যেমন স্বধর্ম্মনিরত, দাতা, বিনয়ী, সত্যবাদী এবং পরোপকারী ছিলেন, অপরদিকে ধর্ম্মজীবনে তিনি তেমনই উন্নত ছিলেন। গৃহদেবতার পূজা না হইলে এবং জননীর আহার না হইলে তিনি অন্ন গ্রহণ করিতেন না। লোকসেবা তাঁহার জীবনের পরম ব্রত ছিল। জনসাধারণের কল্যাণকল্পে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি পরোপকার বা জনহিতের জন্য সামর্থ্যের অতীত দানও করিয়া ফেলিতেন। কালীকিশোরের বদান্যতাই বজ্রযোগিনী গ্রামের প্রায় সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের মূল। ব্রজযোগিনী গ্রামের বিবিধ সদনুষ্ঠান এখনও উহার সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রজযোগিনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জের কালীবাড়ী ও মহকুমাহাকিমের বাসার নিকটবর্ত্তী কালীবাড়ীর পুষ্করিণী, বজ্রযোগিনী ও মিরকাদিমের রাস্তা, সুখবাসপুরের কালীমন্দির, বজ্রযোগিনীর ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি এই দানশীল ব্যক্তিরই অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও নির্ম্মিত। এই-সকল সদনুষ্ঠানের সমগ্র ব্যয়ভার তিনিই বহন করিয়াছিলেন। দুঃস্থ ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়নদান, পিতৃমাতৃদায়গ্রস্তের উদ্ধার-সাধন, দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া—এইসকল কার্য্য তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনহিতকর কার্য্যাবলীর জন্য গবর্মেণ্ট ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র (Certificate of Honours প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রামের অধিবাসিবর্গ এক্ষণে যেসকল সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন সে সকলের জন্য তাঁহারা গুহবংশের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। কাহারও উপরোধ, অনুরোধ বা সুখ্যাতির আশায় তিনি এই সকল জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই; তিনি লোকের কল্যাণ-কামনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যসমূহ করিয়াছিলেন।

জয়চন্দ্র ও কালীকিশোরের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের হিসাবে বজ্রযোগিনীর অধিবাসিগণ স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টী "জয়কালী হাই ইংলিস স্কুল" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বজ্রযোগিনীর গুহ-বংশ এখনও পর্য্যন্ত মুক্তহস্তে এই বিদ্যালয়টির উন্নতি-সাধনের জন্য অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে এই বিদ্যালয়টী কখনই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিত না।

কালীকিশোরবাবু অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি তদীয় মাতৃদেবীর দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের বহু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পাথেয় ও দক্ষিণা দিয়া সন্তোষসহকারে বিদায় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক দীনদুঃখীকে ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

কালীকিশোর সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। সেজন্য তিনি নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের নিকট "কর্ত্তা"-রূপে পরিচিত ছিলেন। ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং সালিশ মান্য করিত। তিনি নিজে কখনও নিলামের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন না, অপরকেও এ বিষয়ে নিষেধ করিতেন। তিনি এরূপ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, শত্রুতেও তাঁহাকে সাক্ষী মান্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা আশঙ্কা অনুভব করিত না।

পুণ্যস্মৃতি জয়চন্দ্র গুহের পুত্র বসন্তকুমার গুহ বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি গুহকুলের প্রদীপস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাতেও পিতৃগুণসমূহ বিদ্যমান ছিল। তিনি কিছুদিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ঢাকা কলেজে ছাত্র-জীবনে ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময়ে তিনি ক্রিকেট খেলায় পারদর্শিতার জন্য

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রিকেট খেলায় তাঁহার নৈপুণ্য দেখিয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিভার টমসন তাঁহাকে একখানি কারুকার্য্যযুক্ত ব্যাট্ (Ornamented bat) পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ জে-ভি-এস পোপের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনিই সুপারিস করিয়া বসন্তকুমারকে চূড়ামণ এষ্টেটের অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার-পুত্রের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন এই কার্য্য করিবার পরে তাঁহার পিতৃব্য কালীকিশোর বার্দ্ধক্যজনিত মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য তাঁহাকে চাকুরী ছাড়িয়া বিষয়-সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বাড়ীতে চলিয়া আসিতে বলেন। তখন তিনি উক্ত চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বৈষয়িক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ৫০ বৎসর বয়সের কিছু পরেই তিনি লোকান্তরিত হন। তিনি শিষ্টাচারী, ভদ্র, নম্র ও সৌজন্যসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বজ্রযোগিনীতে স্ব-ভবনে অবস্থান করিবার সময়ে তিনি স্থানীয় স্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

বসন্তকুমারের তিন পুত্র; তিন জনের মধ্যে দুই জন এক্ষণে জীবিত আছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফাষ্ট আর্টস শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে বাড়ীতে থাকিয়া নিজেদের জমিদারী দেখাশুনা করিতেছেন।

কালীকিশোরবাবু ১১টি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ৮ জন এখনও জীবিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়মনসিংহ জজ আদালতের নাজির ছিলেন। কালীকিশোরবাবুর আর এক পুত্র কেরাণীগিরি করিতেন; এক্ষণে পেনসন ভোগ করিতেছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সূর্য্যবাবু কৃতী, নির্লোভ ও যশস্বী ডেপুটি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; অবসর গ্রহণ করিয়া এক্ষণে কাশীবাসী হইয়াছেন। এই সূর্য্যবাবুর

এক পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট; ইনি ডাকবিভাগের প্রসিদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র গুহ, বি-এল ঢাকা কলেজের জনৈক কৃতী ছাত্র তাঁহার অন্যতম পুত্র। তিনি মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু না ঘটিলে তিনি এতদিনে জেলা-জজ-রূপে অবসর গ্রহণ করিতে পারিতেন। কালীকিশোরবাবুর আর এক পুত্রের নাম—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ। ইনি স্পেশ্যাল সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। গবর্মেণ্ট ইঁহাকে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র (Certificate of Honours) দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি পেন্সন লইয়া ঢাকায় বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বি-এ কালীকিশোরবাবুর অন্যতম পুত্র। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এক্ষণে মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারীর সব-ম্যানেজার। কালীবাবুর আর এক পুত্র রায় রমেশচন্দ্র গুহ বাহাদুর বজ্রযোগিনীতে আপনাদের ভবনে বাস করিতেছেন। ইনি মুন্সীগঞ্জের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। গবর্মেণ্ট হইতে ইনি একটি পদক ও সম্মান-সূচক প্রশংসা-পত্র (Certificate of Honours) পাইয়াছেন। ইনি জেলা-বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং এক্ষণে বজ্রযোগিনী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও জয়কালী হাই ইংলিস স্কুলের সেক্রেটারী। ইঁহার ভ্রাতা রায় ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ বাহাদুর, বি-এল ঢাকা জজ আদালতের উকীল। ইনি ছয় বৎসর ঢাকা জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানের কর্ম্ম সবিশেষে কৃতিত্বের সহিত করিয়াছেন। জনসেবায় তাঁহার যোগ্যতা-দর্শনে প্রীত হইয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। সরাইল এষ্টেটের স্বত্বাধিকারী ক্ষিতীশবাবুর যোগ্যতা দেখিয়া তাঁহাকে এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্ষিতীশবাবুর হেড কোয়ার্টার্‌স বা সদর কাছারী হইয়াছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ইনি পরম চরিত্রবান, শিষ্টাচারপরায়ণ, বিনয়ী, সহানুভূতিপ্রবণ, নিরভিমান ভদ্রলোক; কর্ম্মকুশলতায় ইঁহার

সমতুল্য কর্ম্মচারী অতি বিরল। ইনি বহু গুণের অধিকারী। ক্ষিতীশ-বাবুর এক ভ্রাতা ঢাকা হেনা প্রেসের স্বত্বাধিকারী। কর্ম্মনৈপুণ্যের জন্য তিনি সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

বজ্রযোগিনীর গুহ-পরিবার কুটুম্বিতা-সূত্রে বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত সম্বন্ধ। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, বহু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ, মুন্সেফ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত রাজপুরুষ তাঁহাদের নিকট আত্মীয়। সেইজন্য বঙ্গজ কায়স্থসমাজে গুহ-পরিবারের এত মান-মর্য্যাদা ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু

বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়া যে সমস্ত আলোকসামান্য মহাপুরুষ বাঙ্গালীর মুখ জগতের সমক্ষে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহাদের জন্য বাঙ্গালী জাতি আজ বিশ্বসভায় গৌরবের উচ্চাসন লাভ করিয়াছে, বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার মধ্যে অন্যতম। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর গ্রামে জগদীশ-চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পুত্রের শিক্ষাবিধানের দিকে তাঁহার মনোযোগের অভাব ছিল না। জগদীশচন্দ্র শৈশব হইতেই নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কারে মনোযোগী ছিলেন। নিউটন যেমন শৈশবে ও বাল্য বয়সে পিতাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন-বাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেন, জগদীশচন্দ্রও তেমনি পিতাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। পিতা ভগবানচন্দ্র ইহাতে পুত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র কুপিত না হইয়া বরং সহজ সরল উত্তর-দানে শিশুর অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। দিনের বেলায় সূর্য্য উঠে কেন, রাত্রি বেলায় সূর্য্য কোথায় যায়, পৃথিবী সূর্য্যের চারিধারে ঘুরে, না সূর্য্য পৃথিবীর চারিধারে ঘুরে, পৃথিবীটা কত বড়, উদ্ভিদের প্রাণ আছে কি না, পশুপক্ষীর ভাষা আছে কি না, জগদীশচন্দ্র ইত্যাকার নানা প্রশ্ন তাঁহার পিতাকে করিতেন। পিতা সেগুলির যথাযথ উত্তর দিলেও জগদীশচন্দ্রের কৌতূহল কিন্তু তাহাতে নিবৃত্তি হইত না। তিনি অনেক সময় বৈঠকখানা-পূর্ণ লোকের পিতাকে বলিতেন, "বাবা! আমি বড় হইলে দেখিও ঘরে বসিয়া মানুষ যাহাতে ঐ হাজার ক্রোশ দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারে, এমন কল বাহির করিব।"

শিশু পুত্রের কথা শুনিয়া গৃহশুদ্ধ লোক একেবারে হাসিয়া অস্থির হইতেন।

জগদীশচন্দ্র পাঠ্যাবস্থায় উপনীত হইলে পিতা তাঁহাকে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি না করিয়া দিয়া পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, পাঠশালার শিক্ষাই বাল্য জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা হওয়া উচিত। পাঠশালায় যে মানসাঙ্ক, গণিত, ধারাপাত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা কলেজে গিয়া বড় বড় জ্যামিতি, বীজগণিত শিখিলেও শিক্ষা করা যায় না। আর একটা স্থবিধা এই যে, পাঠশালায় পড়িলে নানা শ্রেণীর ছেলেদের সহিত মিশিবার স্থযোগ পাওয়া যায়। পাঠশালায় দীন দরিদ্র কুটীরবাসীর পুত্রেরা অধ্যয়ন করে, ধনীর সন্তানেরা যদি ইহাদের সহিত না মিশিবে, তবে তাহারা সভ্য ও উন্নত হইবে কিরূপে? ভগবানচন্দ্র এই শ্রেণীর উচ্চান্তঃকরণের লোক ছিলেন। যাহাতে "অস্পৃশ্য" বালকদের সহিত একত্র বসিয়া ও পড়া-শুনা করিয়া জগদীশচন্দ্রের মন হইতে "আমি বড়" "অমুক বড়" এই ভাবটি চলিয়া যায় এই জন্যই তিনি পুত্রকে পাঠশালায় পাঠাইয়াছিলেন। ভগবানচন্দ্র এক শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে নানা প্রকার শিল্পবিষয়ক কারুকার্য্য চিন্তা করিয়া উদ্ভাবন করিতে হইত। জগদীশচন্দ্রেরও সেই শিল্প-বিদ্যালয়ে ভাবী জীবনের আবিষ্কারের প্রথম সূচনা হইয়াছিল। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, Child is the father of man অর্থাৎ শিশুই মানবের ভাবী পিতা। বস্তুতঃ শিশুর শৈশবকালীন কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহার ভাবী জীবনের আভাস পাওয়া যায়। যাহা শৈশব জীবনে অঙ্কুরিত অবস্থায় থাকে, তাহাই তাহার ভাবী জীবনে মহীরুহের ন্যায় বহুশাখ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। শৈশবের পেনসিল-চোর পরিণত বয়সে ঘোর তস্করে পরিণত হয়। জগদীশচন্দ্র পাঠশালার ছুটি হইলে অন্ত্যজ বালকদের সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিতেন,

তাঁহার মাতা সেই বালকদিগকে যত্নের সহিত নানা খাদ্যসামগ্রী দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা হইলেও ইহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে ঘৃণার ভাব আসিত না—তিনি আপন পুত্রের ন্যায় ইহাদিগকে স্নেহ করিতেন। এইরূপ স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে বালক জগদীশচন্দ্র লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত এবং শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহাকে সহর হইতে গ্রাম্য পাঠশালায় লইয়া যাইবার ও ফিরাইয়া আনিবার ভার যে ব্যক্তির উপর ছিল, সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী দ্বারবান ছিল না, সে এ দেশীয় লোক—পূর্ব্বে একজন ডাকাত ছিল। এদেশের ধনবান লোকমাত্রই বাড়ীতে হিন্দুস্থানী দ্বারবান রাখেন, হিন্দুস্থানী দ্বারবান না হইলে তাঁহাদের আভিজাত্যের পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের পিতা সরকারী চাকুরী করিলেও প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য রাখিবার বলবতী ইচ্ছা তাঁহার ছিল। Bengal for Bengalis এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতেন। এই যে ডাকাতের উপর তাঁহার চারিবৎসরের শিশু পুত্রকে গ্রাম্য পাঠশালায় লইয়া যাইবার এবং ফিরাইয়া আনিবার ভার তিনি দিয়াছিলেন, সে যে একজন সাধারণ ডাকাত ছিল তাহা নহে, সে ছিল একজন ডাকাতের সর্দ্দার। সে বহুস্থানে ডাকাতি করিয়াছিল এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিল, অবশেষে ভগবান বাবু একদিন একাকী এই ডাকাতকে ধরিয়া ফেলেন। বিচারে তাহার দীর্ঘ কালের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তার পর সে মুক্তি লাভ করিয়া ভগবান বাবুর নিকট আসিয়া অনুতাপ প্রকাশ করে ও সৎভাবে জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। ভগবানবাবু পাপীকে ক্ষমা করিয়া তাহাকে সৎপথে আনিতে জানিতেন। তিনি ইহাই মনে করিতেন, চোর, দস্যু, তস্কর, পতিতা, মদ্যপ অথবা ধর্ম্মত্যাগীরা যদি অনুতপ্ত হইয়া সৎভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, তাহা হইলে

তাহাদিগকে তদনুরূপ সুযোগ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এইজন্য তিনি সেই ডাকাতের সর্দ্দারকে দূর করিয়া তাড়াইয়া না দিয়া তাহাকে শিশুপুত্র জগদীশচন্দ্রের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সে জগদীশচন্দ্রকে কাঁধে করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রাম্য পাঠশালা হইতে ফিরাইয়া আনিত। চিরজীবন সে খুন-জখম করিয়া আসিলেও জগদীশচন্দ্রকে অতি স্নেহ করিত। সে জগদীশ-চন্দ্রকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহার ডাকাতি-জীবনের রোমাঞ্চকর গল্পসমূহ করিত এবং সেইসমস্ত গল্প জগদীশচন্দ্রের নৈতিক জীবনের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও জগদীশচন্দ্র তাহা শুনিয়া অসাধারণ কার্য্যসমূহ করিবার একটা প্রবল আকাজ্ক্ষায় উদ্দীপিত হইতেন। এই ডাকাত-সর্দ্দার পূর্ব্বজীবনে যাহাই করুক, তাহার উপর যে কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইয়াছিল, কখনও সেই কর্ত্তব্যের অপহ্নব করিত না। এক সময়ে এই ডাকাত ভগবানচন্দ্রকে সপরিবারে প্রাণে রক্ষা করিয়াছিল। একদা ভগবানবাবু সপরিবারে নৌকাযোগে যাইবার সময় একদল ডাকাতের বড় নৌকা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতেরা এত নিকটে আসিয়া পড়ে যে, ভগবানবাবুদের পক্ষে পলাইবার আর কোন উপায় ছিল না। তখন তাঁহার প্রভুভক্ত ভৃত্য ডাকাতের সর্দ্দার এমন একরূপ বিকট শব্দ করে যে, ডাকাতদিগের নৌকা আর তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া চলিয়া যায়।

জগদীশচন্দ্র কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া সিভিল সার্ভিস পড়িবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ভগবানচন্দ্র নিজে শাসক হইলেও শাসন-কর্ত্তার যে কতটুকু বিবেক-বুদ্ধি বজায় থাকে তাহা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী ছিল না। তাই তিনি পুত্রকে সিভিল সার্ভিসের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের ক্রিয়াকলাপ এবং চিন্তা-পদ্ধতি দেখিয়া

উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, জগদীশচন্দ্র সিবিল সার্ভিস পড়িবার জন্য যতই আগ্রহ প্রকাশ করুন না কেন তিনি কখনই শাসক-হিসাবে বড় হইতে পারিবেন না। তাই তিনি জগদীশচন্দ্রকে ইউরোপে গিয়া বিজ্ঞান পড়িবার জন্য বলিলেন। জগদীশচন্দ্রও পিতার অনুমতি লইয়া ইংলণ্ডে যাইলেন এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজ হইতে বি-এ ও পরবর্ত্তী বৎসর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

বিদেশে অধ্যয়ন শেষ করিয়া জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কে তখন এ কথা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, যে দেশ হইতে জগদীশচন্দ্র শিক্ষালাভ করিয়া আসিলেন, একদিন সেই দেশেই বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্যসমূহ শিক্ষা দিতে যাইবেন? কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া যদিও জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন, তত্রাচ তিনি গবেষণা করিবার কোন-রূপ সুযোগ ও সুবিধা পাইলেন না। জগদীশচন্দ্র যখন প্রথম আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন, তখন তথায় উল্লেখযোগ্য কোন লেবরেটরী ছিল না। তিনি ধীরতার সহিত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধৈর্য্যের বলে তিনি পরিশেষে সুফলও লাভ করিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করিবার দশ বৎসর পরে একটি ছোট লেবরেটরী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই লেবরেটরীই জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম কেন্দ্র হইল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই বৎসরেই Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় তাঁহার "The polarisation of Electic Ray to a Crystal" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরের Electician নামক পত্রে ইলেক্‌ট্রিসিটি সম্বন্ধে আরও

দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর "Determination of the Indices of Electric Refraction" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবামাত্র রয়াল সোসাইটী তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা-দর্শনে চমৎকৃত হন। সে সময়ে রয়াল সোসাইটীর মাসিক পত্রে কোন বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। রয়াল সোসাইটী কেবল যে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সোসাইটীর অর্থভাণ্ডার হইতে জগদীশচন্দ্রকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কিছু সাহায্যও করিলেন। তাহার দেখাদেখি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। বস্তুতঃ যদি রয়াল সোসাইটী জগদীশচন্দ্রকে অর্থসাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টও কখনই তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন না।

ডাঃ বসু আজীবন বিজ্ঞানের ছাত্র। ধৈর্য্যের সহিত ফলাফলের প্রতীক্ষা করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। তিনি অতি সামান্যভাবে তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কখনও পুরস্কৃত হইবার আশা রাখেন নাই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বসু রয়াল সোসাইটীতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আর একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠাইলেন। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ বসুকে "ডক্টর অব সায়েন্স' বা বিজ্ঞানাচার্য্য উপাধি প্রদান করিলেন।

বিনা তারে টেলিগ্রাম

অতঃপর বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদানের দিকে ডাঃ বসুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে বলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্কনী এবং আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিকও বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদানের উপায়-উদ্ভাবনে মনোযোগী হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা পরস্পর

পরস্পরকে না চিনিলেও একই সময়ে এই তিনজনের চিন্তাশক্তি বিনা তারে টেলিগ্রাম করিবার উপায় নিয়োজিত হইয়াছিল। ডাঃ বসু সর্ব্বপ্রথমে ইহা আবিষ্কার করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বসু কলিকাতা টাউন হলে গবর্ণরের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া দেখান। তখন বিলাতের রয়াল সোসাইটী এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য ডাঃ বসুকে আহ্বান করেন এবং ডাক্তার বসু এইভাবে একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার রয়াল সোসাইটীতে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বসু শুক্রবারের বক্তৃতা করিবার জন্য রয়াল সোসাইটীতে আহূত হন। ইহার চারিবৎসর পরে তিনি শুক্রবারে সান্ধ্য বক্তৃতা করিবার জন্য আবার তথায় আহূত হন। এইবার তিনি উদ্ভিদ ও জীবদেহে প্রাণের অস্তিত্ব বিশদরূপে প্রমাণিত করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনরায় রয়াল সোসাইটী সান্ধ্য বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সমালোচনায় বলা হয় :—

"The great honour of delivering a Friday evening discourse before the Royal Institution of Great Britain has again been offered to Dr. J. C. Bose. The subject of Dr. Bose's discourse will be his recent psycho-physiological research has created much interest in the scientific world. Prof. Bose has also been invited to deliver a course of lectures before the University of Oxford. That this is the third time that Prof. Bose has been invited to lecture at the Royal Institution is a very rare distinction indeed. To this may be added that he has been invited by the Cambridge University

too, to deliver a course of lectures. If time permits, he will fulfil his engagements to lecture before some learned Societies in France and Germany, but it will not be possible, perhaps to include America in his forth-coming tour.

প্যারিসে বক্তৃতা

১৯০০খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর জন উডবর্ণ ও ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্যারিসের বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে প্রেরণ করেন। সেই কংগ্রেসে তিনি এমন সুন্দররূপে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেন যে, সকলেই একবাক্যে বলেন, জগদীশচন্দ্র অতি যোগ্যতার সহিত আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া ভারত-বর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি আবার প্যারিসে তাঁহার নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আহূত হন। তথায় Society De Physiqueএ প্রথম বক্তৃতা, Saileborneএ দ্বিতীয় বক্তৃতা এবং Society De Zoologiqueএ তিনি তৃতীয় বক্তৃতা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Society Fancaise De Physique কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

ভূ-প্রদক্ষিণ

ইহার পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটী বক্তৃতা করিবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হন। তাঁহার সহকারী মিঃ বি সেন সেইসমস্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে লেখেন:—"২০শে মে ডাঃ বসু অক্সফোর্ডে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বৈজ্ঞানিকেরা স্যর জগদীশের বক্তৃতা শুনিয়া এই সত্যে

উপনীত হইয়াছেন যে, জীবনের ধারা সর্ব্বভূতেই সমান। বৃক্ষে ও মানুষে একই জীবন-ধারা প্রবাহিত।

জুন মাসে ডাঃ বসু ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। প্রফেসার সিউয়ার্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এতটা মোহিত হন যে, তাঁহারা ড.ঃ বসুর চারা গাছগুলিকে জীবন্ত রাখিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে মৃত্তিকা লইয়া যান। অধ্যাপক ষ্টার্লিং, অলিভার ও ক্যারেথ রাড তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। মিঃ ব্যালফোর ডাঃ বসুর লেবরেটরীতে আসিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করেন। অধ্যাপক মলিস ডাঃ বসুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন, ইউরোপখণ্ড ডাঃ বসুর আবিষ্কারের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। উদ্ভিদতত্ত্বানুসন্ধিৎসু কতিপয় ছাত্র ডাঃ বসুর বক্তৃতায় এতদূর মুগ্ধ হয় যে, তাহারা কলিকাতায় আসিয়া ডাঃ বসুর লেবরেটরীতে শিক্ষালাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

এই সময়ে ডাঃ বসু আমেরিকাও ভ্রমণ করেন। মেইন হইতে কালিফোর্ণিয়া পর্য্যন্ত নানাস্থানে তিনি নিমন্ত্রিত হন। নিউ ইয়র্কের বিজ্ঞান-সভা, ব্রুকলিন ইন্‌ষ্টিটিউট্, হার্ভার্ড, কলাম্বিয়া ও চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় অতি আগ্রহের সহিত ডাঃ বসুর বক্তৃতা শুনেন এবং তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। একটি অভিনন্দনের উত্তরে ডাঃ বসু বলেন, "এইবার ধরিয়া চতুর্থবার তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতীচ্য দেশে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। প্রতীচ্য খণ্ডে আসিয়া তিনি আশাতীত কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ভিয়েনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ, লণ্ডন, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, চিকাগো, কলম্বো, টোকিও ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার বক্তৃতা অতি আগ্রহের সহিত শুনা হইয়াছে। যদিও কোন কোন স্থলে তাঁহার আবিষ্কার-সমূহ সম্বন্ধে নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে সকলে

অত্যন্ত প্রশংসাই করিয়াছেন। এখন ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রাচ্যের চিন্তাধারার সহিত প্রতীচ্যের বাস্তব একত্র সম্মিলিত হইয়া বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে।"

ভারতবর্ষে সম্মান

গেঁয়ো যোগীর ভিখ মেলে না, ইহা সত্য, বটে; কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বেলায় ইহা খাটে না। তিনি ভারতবর্ষে যে পরিমাণ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডকটর অব্ সায়েন্স" উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিজ্ঞান বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। তৎপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালীকে পঞ্চনদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করা হয় নাই। ডাঃ বসুর পরে স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আহূত হন। তিনটি বক্তৃতার পারিশ্রমিকস্বরূপ ডাঃ বসুকে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১২শত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ডাঃ বসু সেই টাকা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়েই দান করেন এবং প্রস্তাব করেন, ঐ টাকা হইতে প্রতি মাসে একশত টাকা করিয়া একজন গবেষণা-কারী ছাত্রকে প্রদান করা হইবে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ডাঃ বসু বলেন—পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে জীবক নামে একজন জ্ঞানান্বেষী তক্ষশিলায় আসিয়াছিলেন, এই জীবক পরিশেষে বুদ্ধদেবকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ শতাব্দী পরে আর একজন জ্ঞানান্বেষী যাহা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা লইয়া আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। জ্ঞান বস্তুটি কোন বিশেষ লোকের নিজস্ব সম্পত্তি নহে; কিংবা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জ্ঞান আবদ্ধ থাকে না। গ্রীক ও আর্য্য উভয় জাতি এই তক্ষশিলায় পরস্পরের জ্ঞান-বিনিময়

করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। বহু বর্ষ পরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আবার সম্মিলিত হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

স্যর জগদীশের আবিষ্কার কি? কি জন্য তিনি আজ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন? তিনি এই আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বৃক্ষের জীবনে এবং মানুষের জীবনে কোন প্রভেদ নাই। ডাঃ বসু আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, রাত্রি ১২টার সময় বৃক্ষসকল নিদ্রা যায় এবং প্রাতে ৮টার সময় তাহারা গাত্রোত্থান করে। মৃত্যুকালে মানুষের ন্যায় বৃক্ষেরাও অসহনীয় যন্ত্রণা-ভোগ করিয়া থাকে। ডাঃ বসু এই আবিষ্কার করিয়া জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকদিগের সমস্ত আবিষ্কারকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন।

আবিষ্কারের ফল

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই সমস্ত আবিষ্কার অপূর্ব্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ইহা কি মানবজাতির চিরন্তন দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবে? এ কথার উত্তর আমরা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের ভাষায় দিতেছি। ফ্যারাডে বলিয়াছেন, "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যদি কোন ফল না হয়, তব সদ্যো-জাত শিশুতেই বা কি ফল? কে জানে সেই শিশু দ্বারা ভবিষ্যতের কি ফল হইবে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন কে আশা করিয়াছিল যে, ইহা দ্বারা জগতের মহা কল্যাণসাধন হইবে? কে জানে, ডাঃ জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে চিকিৎসা ও কৃষি-জগতের মহাপরিবর্ত্তন সাধন করিবে কি না?" বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্র The Lancetও ডাঃ বসুর আবিষ্কারের ভাবী উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং এই আবিষ্কারের দ্বারা কৃষি-জগতের যে মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, একথাও লিখিয়াছেন।

১৯০৬ সালে ডাঃ বসুর "Plant Response" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তকে তিনি উদ্ভিদ সম্বন্ধে এইরূপ গবেষণাপূর্ণ নূতন নূতন বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাহাতে পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে। ডাঃ বসুর প্রতিভাকে ভারত সরকার প্রথমতঃ আমল দিতে চাহেন নাই, পরে কিন্তু আমল দেন। রয়াল সোসাইটী ডাঃ বসুকে সম্মানিত করিবার পর ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্যারিসের বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে প্রেরণ করেন। সে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বসু যখন আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কলিকাতার সেরিফ একটি সভা করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ইংরেজী ১৯১৭ সালে ডাঃ বসুকে গবর্ণমেণ্ট "নাইট" উপাধি প্রদান করেন। ছাত্রেরা এতদুপলক্ষে ডাঃ বসুকে একটি বিরাট সভায় অভিনন্দিত করে এবং সেই সভায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেই সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, ডাঃ বসুকে শুধু বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কারক বলিলে চলিবে না,তাঁহাকে যুগ-প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। ডাঃ বসু মহৎ লোক এবং নিঃস্বার্থ বৈজ্ঞানিক। মার্কনি বেতার টেলিগ্রাম আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে ডাঃ বসু উহা আবিষ্কার করেন। যদি তিনি তাঁহার বেতার টেলিগ্রামের যন্ত্রপাতির পেটেণ্ট করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু ডাঃ বসু আজীবন লোকের উপহাসকে গ্রাহ্য না করিয়া বৈজ্ঞানিক সাধনা করিয়া আসিয়াছেন।

ইংরেজী ১৯১৮ সালে ডাঃ বসুর স্বগৃহস্থ লেবরেটরী বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড পরিদর্শন করেন। বড়লাট তাঁহার লেবরেটরী-দর্শনে এতদূর প্রীত হন যে, তিনি তথায় দুই ঘণ্টা কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। Bose

Research Institute কেবল ডাঃ বসুর গৌরবের স্তম্ভ নহে, সমগ্র জগতের গৌরব-স্তম্ভ।

ডাঃ বসু শুধু একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নহেন, তিনি একজন উচ্চাঙ্গের বক্তা এবং আদর্শ শিক্ষক। তিনি যে বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, শ্রোতার প্রাণে এমন ভাবে সে বিষয়টি বদ্ধমূল করিয়া দেন যে, শ্রোতা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, ডাঃ বসু তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বসু পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সাক্ষ্যপ্রদান করেন। সেই কমিশনে তিনি নির্ভীকভাবে সাক্ষ্যপ্রদানকালে বলেন—Regarding the question of limitations than exist in employment of Indians in the higher Service, I should like to give expression to an injustice which is very keenly felt. It is unfortunate that Indian graduates of European universities who have distinguished themselves in a remarkable manner do not for one reason or other find facilities for entering the higher educational Service.

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে রুদ্রদেব তর্কবাগীশ নামে এক অসাধারণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার ঔরসে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত। রুদ্রদেবের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানাদি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি গ্রামবাসিগণের অনুরোধে পুনরায় বিবাহ করেন এবং সেই পত্নীর গর্ভে জগন্নাথের জন্ম হয়। বিবাহের পর রুদ্রদেব কাশীধামে গিয়া পুত্রলাভের আশায় কঠোর সাধনা ও বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এদিকে জগন্নাথের মাতামহীও পুরুষোত্তমে গিয়া জগন্নাথদেবের নিকট পুরশ্চরণাদি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন তিনি শীঘ্র দৌহিত্রমুখ দর্শন করিতে পারেন। কথিত আছে, জগন্নাথদেবের অনুগ্রহে পুত্রলাভ করেন বলিয়া তাঁহার নাম জগন্নাথ রাখা হয়।

জগন্নাথ শৈশবে এতদূর চঞ্চল ও উদ্ধতপ্রকৃতি ছিলেন যে, প্রতিবাসিগণ তাঁহার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। জগন্নাথ-জননী সুশীলা প্রতিবেশিনীদের নিকট গিয়া দুরন্ত পুত্রের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। ৭।৮ বৎসর বয়স হইলে জগন্নাথ পিতার নিকট ব্যাকরণশাস্ত্র পড়িতে থাকেন, কিন্তু তথাচ দুরন্তপনা কিছুমাত্র কমে না। এই সময়ে জগন্নাথের মাতৃবিয়োগ হয় এবং জগন্নাথ তাঁহার মাসীমাতার স্নেহে ও আদরে প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

রুদ্রদেব তর্কবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার তত্রত্য জমিদারের আগ্রহাতিশয্যে বংশবাটীতে থাকিয়া অধ্যাপনা করিতেন। তিনি জগন্নাথকে নিজের চতুষ্পাঠীতে লইয়া যান। প্রতিদিন প্রত্যূষে জগন্নাথ বংশবাটীতে গমন করিয়া ভবদেবের নিকট অধ্যয়ন করিতেন এবং মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া তথায় সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে ত্রিবেণীতে

পৌঁছিয়া মাসীমাতার আনন্দ বিধান করিতেন। অল্পকাল মধ্যে জগন্নাথ সাহিত্য ও অলঙ্কারের পাঠ শেষ করিলেন। জগন্নাথের এরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল যে, তিনি একবার যাহা শুনিতেন, তাহা কখনও ভুলিতেন না।

একদিন জগন্নাথ ত্রিবেণী হইতে বংশবাটী যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পান যে, রাস্তার ধারে পঞ্চাননদেবের সম্মুখে বহু ছাগবলি হইতেছে। তাহা দেখিয়া জগন্নাথ পুরোহিতদের নিকট একটি ছাগমুণ্ড প্রার্থনা করেন। তাহারা জগন্নাথকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেয়। জগন্নাথ কোনও কথা না বলিয়া বংশবাটী চলিয়া যান। ফিরিবার সময় সন্ধ্যাকালে যখন পুরোহিতেরা যে যাহার বাটীতে গিয়াছিল, তখন জগন্নাথ একটি ঝুড়িতে করিয়া পঞ্চাননদেবের চন্দ্রমালা, মাটীর ঘট ও সমস্ত বিগ্রহাদি লইয়া নিজের বাটীর সন্নিহিত পুকুরে সে সমস্ত নিক্ষেপ করেন। পরদিন প্রাতে দেবলেরা মন্দিরে আসিয়া পঞ্চানন-ঠাকুর দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অন্নসংস্থানের পথ বন্ধ হইল বলিয়া "হায়" "হায়" করিতে লাগিল। তখন জগন্নাথের কথা দেবলগণের মনে পড়িল, তাহারা ভবদেবের নিকট গিয়া দেববিগ্রহ চুরির কথা নিবেদন করিল। ভবদেব জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, "যদি উহারা মাসে মাসে আমাকে একটি করিয়া ছাগ দেয়, তবে ঠাকুর ফিরিয়া দিতে পারি।" পাণ্ডারা সে প্রস্তাবে রাজী হইল, তখন জগন্নাথও ঠাকুর দেখাইয়া দিলেন। পাণ্ডারা শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া মহা ধুমধামে ঠাকুর লইয়া গেল। তদবধি পঞ্চানন-মন্দির হইতে প্রতি মাসে একটি করিয়া বলি-দেওয়া পাঁঠা জগন্নাথের বাটীতে উপস্থিত হইত।

জগন্নাথের পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দ্রৌপদী নাম্নী একটি সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার পরলোক গমন করিলে কামাপুর-নিবাসী রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতির চতু-

পাঠীতে জগন্নাথ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে জগন্নাথের বিদ্যাবত্তার খ্যাতিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। তিনি অধ্যাপকের নিকট ন্যায়দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতেন। এমন কি পার্সী ভাষার পুস্তকও তিনি শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জগন্নাথের গায়ের রং নিখুঁত গৌরবর্ণ না হইলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল এবং তাহাতেই তাঁহাকে অতিসুন্দর দেখাইত। তাঁহার আয়ত কলেবর, লোমশ দেহ, দীর্ঘ বাহু, বৃহৎ মস্তক, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিত। জগন্নাথের বয়স যখন চতুর্ব্বিংশতি বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা রুদ্রদেব স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি কিছু তৈজসপত্র, সামান্য পরিমাণ অর্থ ও বার্ষিক ৫০৲ টাকা উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমি ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা কিছু তৈজসপত্র ছিল, তৎসমস্ত ব্যয় করিয়া জগন্নাথ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। ফলে এরূপ দাঁড়াইল যে, তাঁহাকে কলার পাতে করিয়া খাইতে হইত। এইরূপ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িয়াও তিনি সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "তর্কপঞ্চানন" উপাধি লাভ করেন এবং পিতার চতুষ্পাঠীতে বসিয়া নানা ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতে থাকেন। একদিন তাঁহার কুলগুরু চাতরাব ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া দেখেন যে, জগন্নাথের শৌচত্যাগ করিবার একটি গাড়ু পর্য্যন্ত নাই। ইহা দেখিয়া তিনি চানকের চৌধুরীদের বাটীতে এক কর্ম্মোপলক্ষে জগন্নাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি গাড়ু বিদায় দেওয়াইয়াছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অধ্যাপক-হিসাবে ইহাই প্রথম উপার্জ্জন। ক্রমশঃ তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল, তিনি নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ ন্যায়, স্মৃতি,

পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িত। অনেক লোকে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্রের আহ্বানে রাজদরবারে যাইয়া তিনি শাস্ত্রালাপে অনেক পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া মহারাজের প্রীতিঅর্জ্জন করেন। জগন্নাথের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার জন্য মহারাজ জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ত্রিবেণী হইতে বর্দ্ধমান আসিবার কালে পথে কি কি দেখিয়াছেন বলুন ত।" জগন্নাথ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া এবং জগন্নাথের অসাধারণ স্মরণশক্তিদর্শনে বিস্মিত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহাকে পাণ্ডুয়া পরগণার হেতুয়াপোতা নামক একখানি গ্রাম তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে নিষ্কর ভোগদখল করিবার অধিকার দেন। তৎসঙ্গে রাজা তাঁহাকে একটি পুষ্করিণীও প্রদান করিয়াছিলেন। পরে মহারাজা শুনিতে পাইলেন, তর্কপঞ্চাননকে তিনি যে পুষ্করিণী দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ জলে স্থলে তিনশত বিঘা। জগন্নাথ কিছুদিন পরে বর্দ্ধমানে আসিলে রাজা বলিলেন, "আপনাকে যে পুষ্করিণীটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা "পুষ্করিণীটি" নহে, তাহা "পুষ্করিণীটা।" জগন্নাথ তাহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আপনিও ত রাজাটি নহেন, রাজাটা"। বলা বাহুল্য, রাজা এই মন্তব্যে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি পুষ্করিণী সম্বন্ধে আর কোন দিন কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায় রাঁয়া রাজা একবার তর্কপঞ্চাননের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহাকে আপন দরবারে আমন্ত্রণ করেন। তর্কপঞ্চাননের যুক্তি-তর্ক ও শাস্ত্রজ্ঞান-দর্শনে মোহিত হইয়া তিনি তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে "২২ শিরোপা" পুরস্কার প্রদান করেন। সে সময়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চতম সম্মান রাজদরবারে অন্য কিছু ছিল না। শুধু ইহাই নহে, তর্কপঞ্চানন ইচ্ছামত দালান-কোঠা-নির্ম্মাণ, পাল্কী আরোহণ করিবার এবং নিজ বাটীতে "নহবৎ" বসাইবার অনুমতি

লাভ করিলেন। তিনি বাটীতে ফিরিয়া একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।

এক সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুপ্তপল্লীর বিখ্যাত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে বলেন, "এক সপ্তাহের মধ্যে একটি নূতন কবিতা রচনা করিয়া দিতে পারিলে একশত রৌপ্য মুদ্রা ও একশত বিঘা জমি পুরস্কার দিব।" বাণেশ্বর তদনুসারে একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দিলেন; কিন্তু রাজা সেই কবিতার ভাব নূতন ও মৌলিক কি না তাহা জানিবার জন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে দেখাইলেন। জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ সাধু তুলসীদাসের নিম্নলিখিত দোঁহাটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন মহারাজ কবিতাটির ভাব তুলসীদাসের দোঁহার অনুরূপ। ব্যাস, বাল্মিকী ও কালিদাস—ইঁহারাই যাহা কিছু নূতন ও মৌলিক রচনা করিয়া গিয়াছেন। আর কে মৌলিক কবিতা রচনা করিবে? এই বলিয়া তিনি তুলসী দাসের দোঁহাটি আবৃত্তি করিলেন—

"জগমে তোম যব আয়া, সব হাসা, তোম রোয়।
এয়সা কাম করো পিছে হাসি ন হোয়॥"

রাজা ইহাতে জগন্নাথের প্রতি বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি জগন্নাথের সাহায্যকল্পে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়?" জগন্নাথ বলিলেন, "বর্দ্ধমানাধিপতির ও শূদ্রমণির জমিদারগণের অনুগ্রহে তাঁহার সংসারযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয়।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যতই বদান্যবর, বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী থাকুন না কেন, তিনি বর্দ্ধমানাধিপতির নাম শুনিতে পারিতেন না। বর্দ্ধমানের রাজার নাম শুনিয়া কি ভাবে তিনি জগন্নাথকে সমাজে অপদস্থ করিবেন, সেই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। বাহিরে জগন্নাথের সহিত হাসিমুখে দুই চারিটা কথাবার্ত্তা বলিলেও কি করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, ইহা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি তখন অসীমপ্রতাপ-

সম্পন্ন রাজা, কোন ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত কিংবা সমাজচ্যুত করিবার অধিকার কেবল তাঁহারই ছিল। এই ভাবে তিনি অনেকের জাতিপাত করিয়াও অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। সেই সময়ে ত্রিবেণীর নিকট বিশপাড়া গ্রামে এক নির্ধন ব্রাহ্মণ কোন এক অপবাদের জন্য সমাজচ্যুত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট টাকা পাইলেন না বলিয়া তাঁহার প্রার্থনাতে কর্ণপাতও করিলেন না। এই ঘটনা জগন্নাথের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া বলিলেন, কোনও অপবাদে সমাজচ্যুত হইলে পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে অপবাদের প্রতীকার হয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনি যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তাহা হইলে আপনার সমূহ বিপদ হইবে। কিন্তু জগন্নাথ সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। তর্কপঞ্চানন মহাশয় নিজে ব্যবস্থা দিয়া সেই ব্রাহ্মণকে সমাজে উঠাইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই সংবাদে জগন্নাথের প্রতি এতদূর কোপান্বিত হইলেন যে, তিনি কি উপায়ে তাঁহাকে পরাভূত করিবেন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি "রাজপেয় যজ্ঞ" আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ, তৈলিঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশের পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত হইলেন, কেবল হইলেন না—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। জগন্নাথ দেখিলেন, এই মহতী সভায় যদি তিনি উপস্থিত না হন, তাহা হইলে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ মনে করিবেন যে, জগন্নাথ বিচারবিতর্কের ভয়ে সভায় আসেন নাই। জগন্নাথ বিনা নিমন্ত্রণে রাজ-সভাতে উপস্থিত হইলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অগত্যা লজ্জিতভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। জগন্নাথের সহিত বিচারে সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত হইলেন, জয়-জয় নাদে সভাস্থল মুখরিত হইল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে তথায় থাকিয়া আহারাদি করিবার অনুরোধ

করিলেন, কিন্তু জগন্নাথ তাহা না করিয়া স্থানান্তরে থাকিয়া নিজব্যয়ে আহারাদি করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জগন্নাথ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে গিয়া রাজা নন্দকুমারের নিকট রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-কৃত অপমানের কথা বলিলেন। রায় রাঁয়া সেই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া একদিনের মধ্যে বাকী রাজস্বের হিসাব-নিকাশ দেখাইবার জন্য কানুনগোর প্রতি আদেশ করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব-সমীপে উপস্থিত হইলেন। নবাব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া আদেশ করিলেন যে, নদীয়ার জমিদার বড় দুষ্ট লোক, খাজানা দেয় না, উহাকে কারাগারে নিক্ষেপ কর, এক সপ্তাহ মধ্যে সমুদয় রাজস্ব উপস্থিত না করিলে "সুন্নৎ" অর্থাৎ ত্বক্‌চ্ছেদ করিয়া "কলমা" পড়াইয়া উহাকে মুসলমান করিয়া লওয়া হইবে। রাজাকে তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করা হইল, রাজা মহাচিন্তায় পতিত হইলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও রাজা বার লক্ষ টাকা ঋণ করিতে পারিলেন না। সাতদিন পূর্ণ হইবার একদিন পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্র গলদেশে সোণার কুঠার বাঁধিয়া কারা-রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে মুর্শিদাবাদে যে বাসায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাসায় উপস্থিত হইলেন। রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া জগন্নাথ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। জগন্নাথের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজা জাতি ভিক্ষা চাহিলেন এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলে জগন্নাথকে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু জগন্নাথ বলিলেন, "টাকার প্রলোভন আমি করি না। আপনার যদি কোন উপকার করিতে পারি, আমি সেই চেষ্টাই করিব। কাল আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথায় বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া কারাগারে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে জগন্নাথ নন্দকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আর শাস্তি দিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে।" নন্দকুমার নবাবকে

গিয়া বলিলেন, "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজস্ব পরিশোধের জন্য এক বৎসরের সময় দিয়া মুক্তি দেওয়া হউক।" নন্দকুমারের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলি নবাব পরদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ঐ সর্ত্তে মুক্তি দিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাঁহার মুক্তির মূলে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের চেষ্টা নিহিত। তদবধি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চাননের আর কোনরূপ অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই। আজও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরগণ ফুলিয়া গ্রামে পণ্ডিত জগন্নাথের বংশধরগণের শিষ্যস্বরূপ বাস করিতেছেন।

এই ভাবে সুখ, সমৃদ্ধি, মান, প্রতিপত্তির মধ্যে পণ্ডিত জগন্নাথের জীবনের ৬২ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। তিনি এই সময়ে দারুণ শোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পতিগতপ্রাণা, সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণী এই সময়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। দ্রৌপদীর শোকে জগন্নাথ বিশেষ দুঃখিত হইলেও যথারীতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহাকে বলিলেন যে, আপনার বয়স ৬২ বৎসর হইলেও শরীর পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবার ন্যায়, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার জন্য একটি মেয়ে দেখি। তর্কপঞ্চানন তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া এরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে জগন্নাথের ভগবদুপাসনা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল। তপ, জপ, সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজার্চ্চনা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইল। তিনি একদিকে যেমন সন্ধ্যা-বন্দনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিতে লাগিলেন, তদ্রূপ কীর্ত্তন শুনিতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। এমন কি নিজের গ্রাম হইতে অন্য গ্রামেও তিনি কীর্ত্তন শুনিবার জন্য যাইতেন। কখনও কখনও তিনি ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া গান শুনিতে যাইতেন এবং তাঁহার এরূপ স্মরণশক্তি ছিল যে,উভয় দলে কি কি গান হইয়াছে, সেগুলি তিনি

অবিকল বলিতে পারিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার অত্যদ্ভুত স্মরণশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইত।

এই সময়ে বঙ্গের মসনদ হইতে মুসলমান রাজা অপসৃত হইলেন। এদেশীয় কতকগুলি লোকের আহ্বানে বঙ্গদেশে ইংরাজজাতি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এক একটি বৃহৎ জেলায় ইংরাজরাজ এক একজন সিবিলিয়ান নিয়োগ করিলেন, সেই সিবিলিয়ান একাই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিতেন। পণ্ডিত ও কাজী দ্বারা বিচার-কার্য্য এবং সেরেস্তাদার ও পেস্কারের দ্বারা তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সাধারণ কার্য্য সম্পাদিত হইত। ইংরাজরাজ প্রতিশ্রুতি দিলেন, এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানদের বিচারকার্য্য এদেশীয় ব্যবস্থার দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। তদনুসারে হিন্দুব্যবস্থাশাস্ত্রের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য লোক আর তখন কোথায় পাওয়া যাইবে? জগন্নাথ সরকারী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া সরকারী বৃত্তি লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে অস্বীকার করিলেন। শেষে ইহাই স্থির হইল যে, তিনি আপন বাটীতে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিবেন এবং সরকার তাঁহাকে আজীবন মাসিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন। যথাসময়ে তিনি চারিখণ্ডে "বিবাদভঙ্গার্ণব-সেতু" নামক পুস্তক রচনা করিলেন। ক্রমে ক্লাইব, হেষ্টিংস্, হার্ডিঞ্জ, হ্যারিণ্টন প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের এবং কোলব্রুক, জোনস্ প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ মনীষিগণের সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, তাঁহারা জগন্নাথের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

জগন্নাথের এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যে, একদিন স্যর উইলিয়ম্ জোনস্ জগন্নাথের বাটীতে গিয়া বলিলেন, "হিন্দুগণের সকল

নামের একটা অর্থ আছে, কিন্তু "কানাই' কথার কোন অর্থ নাই।" জগন্নাথ তাহা শুনিয়া অমনি বলিলেন, "কেন থাকিবে না? কানাই কথাটি হিন্দী "কাঁহা নাই" শব্দের অপভ্রংশ অর্থাৎ ভগবান কোথায় নাই?—ইহাই কানাই শব্দে প্রতীতি জন্মাইতেছে।"

জগন্নাথের কৃপণ অপবাদ ছিল, কিন্তু তিনি বাস্তবিক ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। তিনি মহা সমারোহে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি করিতেন, তাঁহার বাটীতে সদাব্রত ছিল, তাঁহার বাটী হইতে অতিথি কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। তিনি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঢাকাই মলমল ব্যবহার করিতেন এবং গজদন্ত-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে উত্তম দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতেন। তিনি একাহারী হইলেও একবেলা যাহা খাইতেন তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। তাঁহার দশটি পৌত্রবধূর সকলকে মধ্যে মধ্যে রন্ধন করিতে হইত। তাহার পরিবারে তিন শত লোক আহার করিত। তিনি প্রতিদিন পঞ্চাশটি সুস্বাদু ব্যঞ্জন-সহযোগে আহার করিতেন। তিনি প্রতিদিন আহারান্তে যেদিন যে নাতি-বৌ রন্ধন করিতেন রন্ধন ভাল হইলে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন ও পুরস্কার দিতেন, আর রন্ধন ভাল না হইলে এমন ভাবে বিদ্রূপ করিতেন যে, নাতি-বৌ লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারিতেন না। তাঁহার নাতি-বৌগণ রন্ধন যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য যেদিন রন্ধনের পালা পড়িত, সেদিন পুরোহিতের দ্বারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইতেন ও রন্ধন ভাল হইলে পরে সুবচনীর পূজা করিতেন। সেই সময়ে শ্যাম মল্লিক নামে এক ডাকাত ছিল, সে একদা দলবলসহ জগন্নাথের বাটীতে ডাকাতি করিতে যায়। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে ডাকাতেরা পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিলেও কোন প্রকারে তাঁহার সন্ধান পায় না। তাঁহার এতদূর বুদ্ধি-চাতুর্য্য ছিল যে, তিনি ডাকাতগণের সম্মুখে অক্ষতশরীরে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ডাকাতেরা কোন পুর-

মহিলার উপর অত্যাচার করে নাই, কিংবা তর্কপঞ্চাননের অবর্ত্তমানে তাঁহার সিন্দুক ইত্যাদিতে পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করে নাই। গবর্ণমেণ্ট তদবধি তর্কপঞ্চাননের সম্পত্তি-রক্ষার জন্য বার জন শান্তিরক্ষক ও একজন জমাদার নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

জগন্নাথের অদ্ভুত মেধাশক্তি সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। জনশ্রুতিটি এই, একদা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশীয় দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নৌকাযোগে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হন; কোন কারণে উভয়ে নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় প্রথমে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া পরে পরস্পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করেন। সুপ্রিম কোর্টে উভয়ে উভয়ের নামে অভিযোগ করেন। বিচারক সাক্ষী তলব করিলে সাহেবদ্বয় বলেন, "ঘটনাস্থলে আর ত কোন ব্যক্তি ছিলেন না, কেবল ছিলেন একজন প্রাচীন হিন্দু, তিনি তখন স্নান করিতেছিলেন।" স্নানরত ব্যক্তির আকার-প্রকারের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিচারক স্থির করিলেন, এই ব্যক্তি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভিন্ন আর কেহ নহে। তিনি জগন্নাথকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই দুই ব্যক্তিকে চিনিতে পারেন কি?" জগন্নাথ বলিলেন, "হাঁ চিনিতে পারি, তবে ইঁহারা পরস্পরে যে কথাবর্ত্তা বলিয়া শেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দোষের কি গুণের সে বিচার করিতে পারি না। কেবল অবিকল উভয়ের কথা যথাযথ বলিয়া যাইতে পারি।" বিচারকের আদেশে জগন্নাথ তাহাই করিলেন, উভয়ে যে যেরূপ ভাষায়, যেরূপ ভাবে ঝগড়া করিয়াছিলেন জগন্নাথ অবিকল তাহা বিবৃত করিলেন দেখিয়া সকল লোকে অবাক্‌ হইল—অভিযোক্তাদ্বয়ও পরস্পরের দোষগুণ স্মরণ হওয়াতে লজ্জিত হইয়া পরস্পরের করমর্দ্দন করিয়া পরস্পরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন এবং বিচারক মামলাটি আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

জগন্নাথের নিকট অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনি ছাত্রদিগকে

অতি কৌশলে তিরস্কার করিতেন। একদিন তাঁহার কোন ছাত্র পরিহাসচ্ছলে অতি ইতর ভাষায় অন্য এক সহাধ্যায়ীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। সেই কথা জগন্নাথের কর্ণগোচর হয়। তিনি ছাত্রদিগকে একটু সুশিক্ষা দিবার জন্য পরদিন তাহাদিগকে লইয়া স্নান করিতে গেলেন। পথে একটি কুকুর শয়ন করিয়া ছিল, তর্কপঞ্চানন মহাশয় সেই কুকুরটিকে বলিলেন, "মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক গাত্রোত্থানপুরঃসর আমাকে পথপ্রদান করুন।" কুকুরটি ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। অনন্তর স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া ছাত্রগণকে পড়াইতে বসিলে সেই ছাত্রটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আজ কুকুরের প্রতি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলেন কেন? কুকুর যে ইতর জাব।" উত্তরে তর্কপঞ্চানন বলিলেন, "দেখ জিহ্বা জিনিষটা বড় অভ্যাসের দাস, কি জানি যদি কুকুরকে "তুই-তোকারি" করিতে করিতে কোনদিন মানুষকেও "তুই-তোকারি" করিয়া ফেলি।" বলা বাহুল্য, ছাত্রগণ তাঁহার এই প্রকার ব্যঙ্গোক্তির অর্থ বুঝিতে পারিয়া তদবধি আর কখনও ইতর ভাষায় কথাবার্ত্তা অথবা হাস্য-পরিহাস করিত না।

জগন্নাথ ৪৫টি প্রপৌত্র ও কয়েকটি বৃদ্ধ প্রপৌত্র লইয়া শেষ জীবন মহানন্দে সংসারে কাটাইয়াছিলেন।

যৌবনে জগন্নাথ কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল "রামচরিত" নাটকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ও দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি অতিশয় প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাঁহারা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। রাজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তর্কপঞ্চানন তাঁহার দরবারের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও রাজার প্রস্তাবিত লক্ষ টাকা লইয়াও "মহাভারত পাঠ" করিতেন না। বৃদ্ধ অবস্থাতেও জগন্নাথের

অসাধারণ ভোজনশক্তি ছিল। একদা কালীঘাটে গিয়া তিনি এক শিষ্যের বাটীতে উপস্থিত হন। শিষ্যগণ প্রসাদ পাইবার আশায় একটি ছাগ আনিয়া মাংস রাঁধিতে দেয়। তর্কপঞ্চানন ভ্রমক্রমে মাংসে লবণের পরিমাণ বেশী দিয়া বসেন এবং খাইবার সময় দেখেন যে, মাংসে লবণ বেশী হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, এই মাংস শিষ্যগণকে দিলে নিশ্চয়ই তাহারা মনে করিবে যে, গুরুদেব রন্ধন করিতে পারেন না। এই ভাবিয়া তিনি সেই একটা পাঁঠার মাংস সমস্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর ১২১৪ সালের আশ্বিন মাসে ১১৩ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিজয়া দশমীর দিন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রতিমার সহিত পদব্রজে গঙ্গাতীরে যান এবং বলেন তিনি আর ঘরে ফিরিবেন না, গঙ্গাতীরেই দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিবেন। পরিজনবর্গ তাড়াতাড়ি বাঁশ খুঁটি দিয়া তাঁহার বাসের জন্য একখানি ছোট খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিল, জগন্নাথ সেই ঘরে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পৌত্রকে তিনি দশ সহস্র টাকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন, নিজ শ্রাদ্ধ ও দৌহিত্রদের জন্য ছত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়া এবং চারি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ও বহুতর উদ্যান ও পুষ্করিণী দুর্গোৎসবের জন্য উইল করিয়া দিয়া ঠিক বারদিনের দিন সজ্ঞানে তিনি গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার বংশধগণের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন, রাধাবল্লভ তর্করত্ন, কমলাকান্ত ন্যায়বাচস্পতি, রামদাস তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আজ আর সে বাণিজ্যপোতবহুল ত্রিবেণীও নাই, আর ত্রিবেণীর গৌরবরত্ন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননও নাই!

পাহাড়ী বাবা

সুপ্রসিদ্ধ সাধক পাহাড়ী বাবা জৌনপুর জেলার অন্তঃপাতী প্রেমাপুর গ্রামে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী নামক এক বৈষ্ণবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। যতদিন তিনি সংসারে ছিলেন. ততদিন তাঁহার নাম ছিল হরভজন। হরভজন বাল্যকালে সংস্কৃত সাহিত্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হরভজন তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন এবং শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, চিদাম্বরম্ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গির্ণার পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হন। তথায় এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে। সেই মহাপুরুষের নিকট তিনি দীক্ষা লাভ করিয়া "আমিত্ব" একেবারে বিস্মৃত হন এবং সকলের তিনি দাসানুদাস এই ভাবে সকলকে সেবা করিতে থাকেন। তিনি অহোরাত্র কেবল সন্ধ্যা, বন্দনা, পূজা, আহ্নিক লইয়া থাকিতেন। তাঁহার পিতৃব্য সাধক ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হরভজন সেই আশ্রমে একটি গুহা নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই দিনরাত নিবিষ্টচিত্তে যোগ তপ প্রভৃতি করিতেন। গুহামধ্যে অবস্থানকালে কিছুই আহার করিতেন না, কেবল বায়ু গ্রহণ করিতেন। এই কারণে লোকে তাঁহার পাহাড়ের মত ক্ষুধা-দমনের শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে "পাহাড়া বাবা" বলিয়া অভিহিত করিত। পাহাড়ী বাবা কখনও জটাজুট রাখিতেন না, কিংবা সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিমণ্ডিতও করিতেন না। তিনি একটি মাত্র কৌপীন ও তাহার উপর একটি মাত্র আলখাল্লা পরিতেন। শুধু বায়ু ভক্ষণ করিয়া তিনি গুহামধ্যে এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেন। ফলে সূর্য্যালোক

তাঁহার অঙ্গে না লাগায় তাঁহার গায়ের রং এরূপ সাদা ধব্‌ধবে হইয়াছিল যে, তাহা জুঁই ফুলের ন্যায় হইয়াছিল। এক বৎসর পরে একটি দিন মাত্র তিনি গহ্বর হইতে উঠিয়া রথ দর্শন করিতেন, শেষে তাহাও তিনি বন্ধ করিয়া দেন এবং রথের দিন একবারমাত্র গহ্বর হইতে উঁকি মারিয়া রথারূঢ় বামনদেবকে দর্শন করিতেন। একবার প্রয়াগের কুম্ভমেলায় আসিলে তাঁহার গায়ের চর্ম্ম, প্রখর স্র্য্যোলোকস্পর্শে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। প্রয়াগে অবস্থানকালে তিনি একটু একটু দুগ্ধ ও জল ভিন্ন অন্য কিছুই খাইতেন না। প্রয়াগ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রেমাপুরে আপন গহ্বরে প্রবেশ করেন।

পাহাড়ী বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার ধর্ম্মভাবদর্শনে পুলকিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যে সমস্ত ধর্ম্মপিপাসু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য তাঁহার গহ্বরে আসিত, পরম যত্নসহকারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম তাহাদের সৎকার ও সেবা করিতেন। অনেক জমিদার, জায়গীরদার ও কৃষক তাঁহাকে যে যব ও শস্যাদি উপহার দিতেন তাহা দ্বারা এবং তাঁহার শিষ্যগণ চড়ার উপর ধান্য-যবাদির যে বীজ বপন করিতেন তাহা হইতে যে ধান্য-যবাদি উৎপন্ন হইত তাহা দ্বারা সমাগত ভক্তগণের আহারের ব্যবস্থা করা হইত।

পাহাড়ী বাবা যে কত বড় মহৎ ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। একদিন এক উন্মাদ তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হয়। তখন তাঁহার শিষ্যবর্গ সেই উন্মাদকে আক্রমণ করে কিন্তু পাহাড়ী বাবা আসিয়া তাড়াতাড়ি শিষ্যবর্গকে নিষেধ করিয়া বলেন যে, এই ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত নহেন, অতি মহাপুরুষ, ইহাকে কিছুই বলিও না।

আর একবার এক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া পাহাড়ী বাবাকে বলে, 'দেখ তুমি যোগী, ভক্ত, তোমার আশ্রমের এই বিগ্রহের অঙ্গে অনেক স্বর্ণালঙ্কার আছে, এগুলি ও আশ্রমটি তুমি আমাকে দান কর না

কেন ?” পাহাড়ী বাবা সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রমের চাবি-কাঠি সেই সন্ন্যাসীকে দিয়া নিজে কোথায় যে অদৃশ্য হইলেন, অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার আর খোঁজ-খবর মিলিল না। কিছুকাল পরে জানা গেল যে, তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর নামক স্থানে গঙ্গাতীরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন।

১৩০৫ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ পাহাড়ী বাবা উক্ত আশ্রমের মধ্যে প্রকাণ্ড হোমানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তৎসম্মুখে উপবিষ্ট হন। আশ্রমের দ্বার রুদ্ধ, শিষ্যগণ দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতেছে, ক্রমে হোমানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, শিষ্যগণ কুটীর-রন্ধ্র দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল যে, পাহাড়ী বাবা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন। শিষ্যগণ তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত ও চকিত হইলেন। কিন্তু কুটীরের দ্বার ত খুলিবার উপায় নাই। তাই তাঁহারা উৎকণ্ঠিতভাবে আশ্রমদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে হোমানল দ্বিগুণভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই হোমানলের মধ্যে পাহাড়ী বাবা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, একটু হা-হুতাশ, একটু কাতরতা প্রকাশ করিলেন না। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের নশ্বর দেহ সেই হোমানলের শিখার মধ্যে ভস্মীভূত হইল, রহিল মাত্র দেহাবশিষ্ট ভস্ম। আর রহিল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বদরীনারায়ণ, ভাগবতাচারী, জনার্দ্দন, ভৃগুনাথ প্রভৃতি শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার যোগবিভূতি। আজিও সাধকগণের মধ্যে পাহাড়ী বাবার স্থান অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখনও সহস্র সহস্র লোক তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে।

কবীর

কবীরের জন্মবৃত্তান্ত লইয়া অনেক লেখকের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কথিত আছে, তিনি এক ব্রাহ্মণ বালবিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একদা রামানন্দের নিকট মথুরা নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বিধবা কন্যা সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হন। রামানন্দ কন্যাটির হাত কিংবা মুখের দিকে না চাহিয়াই তাহাকে "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। মুক্তপুরুষের কথা কি কখনও ব্যর্থ হয়? তিনি যে বাক্‌সিদ্ধ! এই বালবিধবাটি কয়েকদিন পরে গর্ভবতী হয় এবং যথাসময়ে তাহার গর্ভ হইতে একটি সন্তান প্রসূত হয়। ব্রাহ্মণের বিধবা কুমারী, তাহার পক্ষে সন্তান হওয়া অত্যন্ত দোষের, লোকে জানিতে পারিলে তাহার জাতি যাইবে, মান-মর্য্যাদা সকলই যাইবে। তাই সেই কুমারী লোক-লজ্জার ভয়ে সদ্যোজাত শিশুসন্তানটিকে লইয়া লতায় পাতায় জড়াইয়া এক জঙ্গলের ধারে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। এদিকে লতাপাতার মধ্যে সেই সদ্যোজাত শিশু যখন ক্রন্দন করিতেছিল, তখন নুরী নামে এক জোলা সস্ত্রীক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহারা শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া লতাপাতা খুলিয়া দেখে, একটি শিশু ক্রন্দন করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা দয়াপরবশ হইয়া শিশুটীকে আপন বাটীতে লইয়া গেল। নিঃসহায় শিশুর জন্য ত'হারা প্রাণে বড় ব্যথা পাইল এবং যে পাপীয়সী, রাক্ষসী নারী এই শিশুটিকে এইভাবে রাস্তার ধারে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার উদ্দেশে শত শত বার ধিক্কার দিতে লাগিল। বাস্তবিক মানুষ হইয়া যে পিশাচের মত এরূপ নৃশংস কাণ্ড করিতে পারে, জোলা-দম্পতী

তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর লোক হইলেও ইহা তাহাদের ধারণারও অতীত ছিল। তাহারা শিশুটীর নাম রাখিল কবীর।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী। কবীর এই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জোলার ঘরে লালিত পালিত বলিয়া বাল্যকালে বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তিনি বস্ত্র বয়ন করিয়া সেই বাল্যকালেই বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার পালক পিতা-মাতা তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল; সুতরাং কবীরের বিবাহ কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই করুন আর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধই হউন, কবীরের মন সংসার-বিষয়ে উদাসীন রহিল। তিনি এখন দীক্ষা-গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে দীক্ষা দিবে? রামানন্দ তখনকার দিনের আদর্শ সন্ন্যাসী। তিনি রামানন্দের নিকট দীক্ষা লইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু ভাবিলেন রামানন্দ কি তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন? তিনি যে ব্রাহ্মণ কিংবা উচ্চ শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কাহাকেও দীক্ষা দান করেন না। কবীর ভাবিলেন, তিনি একটা কৌশল করিয়া রামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। রামানন্দ প্রতিদিন প্রত্যূষে কাশীধামের মণিকর্ণিকা ঘাটে গঙ্গা স্নান করিতেন, তখন রাত্রির ঘোর থাকিত। রামানন্দ সোপান বাহিয়া নামিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পায়ে কি একটা ঠেকিল। তিনি জানিতেন না যে, কবীর তাঁহার চরণ-স্পর্শ-লাভের জন্য সোপানের উপর মৃতবৎ পড়িয়া আছে। কাজেই তিনি কুকুর মনে করিয়া কহিলেন, "রাম কহ।" কবীরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কবীর ভাবিলেন, এই ত গুরু আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। অতঃপর গৃহে আসিয়া তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া তিলক ধারণ করিলেন এবং রাম নাম গান ও রামনাম ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কবীরের পিতামাতা জাতিতে জোলা, সুতরাং মুসলমান ছিল। তাঁহারা কবীরকে বলিলেন, "তুমি মুসলমান হইয়া হিন্দুর রামনাম লইতেছ কেন?" কবীর বলিল, "গুরু রামানন্দ আমাকে রামনাম শিক্ষা দিয়াছেন।" তখন কবীরের মাতা নিতান্ত কুপিত হইয়া রামানন্দের নিকট গিয়া বলিল, "ঠাকুর! এ তোমার কি ব্যবহার! তুমি আমার ছেলেকে রামনামে দীক্ষা দিলে কেন? কেন তাহার জাতি নষ্ট, ধর্ম্ম নষ্ট করিলে?" তখন রামানন্দ বলিলেন, "সে কি কথা! কে সে কবীর! আমি ত কখনও তাহাকে দেখি নাই, আমি কবীর বলিয়া কাহাকেও কোন দিন দীক্ষা দিই নাই। তবে কেন আমার নামে এই মিথ্যা অনুযোগ করিতেছ?"

"গুরু রামানন্দ স্বামী প্রত্যূষে উঠিয়া।
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে গিয়া॥
অতি ভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে।
ঘাটের নীচেতে গিয়া শুতি রহে তবে॥
গুরু রামানন্দ স্নানে আইলা সেই কালে।
অজ্ঞাতে চরণ তাঁর অঙ্গেতে অর্পিলে॥
তটস্থ হইয়া স্বামী রাম কহ বলে।
প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণমূলে॥
সেই রামানন্দ. মহামন্ত্র যে জানিঞা।
হৃদয় সম্পুটে রাখে গোপন করিয়া॥
গৃহ কর্ম্ম জাতি পাঁতি সকল ছাড়িয়া।
তিলক তুলসীমালা ধারণ করিয়া॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে।
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে॥

আপন ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দু ধর্ম্ম।
কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম্ম॥
তেঁহ কহে গুরু মোর রামানন্দ স্বামী।
দীক্ষা দিল তেঁহ মোরে তাঁর দাস আমি॥"

—শ্রীভক্তমাল।

কবীরের মাতা আসিয়া এই কথা কবীরের নিকট বলিবা মাত্র, কবীর রামানন্দের নিকট গিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন, তখন একে একে রামানন্দের মনে সেইদিনকার সমস্ত কথা উদিত হইল; তিনি ভাবিলেন, যে ব্যক্তি আমার চরণস্পর্শ লাভ করিবার জন্য এত আয়াস স্বীকার করিয়াছে, যে ব্যক্তি আমার মুখে রামনাম শুনিয়া এতাদৃশ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে কখনই অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করা উচিত নহে। এই ভাবিয়া রামানন্দ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কবীরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, "কবীর! আজ হৈতে তুমি আর অস্পৃশ্য নও, তুমি ব্রাহ্মণেরও শ্রেষ্ঠ।"

"স্বামীজির স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত।
কবীরের প্রতি প্রীতি জন্মিল একান্ত॥
আনুসঙ্গ রামনাম মোর মুখে শুনি।
দীক্ষা নিষ্ঠ হৈল মহামন্ত্র করি জানি॥
এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া॥
তুমি মোর যবন নহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ।
যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥"

—শ্রীভক্তমাল।

বাস্তবিক যাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাহার আবার নীচ কুলে জন্মগ্রহণে অপরাধ কি? ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভক্তিরষ্ট বিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছোঽপি বর্ত্ততে।
সবিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যোযথা হরিঃ।

অর্থাৎ যে ম্লেচ্ছে অষ্টবিধা ভক্তি বিদ্যমান, সে ম্লেচ্ছও বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনি ও শ্রীযুক্ত, সে যতি এবং সে পণ্ডিত। যাহা শ্রীহরিকেই দেয় তাহা তাহাকেই দিবে এবং যাহা শ্রীহরির নিকট হইতে গ্রহণীয় তাহা সেই ম্লেচ্ছের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। সেই ম্লেচ্ছও শ্রীহরির ন্যায় বন্দ্য।

যাহা হউক, রামানন্দ কবীরকে শিষ্যত্বে বরণ করিলে কবীর হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গিয়া রামনাম জপ ও সেই সঙ্গে তাঁত বুনিতে লাগিলেন। দুই হাতে কবীর নলী চালান, আর তালে তালে রামনাম বলেন। একদিন একখানি কাপড় বুনিয়া কবীর তাহা হাটে বিক্রয় করিতে গেলেন, সেই কাপড়খানি বিক্রয় করিয়া চাউল-ডাইল কিনিয়া আনিলে তবে সেদিনকার অন্নসংস্থান হইবে। কিন্তু একজন বৈষ্ণব আসিয়া সেই বস্ত্রখানি প্রার্থনা করিবামাত্র কবীর তাহা ছিঁড়িয়া একখণ্ড তাঁহাকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব বলিলেন, সম্পূর্ণ খণ্ড না হইলে কোন মতে তাঁহার কার্য্য হইবে না। তখন কবীর কি করেন? অগত্যা সেই পূর্ণ কাপড়খানি সেই বৈষ্ণবকে দান করিলেন এবং রিক্তহস্তে হাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে কবীর যখন হাটে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবকে কাপড়খানি দান করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু রামচন্দ্র কবীরের বেশ ধারণ করিয়া এক বলদের পৃষ্ঠে নানা খাদ্যসম্ভার আনিয়া কবীরের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার মাতা অকাতরে গরীব-দুঃখীকে খাদ্যসামগ্রী বিলাইতেছেন। তখন কবীরের বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, ইহা সেই ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রেরই কাণ্ড।

কবীর বৈষ্ণবদিগকে ডাকিয়া অকাতরে সেই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের মনে ভয়ানক ঈর্ষার সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণেরা কবীরকে শাসাইয়া বলিল, "তুই যত তিলকধারীদিগকে দান করিতেছিস্, আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা কি কেহ নই? তুই যদি আমাদিগকে দান না করিবি তবে এখনই তোকে প্রহার করিব।" কবীর বিনয়-বচনে ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, "আচ্ছা আমি ঘরে গিয়া দেখি, যদি কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই আপনাদিগকে দিব।" কিন্তু ঘরে গিয়া কবীর দেখিতে পান, তাঁহার গৃহ শূন্য। তখন একখানি শূন্য ঘরে গিয়া কবীর বসিয়া রামনাম জপ করিতে লাগিলেন, কে যেন এবার অন্যরূপে আরও খাদ্যসম্ভার কবীরের গৃহে আনিয়া দিয়া গেল। কবীর অকাতরে ব্রাহ্মণদিগকে তাহা দান করিলেন।

"কবীর আসিয়া মর্ম্ম বুঝিল অন্তরে।
অদৈন্য করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥"

কিন্তু ঈর্য্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ইহাতেও ঈর্ষা ছাড়িল না। ব্রাহ্মণেরা কবীরকে অপদস্থ করিবার জন্য বৈষ্ণবের মত মস্তকমুণ্ডন করিয়া কয়েক-জন গিয়া প্রত্যেক বৈষ্ণবের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া বলিয়া আসিল যে, কবীরের বাড়ীতে পরদিন মহোৎসব, অতএব সেইদিন তোমাদের সকলের কবীরের বাড়ীতে যাওয়া চাই। তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ দলে দলে কবীরের বাড়ীতে পরদিন সমবেত হইল। তখন কবীর প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু ভক্তভয়হারী শ্রীরামচন্দ্র তখন আবার অন্যের অলক্ষিতে এত খাদ্যসম্ভার আনিয়া দিলেন যে, বৈষ্ণবগণ তাহা খাইয়াও শেষ করিতে পারিল না।

এই ঘটনার পর সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া চারিদিকে কবীরের খ্যাতি বিস্তৃত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের ইহা আর সহ্য হইল না। তাঁহারা বাদশাহের নিকট গিয়া কবীরের নামে নানা অভিযোগ করিল এবং

বলিল, "কবীর মুসলমান লইয়া হিন্দুর দেবদেবীর পূজা করে এবং এক বারাঙ্গনার হাত ধরিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় বেড়াইয়া বেড়ায়।" এই কথা শুনিয়া বাদশাহ তৎক্ষণাৎ কবীরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কবীর বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কুর্ণীশ করিলেন না। সভাসদ্‌গণ ইহাতে কবীরের উপর নিতান্ত কুপিত হইলেন। তাঁহারা কবীরকে পুনঃ পুনঃ কুর্ণীশ করিতে বলিলেন; কিন্তু কবীর বলিলেন—

"একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত।
আর যত দেখ সব সকলি অসৎ॥"

অতএব আমি রামচন্দ্র ছাড়া আর কাহাকেও সেলাম করিতে পারিব না।" কবীরের এই কথা শুনিয়া বাদশাহ তৎক্ষণাৎ কবীরের প্রতি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হিরণ্যকশিপুর আদেশে জল্লাদগণ যেমন প্রহ্লাদকে অগ্নিতে ও উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে নিক্ষেপ করিয়া এবং এমন কি কালকূট হলাহল পান করাইয়াও তাঁহার জীবনান্ত করিতে পারে নাই, তদ্রূপ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও বাদশাহের লোকেরা কবীরকে প্রাণে মারিতে পারিল না। সাধু মহাপুরুষের নিকট অগ্নির লেলিহান্ শিখা মস্তক নত করিয়া আপনা হইতেই নির্ব্বাপিত হইল; গরল অমৃতে পরিণত হইল; তরঙ্গ-বিক্ষোভিত নদী তাঁহাকে কুসুম-কোমল শয্যা পাতিয়া গ্রহণ করিল। বাদশাহ সিদ্ধ মহাপুরুষের তপোপ্রভাব-দর্শনে এতাদৃশ মোহিত হইলেন যে,

"রাণীর সহিত রাজা দন্তে তৃণ করি।
গলায়ে কুড়ালি শিরে তৃণ-বোঝা ধরি॥
চলিল রাজন যথা সাধু আছে বসি।
অভিমান লজ্জা ত্যজি সহিত রূপসী॥

যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবীর চরণে ;
পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে ছ'নয়নে ॥
অপরাধ ক্ষম মোরে কর অঙ্গীকার।
না বুঝিয়া অবজ্ঞা করিনু মুঞি ছার ॥”

—শ্রীভক্তমাল।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কবীরের বহু শিষ্য হইয়াছিল। কবীর ক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। তাঁহার দেহত্যাগের সময় নিকট-বর্ত্তী হইল। তাঁহার হিন্দু-মুসলমান শিষ্যগণ সকলে কবীরের চারিপার্শ্বে সমবেত হইল। সিদ্ধ মহাপুরুষ যোগবলে দেহত্যাগ করিবেন বলিয়া একটি চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন। তাঁহার হিন্দু-মুসলমান শিষ্যেরা তাঁহাকে দাহ করা হইবে কি সমাধি দেওয়া হইবে, এই বিষয় লইয়া আপনাদের মধ্যে মহাতর্ক বাধাইল। তার পর একজন শিষ্য সেই চাদর উঠাইয়া দেখে যে, তন্মধ্যে কবীরের মৃতদেহ নাই, তৎপরিবর্ত্তে রহিয়াছে একটি ফুল। সেই ফুলটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া হিন্দু ও মুসলমান লইল। কাশীর রাজা বীরসিংহ কাশীধামে ঐ ফুলের অর্দ্ধাংশের সৎকার করেন, আর মুসলমানেরা গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী মগর নামক গ্রামে তাহা সমাধিস্থ করেন। ঐ সমাধি কবীর-পন্থীদের মহাতীর্থ স্থান।

সাধু লোকনাথ ব্রহ্মচারী

ভগবানাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ও পারিষদবৃন্দের মধ্যে সাধু লোকনাথ ব্রহ্মচারীর স্থান সামান্য উচ্চে নহে। ১১৩১ বঙ্গাব্দে লোকনাথ পশ্চিম বঙ্গের যশোহর জেলার অন্তঃপাতী তালখড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সন্তানগণের কুল-প্রথানুযায়ী অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতেই বিদ্যারম্ভ করেন। তিনি গুরু-গৃহে থাকিয়া ষড়দর্শন অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। গুরু-দেবের সহিত তিনি কলিকাতা কালীঘাটে আগমন করেন। তখন কালীঘাট ঘোর জঙ্গলে আবৃত ছিল। লোকনাথ ও তাঁহার একজন গুরুভাই উভয়ে মিলিয়া কালীঘাটের বনে গভীর তপস্যা করেন। কিন্তু করিলে কি হয়? লোকনাথ সর্ব্বদা চক্ষুর সমক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রণয়িনী এক বিধবার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। তিনি যখন তালখড়িতে থাকিয়া তপস্যা করিতেন, তখন এক বিধবা নানাপ্রকারে তাহার সহিত প্রণয়া-সক্ত হয়। তিনিও সেই বিধবার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি তপস্যা করিতে বসিয়াও সর্ব্বদা সেই রমণীর কমনীয় মূর্ত্তি ভাবিতেন। গুরুদেব দেখিতে পাইলেন, লোকনাথ তপস্যাই করুক, আর ব্রহ্মচর্য্যাই পালন করুক, তাহার শরীর দিন দিন কৃশ হইতে কৃশতর হইতেছে। ইহা দেখিয়া গুরুদেব তাঁহাকে লইয়া পুনরায় তালখড়িতে গেলেন। সেখানে গিয়া গুরুদেব লোকনাথকে এমনভাবে রাখিলেন যে, লোকনাথ সেই প্রণয়িনীর সহিত মিলিবার মিশিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইত। সেই স্ত্রীলোকটির সহিত দৈহিক ভোগাদি করিয়া ইন্দ্রিয়-লিপ্সার প্রতি লোকনাথের যখন বিতৃষ্ণা জন্মিল, তখন তিনি লোক-নাথকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় কালীঘাটে আসিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন কালীঘাটে অবস্থান করিবার পর গুরুদেব লোকনাথ ও তদীয় গুরুভ্রাতা বেণীমাধবকে লইয়া কাশীধামে গেলেন। তথায় মণিকর্ণিকায় একটি আশ্রম রচনা করিয়া গুরুদেব শিষ্যদ্বয়সহ সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হইল। তখন লোকনাথ ও বেণীমাধব মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট থাকিয়া যোগ শিক্ষাপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া নির্জ্জনে সাধন-ভজন আরম্ভ করেন। তথা হইতে দুইজনে বঙ্গদেশে আগমন করেন। লোকনাথ ঢাকা জেলার বারদী নামক স্থানে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তপস্যা করিতে থাকেন। অনেক রোগী রোগারোগ্যের কামনায় তাঁহার নিকট আসিত, তিনি তাহাদের রোগ নিজদেহে লইয়া তাহাদিগকে নিরাময় করিতেন। অতঃপর একটি ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীর রোগ নিজ-দেহে লওয়ায় ১২৯৭ সালে তাঁহার ক্ষয়কাস হয় এবং সেই ব্যাধিতেই লোকনাথ ঐ বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন।

রামদাস স্বামী

মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর গুরু বলিয়া রামদাস স্বামীর নামে দেশ-বিখ্যাত। বস্তুতঃ শিবাজীর ন্যায় ছত্রপতি যে মহাপুরুষের চরণে শির প্রণত করিয়াছিলেন, তিনি যে কত বড় মহাপুরুষ তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস মহারাষ্ট্র দেশের বীড় নামক পরগণার অধীন জম্বু নামক এক গ্রামে সূর্য্যজী পন্থ নামে এক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য্যজী পন্থ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন, এজন্য তিনি শিশুপুত্রের নাম রামদাস রাখেন। অতি বাল্যকাল হইতেই রামদাসের মন-প্রাণ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। অন্যান্য বালকেরা খেলা-ধূলা করিত, রামদাস কিন্তু খেলা-ধূলা না করিয়া সর্ব্বদা ভগবদ্‌বিষয়ে চিন্তা করিতেন। রামদাসের সংসারের প্রতি ইত্যাকার অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য-দর্শনে সূর্য্যজী পন্থ তাহাকে বিবাহিত করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। বিবাহ স্থির হইল, কিন্তু রামদাস বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, আমি কি করিতে বা সংসারে আসিয়াছিলাম, আবার কি করিতেই বা যাইতেছি! কামিনীর মোহপাশে আবদ্ধ হইলে আর কি আমি সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিব? স্ত্রীলোক যে নরকের দ্বার, আর আমি আজ সেই নরকের দ্বারে স্বেচ্ছায় যাইতেছি। এই যে কামিনীর কমনীয় মোহপাশে আমি আবদ্ধ হইতে যাইতেছি, এই কামিনী কি আমাকে সেই ভূমানন্দ দিতে পারিবে? এই কামিনী কি আমাকে মোক্ষের পথ দেখাইতে পারিবে? কখনই নহে। তবে কেন জানিয়া শুনিয়া আমি নরকে প্রবেশ করিব? এই সমস্ত নানা কথা ভাবিয়া রামদাস স্থির করিলেন, এখন পলায়ন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তদনুসারে তিনি বিবাহ-সভা হইতে পলায়ন করিলেন, চারিদিকে খোঁজ

খোঁজ রব পড়িয়া গেল। এদিকে রামদাস নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে এবং শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ পূজা করিতে করিতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে সাকারোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তাহাতে যাঁহারা বিগ্রহ-পূজার বিরোধী তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা করি। সাকারোপাসনা না করিলে কেহ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা করিতে পারে না। তীরন্দাজ যেমন অগ্রে নিকটবর্ত্তী কোন স্থূল বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম বস্তুতেও তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহা বিঁধিতে পারে, তদ্রূপ অগ্রে স্থূলের উপাসনা করিয়া পরে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে চিত্তসংযোগ করিতে হয়। সেইজন্য সাধনার প্রথম অবস্থায় উপাসনার নিতান্ত প্রয়োজন। রামদাস এই সাধনাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া মহাবলেশ্বরে আসিয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন ছত্রপতি শিবাজী রামদাসের মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। রামদাস তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন এবং শিবাজী অতঃপর কি করিবেন—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে রামদাস উত্তর করিলেন, "কেন বৎস! বিদেশী মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার যে চেষ্টা করিতেছ, সেই তোমার পরম ধর্ম্ম; তুমি সেই ধর্ম্ম পালন কর, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে জানিবে।" শিবাজী রামদাসের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মোগলের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দ্বিগুণ তেজে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, যুদ্ধে বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইল। রামদাসের এই উপদেশের সহিত আমরা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কথিত অর্জ্জুনের প্রতি বীর-বাণীর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। দেশরক্ষাই যে পরম ধর্ম্ম এবং ইহা অপেক্ষা যে পরম ধর্ম্ম আর নাই, এই শিক্ষা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পর রামদাস স্বামীই ভারতকে শুনাইয়া গিয়াছেন। রামদাস সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত

আছে। তন্মধ্যে একটী হইতেছে এই—একদা পাণ্ডারপুর তীর্থক্ষেত্রে তিনি যাইয়া দেখেন, সে তীর্থের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। রামদাস রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি "রাম" "রাম" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার আকুল আহ্বানে সেই মূর্ত্তি অচিরাৎ রামমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। দেখিয়া সকল লোকের মনে রামদাসের সাধুত্ব ও মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে আর কোন প্রকার সংশয় থাকিল না। সাধক রামপ্রসাদের সম্বন্ধেও আমরা এইরূপ অনেক কিম্বদন্তী শুনিতে পাই। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখিয়া তাহাকে "কালী" "কালী" বলিয়া ডাকিতেন। বস্তুতঃ সাধনার উচ্চস্তরে উপস্থিত হইয়াছেন যে সমস্ত সাধক, তাঁহারা কৃষ্ণ ও রামে, কালী ও কালায় কোন ভেদ দেখেন না। কথিত আছে, ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রামদাসের জননী স্বর্গারোহণ করিলে রামদাস একদিন পূর্ব্বে তাহা ধ্যানবলে জানিতে পারিয়া মুমূর্ষু মাতার রোগ-শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস লীলা সম্বরণ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর সুদূর আমেরিকা-খণ্ডে যিনি ভগবানাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ব্বভৌম-বাণীপ্রচারকার্য্যে দীর্ঘ পঁচিশ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, যিনি কয়েক বৎসর মাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীকে বেদান্তবাদে উদার ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া তুলিতেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের স্থলাভিষিক্ত সেই মহাপুরুষের জীবনী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্যপাঠ্য।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (বঙ্গাব্দ ১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার) স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতার উত্তর প্রান্তে আহিরীটোলাস্থ নিমু গোস্বামী লেনে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার মাতা ৺কালীপূজা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিলেন কালীপ্রসাদ। বাল্যকাল হইতে কালীপ্রসাদের মন জাগতিক সুখভোগের মোহ অতিক্রম করিয়া মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য—আত্মজ্ঞানলাভের জন্য ধাবিত হইয়াছিল। কৈশোরে তিনি গৌরমোহন আঢ্য-প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় কলিকাতা আলবার্ট হলে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বালক কালীপ্রসাদ সেই বক্তৃতা শুনিয়া যোগ অভ্যাস করিবার জন্য ব্যাকুল হন। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারেন, দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এক অদ্ভুত যোগী তপস্যা করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনা হয়। অবশেষে ১৮৮৩ সালের শেষভাগে একদিন রবিবারে তিনি পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্গে তিনি একটি পয়সাও লন নাই। গঙ্গাস্নান করিয়া কালীপ্রসাদ মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উদ্‌গ্রীবভাবে পরমহংসদেবের আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। রাত্রি ৯টার সময় রামকৃষ্ণদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট কালী আপন অভিপ্রায় জানাইবা মাত্র পরমহংসদেব কালীকে লইয়া উত্তরদিকের বারাণ্ডায় যাইয়া বসিলেন এবং কালীর জিহ্বায় আপন অঙ্গুলি দিয়া মূলমন্ত্র লিখিয়া দিলেন। কালীর বক্ষে হস্ত দান করিবামাত্র কালী যেন নবজীবন লাভ করিলেন। অতঃপর বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া কালী প্রতি সপ্তাহে দুই তিনবার করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন। তৎপর বৈরাগ্যের তীব্রতা আসিয়া কালীর জীবনকে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিল। কালী অতি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং সর্ব্বদা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে পরমহংসদেবের গলায় অসুখের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে পরমহংসদেব শ্যামপুকুরের বাসায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। যেদিন পরমহংসদেব শ্যামপুকুরের বাসায় আসেন, কালীও সেইদিন সংসার ত্যাগ করেন। নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও কালীতে এই সময়ে যে সৌহার্দ্দ্য হয় তাহা নরেন্দ্রের শেষজীবন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরমহংসদেব কালীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং অনেক সদুপদেশ প্রদান করিতেন। এই সময়ে কালী ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ১৮৮৬ সালে ভগবানাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিতে শয়ন করিলে নরেন, রাখাল, কালী প্রভৃতি তাঁহার পূত দেহের অগ্নিসৎকার করেন। তার পর কালী পরিধানে গেরুয়া, কৌপীন ও বহির্ব্বাস এবং হাতে এক কমণ্ডলু লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীমাতা সারদা দেবী, যোগেন, লাটু প্রভৃতিও যান। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কালী বরাহনগর মঠে অবস্থান করিতেন। সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় মাসিক ১১৲ টাকা ভাড়ায়

বরাহনগরে সন্ন্যাসীদের জন্ত একটি মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মঠে পরমহংসদেবের ভক্তেরা তাঁহার প্রতিকৃতি ও কাষ্ঠপাদুকার পূজা করিতেন। অতঃপর একদিন কালী, নরেন প্রভৃতি পরমহংসদেবের শিষ্যমণ্ডলী গুরুদেবের প্রতিকৃতির সমক্ষে হোমাদি করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং আপন আপন রুচি-অনুসারে নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কালী অদ্বৈত বেদান্তমত পোষণ করিতেন ও অভেদ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ জানিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল "অভেদানন্দ"। তিনি মঠে বসিয়া উগ্র তপস্যা করিতেন বলিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে "কালী তপস্বী" বলিয়া ডাকিতেন। আবার কেহ কেহ বা তাঁহাকে "কালা বেদান্তী" বলিতেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কালী নগ্নপদে কমণ্ডলু হস্তে করিয়া কাশী, অযোধ্যা, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। তথা হইতে কেদারনাথে উপস্থিত হইয়া চৌদ্দহাজার ফিট উচ্চে একটি পর্ব্বত-গুহায় কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করিবার পর কালী ধনরাজ গিরির নিকট বেদান্ত শিক্ষা করিতে থাকেন। অতঃপর রক্তা-মাশয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। রোগ হইতে মুক্ত হইয়া কালী তপস্বী পুনরায় তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন। এবার তিনি কাশী, এলাহাবাদ, জুনাগড় দ্বারকা, প্রভাসতীর্থ হইয়া দ্বারকা; তথা হইতে বোম্বাই, পুণা, বরোদা, নাসিক, দণ্ডকারণ্য হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করেন। অতঃপর মাদ্রাজ হইতে তিনি ডেকের আরোহী হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো সহরে বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম্ম-সম্মিলনীতে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া নানা

দিগ্ দেশাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সেই সংবাদ আলমবাজারে পৌছিলে কালী তপস্বী ৺স্বামী বিবেকানন্দকে, ডাঃ ব্যারোজকে এবং আমেরিকাবাসীদিগকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একটি বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। সেই সভার ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিবার জন্য কালী তপস্বী তাঁহার যাবতীয় পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সভায় স্বর্গীয় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় স্বামী বিবেকানন্দ, ডাঃ ব্যারোজ ও আমেরিকাবাসীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। কালী তপস্বী সভার বিবরণ ও অভিনন্দনপত্র দেশে বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন এবং আমেরিকাতেও স্বামী বিবেকানন্দ এবং ডাঃ ব্যারোজের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এইবার অভেদানন্দ পুনরায় তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। ১৮৯৫ সালে তিনি কিছুদিন আলমোড়াতে অবস্থান করেন। ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য কালী বেদান্তীকে আহ্বান করেন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে কালী লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মিলিত হইলেন।

১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দ ইংলণ্ডে যাইয়া লণ্ডন নগরীতে বেদান্তশাস্ত্র "পঞ্চদশী"র শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে বেদান্ত সোসাইটীর যে সমস্ত শ্রেণী খুলিয়াছিলেন, সেইসমস্ত শ্রেণীর ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিজে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বামী অভেদানন্দ এইভাবে লণ্ডনের নানা স্থানে বেদান্তের অভয়বাণী এক বৎসর কাল প্রচার করিয়া আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরে যাইয়া বেদান্ত সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করেন ও সুদীর্ঘ দশবৎসর কাল আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতাসমূহ ঐ সোসাইটী হইতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

হয় এবং শীঘ্রই আমেরিকা, মেক্সিকো ও ইউরোপের নানাস্থানে তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সুযশঃ পরিব্যাপ্ত হয়। এইরূপে দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর কাল তিনি নিউ ইয়র্ক ও ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া ১৯১১ সালের শেষ ভাগে জাপান, চীন, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, কোয়ালা-লামপুর ও রেঙ্গুন সহর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বদেশে আসিয়া তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, শিলং, জামসেদপুর, কাশী, লাহোর, রাওলপিণ্ডি ও শ্রীনগর হইয়া হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বতে উপস্থিত হন। তথায় ছিমিস্ মঠে কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক লামাদিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া পেশোয়ার, জামরোড, লাণ্ডিকোটাল হইয়া কাবুল নদের ধার দিয়া পশ্চিম ভারতের সীমান্ত ভ্রমণ করেন। পরে কলিকাতাবাসী যুবকবৃন্দের অনুরোধে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাত্রদিগকে বেদান্ত পড়াইতে থাকেন। এখনও স্বামিজী এই শিক্ষাদান-ব্রতে নিযুক্ত আছেন। দার্জ্জিলিং সহরে এই বেদান্ত সমিতির একটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কয়েক বৎসর হইল, "বিশ্ববাণী" নামে একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন এবং বাঙ্গালায় আসিয়াও অনেকগুলি ইংরাজী পুস্তক লিখিয়াছেন। স্বামিজী ইংরাজীতে সুপণ্ডিত এবং কর্ম্মযোগী; কলিকাতা হেদুয়ার উত্তরে বিডন ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সোসাইটী তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রতি সপ্তাহে স্বামিজী এখানে যুবকবৃন্দকে রাজযোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সমিতি-সংশ্লিষ্ট একটি পাঠাগার আছে।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। ১৯০২ সাল হইতে ইনি গয়া আদালতে সবিশেষ সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিয়া আসিতেছেন।

ইঁহাদের আদিনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত ভরতপুর থানার অন্তঃপাতী ফতেসিংহ পরগণার এলেকায় জজান গ্রাম। বহুদিন হইতে তাঁহারা পুরুষানুক্রমে ঐ গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর যে সময়ে বঙ্গদেশে বহু স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সময়ে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অংশবিশেষ মহারাজ আদিত্যশূরের শাসনাধীন ছিল। উক্ত মহারাজ আদিত্যশূরের আজ্ঞানুসারে নবম শতাব্দীতে সৌকালীন গোত্রসম্ভূত উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদি পুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ ও ঐ শ্রেণীর কায়স্থগণের আদিপুরুষ আরও চারিজন বঙ্গদেশে আগমন করেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের অন্যতম পুত্র শ্রীকর্ণের বংশধর বলিয়া উক্ত আছেন। এখনও উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ "শ্রীকরণ" নামে পরিচিত। উক্ত জজান গ্রামের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহুসংখ্যক গ্রাম লইয়া একটি সামন্ত রাজ্য গঠিত হয় ও মহারাজ আদিত্যশূর বার্ষিক ১৫ পনর শত টাকা কর-নির্দ্ধারণে ৺সোমেশ্বর ঘোষকে উক্ত সামন্ত রাজ্যের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি সোমেশ্বর ঘোষ মহাশয় নিজ গুরু ও পুরোহিতগণকে লইয়া জজান গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার গুরুদেবের নাম ৺অচ্যুতানন্দ গোস্বামী অথবা চক্রবর্ত্তী, তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি জজান গ্রামে বাস করিতেছেন। ৺সোমেশ্বর ঘোষের

পুরোহিত-বংশও অদ্যাপি জজান গ্রামে বাস করিতেছেন। সোমেশ্বর ঘোষ মহাশয় নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ছিলেন, তাঁহার গুরুদেবও তান্ত্রিক সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। ৺সোমেশ্বর ঘোষ মহাশয় ৺সর্ব্বমঙ্গলা মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং তিনি এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ আছে। ৺সোমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও শ্রীশ্রী৺সোমেশ্বর দেব নামীয় শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সেবার জন্য মহাত্মা ৺সোমেশ্বর তাঁহার নিজ এলাকায় বহু-সংখ্যক গ্রামে ৩৬০ বিঘা জমি দেবোত্তর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখনও ঐ ভূমির আয় হইতে দেব-সেবার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন্দিরের পুরোহিত ও তদীয় বংশাবলীর ভরণ-পোষণের জন্য তিনি রঘুবাটী নামক জমিদারী দান করিয়া গিয়াছিলেন, সে জমিদারী এতদূর বিস্তৃত যে, পুরোহিত মহাশয় ও তদীয় বংশাবলী যে কার্য্যের জন্য বাটীর বাহির হইতে ইচ্ছা করুন না কেন, তাঁহাদিগের অপরের ভূমিতে পদার্পণ করিবার আবশ্যকতা হইত না। ঐ রঘুবাটী জমিদারী আজিও বিদ্যমান আছে এবং পুরোহিত-বংশের কেহ কেহ উহার আংশিক মালিক।

সোমেশ্বরের গুরুদেব সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, তিনি ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন নাই, তাঁহার স্থাপিত বার্ষিক শারদীয় পূজা ও দৈনিক শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীর পূজার জন্য কয়েক প্রকার বৃত্তির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বার্ষিক শারদীয় পূজা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন ও শ্রীশ্রী৺-সিংহবাহিনী দেবী আজিও বর্ত্তমান। শ্রীশ্রী৺অচ্যুতানন্দের অচুগড়ের পুষ্করিণী আজিও তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাঁহার স্থাপিত শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান। তাঁহার স্থাপিত শিবলিঙ্গ আংশিক ভগ্ন হওয়ায় প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর গঙ্গাশায়ী করা হইয়াছে।

কালক্রমে জজানগ্রাম-নিবাসী সোমেশ্বরের বংশধরগণ অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার গড়খাই আজিও "গড়" নামে বিদ্যমান আছে। স্থানে স্থানে উহা মজিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে উহার চিহ্নমাত্র নাই। নগর-প্রবেশের জন্য গড়ের উপর যে সেতু ছিল, তাহা আর বর্ত্তমান নাই। কিন্তু "সাঁকো পাড়া" আজিও বর্ত্তমান আছে। ঐ গ্রামস্থ সোমেশ্বরের অধিকাংশ বংশধরের বাস মৃৎকুটীরেই বটে, কিন্তু ঐ অঞ্চলে যে কোন স্থান খনন করিলেই প্রচুর মসলার সহিত সুপ্রাচীন পাতলা ইটের গাঁথনি যথেষ্টপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সোমেশ্বরের ব্যবহৃত পুষ্করিণী তদীয় গুরুদেবের "গোস্বামী" উপাধির স্মৃতি বহন করিয়া আজিও "গোঁসাই পুকুর" বা "গোঁসাই গড়" নামে পরিচিত হইয়া আছে। সৌকালীন গোত্রীয় যাবতীয় উত্তর রাঢ়ীয় ঘোষ ঐ পুষ্করিণীর অধিকারী ; সুতরাং যদিও পুষ্করিণীটির আয়তন আদৌ ছোট নয়, তথাপি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে এবং ম্যালেরিয়া-বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত সোমেশ্বরের ত্রিংশতিতম অধস্তন বংশধর। মহাত্মা সোমেশ্বরের বংশ এক্ষণে বহু বিস্তৃত ; তন্মধ্যে উক্ত জজান গ্রামে সোমেশ্বরের যে সকল বংশধর বসবাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনীষাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ রাজকার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ এখনও ঐ গ্রামে বর্ত্তমান আছে। সোমেশ্বরের বংশে কালক্রমে রাজা নরপতি ও দাতা দিগম্বর নামে দুই ভ্রাতার উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে রাজা নরপতি পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পাঁচতোপী গ্রামে অধিষ্ঠিত হন। দিগম্বর স্বীয় দানশীলতার ফলে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ইঁহারই বংশে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জন্ম। দিগম্বরের পরবর্ত্তী বংশধরগণ স্ব স্ব মনীষা ও অধ্যবসায়-বলে আপন আপন অবস্থার কথঞ্চিৎ

উন্নতি সাধন করিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় সসম্মানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন এবং এখনও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺লক্ষ্মীকান্ত ঘোষের পিতা ৺শিবরাম ঘোষ মহম্মদপুরের বিখ্যাত মহারাজ সীতারাম রায়ের দরবারে পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সীতারামের গুরুভাই বা এক গুরুর শিষ্য ছিলেন। উভয়েই একযোগে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ দেবের অন্যতম ভক্ত ও পারিষদ ৺দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের প্রপৌত্র ৺কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ৺লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ও সম্ভবতঃ সীতারাম রায়ের রাজ্য ধ্বংসের পর তাঁহার পিতা নাটোর রাজ-সরকারে কর্ম্ম করিতে থাকেন। ৺লক্ষ্মী-কান্ত ঘোষ মহাশয় পাবনা জেলায় মাজগ্রামে গোবিন্দপুর নামক জমিদারী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। সেই সময় হইতে পরবর্ত্তী কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের পিতামহ ৺নিত্যানন্দ ঘোষের সময় পর্য্যন্ত ইঁহাদের চাকুরী করার আবশ্যকতা হয় নাই। ইঁহার পিতামহ ৺নিত্যানন্দ ঘোষ মহাশয় পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদে ও তজ্জনিত মামলা-মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন।

ইঁহার পিতা ৺নীলমাধব ঘোষ মাত্র আঠার বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কলিকাতা পাইকপাড়া রাজ-সরকারে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় কর্ম্মদক্ষতা ও সততার গুণে সত্বরই উন্নতিলাভ করেন। নদীয়া জেলায় স্বল্প আয়ের একখণ্ড জমিদারী ও কিছু কিছু ভূসম্পত্তি হইতে তাঁহার যে পরিমাণ আয় ছিল, তাহা হইতে পল্লীগ্রামে থাকিয়া তাঁহার পরিবার-প্রতিপালন একরূপ চলিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু স্বীয় পুত্রগণের শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাকে চাকুরী করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বি-এ পাশ করার পর রক্তামাশয় রোগে তাঁহার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ

হয়; সুতরাং তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাটী আসিতে বাধ্য হন; সেজন্য পূর্ণচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া এম্-এ পড়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হয়।

১২৮৩ সালের ১৪ই আষাঢ় তারিখে পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে জজান বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পাস করেন। কান্দী স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে ডবল প্রোমোশন পান। তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে তাঁহার একবার কঠিন জ্বরবিকার হয়, কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে যাত্রা রক্ষা পান। এই জ্বরবিকারের পর তাঁহার রক্তামাশায় হয় এবং রক্তামাশয় সারিয়া গেলে তাঁহার আমাশয় হয়, সেই আমাশয় আর জীবনে আরোগ্য হয় নাই, তাহা আজিও তাঁহার সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্র প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে এফ্-এ পরীক্ষার কাল পর্য্যন্ত তিনি জ্বরাতিসারে ভুগেন, কিন্তু তত্রাচ তিনি উত্তরপাড়া কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইভাবে কঠিন রোগে দীর্ঘকাল ভোগা সত্ত্বেও এফ্-এ পাশ করা নিতান্ত কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। তার পর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহরমপুর কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন এবং তদবধি ক্রমে রোগ-ভোগ করিতে থাকেন। পূর্ণচন্দ্র বাল্যে ও যৌবনে পড়াশুনায় তেমন মনোযোগী ছিলেন না, যে সমস্ত কাজ করিতে লোকে সাধারণতঃ ভয় পায় তাঁহাকে সেইসমস্ত কাজ করিতে দেখা যাইত। তিনি কখনও কোন কার্য্যে হতাশ হইতেন না।

বি-এ পাস করিবার পর পূর্ণচন্দ্র দানাপুর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে, বাঁকিপুর টি-কে ঘোষ একাডেমীতে, গয়া টাউন স্কুলে অতীব সুখ্যাতির সহিত মাষ্টারী করেন। তিনি "এ" কোর্সে বি-এ পাশ

করিলেও ক্লাসে অঙ্কশাস্ত্র শিখাইতেন, ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নহে। বাঁকিপুরে অবস্থানকালে তিনি "ল"-লেক্‌চার শেষ করেন।

পূর্ণচন্দ্র ১৯০১ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু মার্চ্চ মাস হইতে বি-এল্ পড়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি ক্রমাগত জ্বরে ভুগিতে থাকেন। ১৯০২ সালে আগষ্ট মাসে তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন। তার পর হইতে তাঁহার সংসারে কতকগুলি শোকাবহ ঘটনা ঘটে। ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মধ্যম ভ্রাতা ৺ক্ষিতীশচন্দ্রের গয়াতে কলেরা হয় এবং সেই কাল ব্যাধির আক্রমণে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ক্ষিতীশচন্দ্রকে পূর্ণচন্দ্র প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। ক্ষিতীশচন্দ্র যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন হইতে পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিয়া পড়াশুনা করাইয়াছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু করাল কালের আহ্বানে তাঁহার আশা আর পূর্ণ হয় নাই। মৃত্যুকালে ক্ষিতীশচন্দ্র একটি নয় মাসের কন্যা রাখিয়া যান। ঐ কন্যাটির বিবাহ মহাসমারোহে পাইকপাড়ার কুমার পরে রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহিত হয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে পাইকপাড়ার ন্যায় বনিয়াদী বংশে কন্যা দান করিতে গেলে যেরূপ খরচপত্র ও গহনা-পত্রের প্রয়োজন পূর্ণচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই।

১৯০৬ সালের মার্চ্চ মাসে পূর্ণচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। একে অকালে ভ্রাতৃবিয়োগ, তদুপরি পিতৃবিয়োগ—এই সমস্ত নানা শোক-দুঃখে পূর্ণচন্দ্র ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯০৬ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাজকর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। পিতৃবিয়োগের পর সংসারের গুরুভার আপনার স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায় পূর্ণচন্দ্র পুনরায় ওকালতী ব্যবসায়ে মনোযোগ প্রদান করেন। কিন্তু ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বসন্ত রোগে তাঁহার প্রথমা পত্নী স্বর্গারোহণ করেন, ইহাতে পূর্ণচন্দ্র হৃদয়ে যে

দারুণ আঘাত পান, সে কথা বলাই বাহুল্য। পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি এত কাতর হইয়া পড়েন যে, গয়াধামে আর তাঁহার মন টিকে নাই, তিনি ছয় মাসের জন্য গয়াধাম ত্যাগ করিয়া যান। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সচ্চিদানন্দ ও অপর ভ্রাতা শ্রীমান্ শরজিৎ কুমার এল্, এম্, পি এবং পরে এম্-বি মহাশয়ের পত্নী প্লেগরোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। সচ্চিদানন্দ মৃত্যুর আট মাস মাত্র পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, বয়সে তিনি পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা ২২ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে আপন হস্তে লালন-পালন করিয়াছিলেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর অকাল মৃত্যুতে পূর্ণচন্দ্র যৎপরোনাস্তি মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন এবং এখনও সেই নিদারুণ শোকের স্মৃতি তাঁহার অন্তর হইতে দূরীভূত হয় নাই। ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণচন্দ্রের একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশুর বসন্তরোগে মৃত্যু হইয়াছে। এইসকল শোক-দুঃখে পূর্ণচন্দ্র যে বিশেষ মনোকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছেন এ কথা বলাই বাহুল্য।

পূর্ণচন্দ্রের যে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহিত হয়, সাবালক হওয়ার পর হইতে তিনি সেই সকল বিষয়েই যশস্বী হইয়া উঠিতেছিলেন। সরকার হইতে তিনি প্রথমে এম্ বি ই ও পরে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে গত ১৩২৯ সালের ১৭ই কার্ত্তিক তারিখে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। এই ভ্রাতুষ্পুত্রীর তিনটী পুত্র :—(১) কুমার বিমলচন্দ্র, (২) কুমার অমরেশচন্দ্র এবং (৩) কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র।

পূর্ণচন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীমান্ শরজিৎকুমার ঘোষ এম্-বির বিবাহ যশোহর জেলার চাঁচড়া রাজবাটীর কুমার সতীশচন্দ্র রায়ের কন্যার সহিত হয়। শরজিৎকুমার বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে থার্ড ইয়ারে

পড়িতেছেন, পাটনা মেডিকেল কলেজ হইতে তিনি পাশ হইয়া আসিয়াছেন।

৺সচ্চিদানন্দের সহিত দিনাজপুর মহারাজের মাতুল শ্রীযুত নরেন্দ্র-নারায়ণ সিংহের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে পূর্ণবাবু কখনও যোগদান করেন না। A subject nation has no politics—ইহাই তাঁহার অভিমত। তবে তিনি সামাজিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার ও উহার শিক্ষা-সমিতির তিনি সভ্য এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিরও তিনি সদস্য। পূর্ণবাবু ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার হন এবং এখনও আছেন।

সাধু তুকারাম

ভারতের বক্ষে যুগে যুগে অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্ম্মের বিকাশ সাধন করিয়া থাকেন। তুকারামও সেইরূপ এক নূতন পথ দেখাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৫৩০ শকাব্দে ইংরাজী ১৬০৮ সালে সাধু তুকারাম পুনা নগর হইতে কিছু দূরে দেহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন এবং বাণিজ্যই তাঁহার পুরুষপরম্পরাগত জীবিকা ছিল। পুনা অঞ্চলে পাণ্ডারপুর একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। তথায় বিঠোবাদেবের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তুকারামের পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বম্ভর মধ্যে মধ্যে বিঠোবা দেবকে দর্শনের জন্য পাণ্ডারপুর যাত্রা করিতেন। একদিন তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পান যে, তাঁহারই বাড়ীর পার্শ্বে বিঠোবা ও রুক্মিণীর মূর্ত্তি প্রোথিত রহিয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়া বিশ্বম্ভর সেই মূর্ত্তি বাহির করিয়া ইন্দ্রাণী নদীর তীরে সেই মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

তুকারামের পিতা কল্লজী। কল্লজী কুলদেবতা বিঠোবার সেবা করিতেন। কল্লজীর বয়স বার্দ্ধক্যের সীমায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সান্তজী বিষয় ও ব্যবসায়ের ভার না লইয়া বিঠোবা দেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন, কাজেই মধ্যম তুকারামকেই বাধ্য হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইয়া ও সংসারের ভার আপন স্কন্ধে লইতে হইল। তখন তুকারামের বয়স মাত্র ত্রয়োদশ মাত্র। তুকারাম জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার লোকসান হইতে লাগিল। তাহার দুইটি স্ত্রীর মধ্যে একটি অনাহারে নানা দুঃখ-কষ্ট পাইয়া মারা গেল। তখন

তুকারামের বয়স মাত্র ২০ বৎসর, আর যে স্ত্রী মারা গেলেন, তাঁহার নাম রুক্মিণী। বাকি থাকিলেন জিজাবাই। শুধু ইহাই নহে, এই বৎসরে শান্ত নামে একটি পুত্রও কালকবলে পতিত হইল। একে জনক, জননী, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ সকলে কালকবলে৷ পতিত হইয়াছেন, তদুপরি স্ত্রী-পুত্র সকলেই তাহার বুকে দারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিল, তুকারাম এই ব্যথা কি প্রকারে সহ্য করিবেন! ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তুকারাম এই নিদারুণ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেও সংসার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আবার এই সময়ে তাঁহার সংসারে এরূপ ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল যে, তিনি আর মানসম্ভ্রম লইয়া সমাজে বাস করিতে পারিলেন না। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া তাঁহার উপর পতিত হইল। ধনহীন, মানহীন, নিঃসম্বল তুকারাম স্রোতের শৈবালের ন্যায় সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। ব্যবসায় ছাড়িয়া তিনি পশু-পালনে মনোনিবেশ করিলেন, তাহাতেও তিনি আদৌ অর্থলাভ করিতে পারিলেন না। তখন স্ত্রী-পুত্রের মায়া-মমতা তিনি পরিত্যাগ করিলেন। বিঠোবাদেবের মন্দির তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি সেই মন্দিরে গিয়া কেবল ভগবৎ-সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। মানুষ ঐশ্বর্য্যের সময় ভগবানকে ডাকুক আর নাই ডাকুক, অভাবে পড়িলে তাহার হৃদয়তন্ত্রী ভগবৎ-নামে স্বতঃই নাচিয়া উঠে। তাই তুকারামের প্রাণের মধ্য হইতে যে ঐশ্বরিক সঙ্গীত বাহির হইতে লাগিল, তাহা দুঃখিত, ব্যথিত ভক্তের করুণ ক্রন্দন। সে সঙ্গীতে বুঝিবা পাষাণও বিগলিত হয়। তুকারাম ডাকিতেন, ঠাকুর তুমি না দয়াময়, করুণার সাগর, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী! যদি তাই হও ঠাকুর, তবে দীন দরিদ্র তুকারাম আজ অন্নাভাবে মরিতেছে কেন? ঠাকুর কত পাপী তাপী তোমার

প্রসাদে এই ভবপারাবার উত্তীর্ণ হইল, আর আমি এমন কি পাপ করিয়া আসিয়াছি যে, আমাকে দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত করিয়া পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিতেছ! ঠাকুর! দয়াল ঠাকুর! কাঙ্গালের ঠাকুর! একবার দয়া করিয়া এই দীন দরিদ্রের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর।

তুকারাম এইভাবে ঠাকুরকে ডাকিতেন আর মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রী-পুত্রের অবস্থা দেখিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে শস্যাদিও দিতেন। সাধু তুকারাম কিছু দিন পরে বিঠোবা দেবের মন্দির ছাড়িয়া পুনরায় বাড়ীতে আসিলেন। দুই একজন লোকের নিকট হইতে পৈতৃক দলিলের বলে কিছু টাকা পাইতেন, তুকারাম সেই ঋণী লোকদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং তাহাদের অবস্থা দেখিয়া তুকারামের দয়া হওয়ায় তুকারাম সেই সমস্ত দলিলপত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইয়া তুকারামকে পৃথক করিয়া দেন এবং নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে গালাগালিও করেন। এমন কি, তুকারামের স্ত্রী জিজাবাই পর্য্যন্ত তাঁহাকে বুদ্ধিহীন, মূর্খ প্রভৃতি কটূক্তি করিয়া গালিগালাজ করিলেন। তুকারাম এই সমস্ত বিষয়ীর ব্যবহার দেখিয়া মনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এই সমস্ত বিষয়ী লোকের দয়ামায়া বলিয়া আদৌ কোন জিনিষ নাই। ইহারা নিজে খাইব, নিজে পরিব—এই সমস্ত স্বার্থপূর্ণ অভিসন্ধি লইয়া ব্যস্ত থাকে। আমি কি দরিদ্র অসহায় অধমর্ণদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া কোন অন্যায় কাজ করিয়াছি? এই অধমর্ণ-দিগের নিকট হইতে আমি না হয় যে টাকা কয়টি পাইতাম, তদ্দ্বারা ২।৪ দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আমার দিনাতিপাত হইত, কিন্তু ইহারা যে না খাইয়া উপবাস করিয়া মরিত, কৈ সে চিন্তা ত একবারও কেহ করে না! তুকারাম বিবেকের সহিত যতই এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিবেক তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে, তিনি

নির্দ্দোষী, তিনি অতি সঙ্গত কাজই করিয়াছেন। অতঃপর তুকারাম স্থির করিলেন, যে সংসারে দয়া নাই, মায়া নাই, আছে কেবল পূতিগন্ধ স্বার্থ, যে সংসারে কেবল টাকা টাকা করিয়া লোকজন রাত্রি দিন উন্মত্ত, সেই সংসারে তাঁহার না থাকা কর্ত্তব্য। যে উত্তম, অধ্যবসায় ও শক্তি-সামর্থ্য এই সমস্ত স্বার্থপর বৈষয়িক লোকের প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করা হয়, সেই উত্তম ও অধ্যবসায় ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিলে আধ্যাত্মিক হিসাবে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। তুকারাম তাঁহার স্ত্রীকে কোন কথা না বলিয়া আলান্দি নামক স্থানে গমন করিলেন। এই আলান্দি দেহু হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তুকারামের প্রাণে বড় ভাল লাগিল। তিনি চারিদিকে ভ্রমণ করেন আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ অনুভব করেন। হঠাৎ একজন কৃষকের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। কৃষক বহুদিন হইতে একজন ক্ষেত্র-রক্ষকের অনুসন্ধান করিতে-ছিল। তুকারামকে বলিবামাত্র তুকারাম তাহাতে রাজি হইলেন। কিন্তু তুকারামের এ কি ব্যবহার! ক্ষেত্ররক্ষক ক্ষেত্রের শস্য রক্ষা করিবে, পাখী তাড়াইবে, ইহাই ত তাহার কাজ! কিন্তু তাহা না করিয়া ক্ষেত্রে বিঠোবার নাম গান করিতে লাগিলেন এবং পাখীরা স্বচ্ছন্দে শস্য-সমূহ খাইয়া গেলেও একটি কথাও বলিলেন না। একদিন ক্ষেত্রস্বামীর চক্ষে এই ঘটনা পড়িল। তিনি তুকারামকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ কি তুকারাম! তোমার এ কি অদ্ভুত ব্যবহার! তুমি এইভাবে পাখী দিয়া শস্য নষ্ট করিতেছ!" তুকারাম বলিল, "পাখীরা সকলে কৃষ্ণের জীব, তাহাদিগের ক্ষুধা পাইলে কি তাহারা খাইবে না?" অনন্তর ক্ষেত্রস্বামী পঞ্চায়তের নিকট তুকারামের নামে অভিযোগ করিল। তুকারামকে ক্ষেত্রে যত শস্য উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তের মূল্য দিতে হইবে, পঞ্চায়ত এই সিদ্ধান্ত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যদিও

পাখীতে অনেক শস্য খাইয়াছিল, তত্রাচ সে বৎসর ক্ষেত্রে দ্বিগুণ পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। পঞ্চায়ত এবার সিদ্ধান্ত করিলেন, এ বৎসর যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেই শস্যের চল্লিশ মণ মাত্র ক্ষেত্রস্বামীকে দিয়া অবশিষ্ট শস্য তুকারামকে দেওয়া হইবে। আলান্দির কতিপয় ভদ্রলোক সেই শস্য বণ্টন করিয়া তুকারামের প্রাপ্য অংশ তুকারামের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তুকারাম এইরূপে প্রচুর শস্য পাওয়ায় কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তুকারামের মনপ্রাণ পড়িয়া থাকিত বিঠোবা মন্দিরে। তিনি সময় পাইলে বিঠোবা মন্দিরে গিয়া সাধন-ভজন করিতেন। তবে তিনি পরিবারবর্গের প্রতি কখনও উদাসীন ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন, নাম কীর্ত্তন করিয়া আপনার মুক্তির পথ প্রশস্ত করা যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি পরিবার ও পুত্রকন্যাদের লালন-পালন করাও কর্ত্তব্য। তাই তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমের সহিত সংযোগ রাখিয়া সকল কার্য্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী জিজাবাই তাঁহার উপর অযথা অত্যাচার করিতেন। তুকারাম স্ত্রীর এই সমস্ত লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেন। একদিন তুকারাম হাট হইতে একটি ইক্ষুদণ্ড কিনিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী সেই ইক্ষুদণ্ড তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তুকারাম তাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বলিলেন, "তুমি কি একাকী ইক্ষুদণ্ডখানি খাইবে না বলিয়া এমন ভাবে উহা দ্বিখণ্ড করিলে?" বস্তুতঃ তুকারাম স্ত্রীর অত্যাচার সত্ত্বেও স্ত্রীর কোনরূপ দোষ ধরিতেন না।

কিন্তু সকল জিনিষেরই ত সীমা আছে। তুকারাম স্ত্রীর অত্যাচার অনেক সময় সহ্য করিতে না পারিয়া বিঠোবা মন্দিরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ অনাহারে থাকিত, এজন্য তাঁহার প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিত বটে, কিন্তু স্ত্রীর অত্যাচার অনেক সময় তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকট অনেক ধর্ম্মপ্রাণ

মহানুভব আসিতেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করিতেন, কিন্তু তুকারামের স্ত্রীর এ সমস্ত সহ্য হইত না। জিজাবাই সেই ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তদিগকে পর্য্যন্ত অনেক সময় অপমানিত করিত। তুকারাম এ সম্বন্ধে একটি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন—

"জিজা বলে এত লোক কিসের কারণ ?
তাদের কি নিজ কাজ কিছু নাই আর ?
তুকা বলে সার কথা করহে শ্রবণ,
ঈশ্বর সম্বন্ধে সবে আত্মীয় আমার।
কোন্ কালে হবে তব বোধের উদয়।
ভাল কথা বলিলে কি ক্ষতি কিছু হয় ?
যাঁদের সম্মান সহ করি অভ্যর্থন।
আনিতে না পারি কভু গৃহেতে আমার।
দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য প্রেমের বন্ধন।
ইচ্ছামত আসিছেন তাঁরা কতবার।
মূঢ় নারী চিনিল না অমূল্য রতন।
তাঁদের পশ্চাতে যায় শুনীর মতন ॥"

জিজাবাই এতদূর কঠিনহৃদয়া ছিলেন যে, তুকারাম কাহাকেও ভিক্ষা দিতে গেলে জিজাবাই তাহা হাত হইতে কাড়িয়া লইতেন। তুকারাম এত নিষ্ঠুর ছিলেন না যে, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ অনাহারে মরিবে, আর তিনি সংসার ছাড়িয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহার এতদূর নিষ্ঠুর ছিল যে, তুকারামকে বাধ্য হইয়া সংসার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করে বলিয়া স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। জিজাবাই এই সহধর্ম্মিণীর কাজ আদৌ করে নাই। তাহার স্বামীকে ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করা ত দূরের

কথা, বরং স্বামী যে সমস্ত কাজ করিতে যাইতেন, জিজাবাই প্রাণপণে সেগুলিতে বাধা দিতেন।

তুকারাম স্ত্রীকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু

"পয়োপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥"

সেই উপদেশে তাঁহার স্ত্রী সন্তুষ্ট না হইয়া বরং তৎপ্রতি কুপিতই হইয়াছিল। তুকারাম প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রথমে স্নান করিতেন, তার পর বিঠোবা মন্দিরে গিয়া তাঁহার পূজা করিতেন, পূজান্তে নিকটস্থ বনে গিয়া তপস্যায় রত থাকিতেন। এমন কি, এক একদিন সারাদিন বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। রাত্রিতে আবার বিঠোবা দেবের মন্দিরে গিয়া নৃত্য করিতেন। একদিন ভীমানদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় বাবা-চৈতন্য নামে এক সাধু তুকারামের মাথায় হাত দেন এবং তাঁহাকে "রামকৃষ্ণ হরি" নাম করিতে বলেন। তদবধি তুকারামের ধর্ম্মমত স্থিরীকৃত হয়। এই বাবা-চৈতন্য নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন একজন শিষ্য হইবেন, কারণ তুকারাম তদবধি মহাবৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের ন্যায় নামকীর্ত্তন করিতেন। তুকারাম যে একজন কষ্টসহিষ্ণু মহাত্মা ছিলেন, তাহা তাঁহার অভঙ্গ হইতেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। অন্নকষ্টকে তিনি অন্নকষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না, স্ত্রীর দুর্ব্যবহারেও তিনি মনে একদিনও কষ্ট অনুভব করেন নাই। তিনি বলিতেন,—

"আমার ভালোর জন্য ওহে ভগবান্!
ব্যবসায়ে নষ্ট হ'ল সমুদয় ধন।

আমার ভালোর জন্য দুর্ভিক্ষ ভীষণ।
মনের সকল সুখ করিল হরণ।
আমার ভালোর জন্য মুখরা রমণী।
আমাকে যাতনা দিত দিবস রজনী।
ধন গেল, মান গেল হ'ল পশুক্ষয়।
আমার ভালোর জন্য ওহে দয়াময়।”

সংসারে এইভাবে যাহা কিছু মন্দ তাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া কয়জনে আত্মতুষ্টি লাভ করিতে পারে? “সুখেষু বিগতস্পৃহঃ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনঃ”—ইহাই বা সংসারে কয়জন আছেন? যে ব্যক্তি দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে না করে, সংসারে ত সেই সুখী আর সেই ত সাধক। তুকারাম ভগবানে কত বড় আত্মনির্ভরশীল ছিলেন, ইহাই কি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? কামনা এবং বাসনার কি কখনও ক্ষয় আছে? কামনা ও বাসনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন না দিলে কখনও শাশ্বত শান্তি লাভ করা যায় না। তুকারাম সেই কামনা ও বাসনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

“ন জাতু কাম কামানং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়া এবহি বর্দ্ধতে॥”

তুকারাম একজন সাধকের অভঙ্গসমূহ অভ্যাস করিয়া তাহা ভজনা করিতেন। তার পর অভঙ্গ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার কণ্ঠে সরস্বতী যখন আবির্ভূতা হইলেন, তখন তুকারাম নিজেই অভঙ্গ রচনা করিতে লাগিলেন। এখন অভঙ্গ জিনিষটি কি তাহা বলিতেছি। বাঙ্গালা দেশে যেমন পুরাণ-গান, দাক্ষিণাত্যে তেমনি কথা-প্রণালী। মূল গায়ক দণ্ডায়মান হইয়া একটি পদ বা শ্লোক উচ্চারণ করেন। ইহাতে বক্তৃতার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এই পদ

বা শ্লোকটির মর্ম্ম শ্রোতৃগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য নানা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়া থাকে এবং নানাপ্রকার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। মধ্যে মধ্যে কথক কোন পদ, তান-লয়সহ উচ্চারণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গিগণ তাহাতে যোগ দেন। সঙ্গীতের সহিত বাদ্যও থাকে, এমন কি স্থানে স্থানে পাখোয়াজ পর্য্যন্ত থাকে। দাক্ষিণাত্যে দেবালয়সমূহে এইরূপ অভঙ্গ বা ভজন গান হইয়া থাকে।

তুকারাম সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের ঈর্ষ্যানল প্রজ্জ্বলিত হইল। ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম না করিয়া শূদ্রগণ গিয়া তুকারামের চরণে প্রণাম করে এবং তুকারাম শূদ্র হইয়াও বেদ প্রচার করে, ইহা কি ব্রাহ্মণগণের সহ্য হয়? তাঁহারা তুকারামকে দণ্ড দিবার জন্য জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। দেহুগ্রামে তখন মম্বাজী নামে একজন গোঁসাই বাস করিতেন। তুকারামের প্রসার ও প্রভাব দেখিয়া তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন তুকারামের ভজনে যোগদান করিবার নিমিত্ত বিঠোবা মন্দিরে যাইতেন। দাক্ষিণাত্যে একাদশীব্রত সধবা বিধবা সকলেই পালন করে। ঐদিন সধবা বিধবা সকলেই ফলাহার করিয়া বিঠোবা মন্দিরে যাইত। গোঁসাইজীও যাইতেন। বিঠোবা মন্দিরের পশ্চাতে গোঁসাই ঠাকুরের জমি ছিল। পাছে কেহ সেই জমি দিয়া মন্দিরে আসে, এই আশঙ্কায় গোঁসাই একটি কাঁটার বেড়া দিয়া রাখিয়াছিলেন। কাঁটাগুলি বড় হইলে তুকারাম তাহা ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দেন, ইহাতে ভক্তেরা অনায়াসে সেই বেড়া ডিঙ্গাইয়া মন্দিরে আসিতে পারিত। কিন্তু গোঁসাইজী এই কারণে তুকারামকে কাঁটা দিয়া এমন ভাবে প্রহার করিলেন যে, তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল; কিন্তু তুকারাম একটি কথাও বলিলেন না। ইহাতে গোঁসাইজী তুকারামের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যগুণে এতটা মোহিত হইলেন যে, তিনি তুকারামের একজন পরম ভক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু

এইখানেই তুকারামের অগ্নি-পরীক্ষার শেষ হইল না ; পুনা নগরীর কিছু দূর উত্তর-পূর্ব্বে ভাগোলি নামক গ্রামে রামেশ্বর ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তুকারামের প্রভাব দেখিয়া ঈর্ষ্যানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। জেলার শাসনকর্ত্তার নিকট তিনি তুকারামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিতে লাগিলেন। শাসনকর্ত্তা তুকারামকে দেহু গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। তুকারামের কষ্টের আর অবধি থাকিল না। তাঁহার আহার জুটিত না, কেহ শাসনকর্ত্তার ভয়ে তাঁহাকে থাকিতেও জায়গা দিত না। এইরূপ অপার দুঃখ ভোগ করিতে করিতে তুকারামের সঙ্কল্প হ্রাস পাইল। তিনি ভাগোলি গ্রামে যাইয়া রামেশ্বর ভট্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনেকে তুকারামের এই প্রকার দৌর্ব্বল্যকে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের শৈথিল্যের কারণ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। মানুষ যতই কেন স্থির সঙ্কল্পে থাকিবার চেষ্টা করুক না, অভাব-অনটন ও অন্নকষ্ট এরূপ তীব্র ভাবে তাহাকে আক্রমণ করে যে, সে সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সে বাধ্য হয়। রামেশ্বর ভট্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেই রামেশ্বর ভট্ট তাঁহাকে বলিলেন, "যদি তোমার সমস্ত অভঙ্গ নদীতে ফেলিয়া দিতে পার, তবেই তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।" তুকারাম বড় মনোকষ্টে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অভঙ্গগুলি একটি পুঁটুলি করিয়া ইন্দ্রাণী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর কাঁদিতে কাঁদিতে তুকারাম বিঠোবা দেবের মন্দিরে গিয়া একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর ধর্ণা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। একদিন দুইদিন করিয়া তেরদিন কাটিয়া গেল, তুকারাম একভাবে পড়িয়া থাকিয়া বিঠোবা দেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে যে, বিঠোবা দেব তুকারামের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভঙ্গগুলি তাঁহাকে ফেরত দিয়াছিলেন। তুকারাম একটি অভঙ্গে

এই সময় তাঁহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন ঃ—

* * * *

"তোমারে দেখাই নাথ! আত্মহত্যা ভয়!
কিন্তু দেব! তোমার কি করুণা অপার!
জল হোতে পুঁথিগুলি করিলে উদ্ধার।
ইহাতে লোকের মুখ নীরব হইল,
তোমার মহিমা দেব! জগতে ঘোষিল।"

এদিকে রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া তাঁহার একজন পরম ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একটি কূপে স্নান করিলে তাঁহার অঙ্গ যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি জ্ঞানেশ্বর দেবের শরণাপন্ন হওয়ায় জ্ঞানেশ্বরদেব তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, তুকারামের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহার সকল জ্বালা নিবারণ করিবেন। রামেশ্বর তুকারামের নিকট একখানি ক্ষমা-প্রার্থনা-সূচক পত্র প্রেরণ করিলেন, তুকারামও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া প্রত্যুত্তরে একটি অভঙ্গ রচনা করিয়া পাঠাইলেন। সেই অভঙ্গের মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"অন্তর যাহার হয় পবিত্রতাময়,
শত্রু তার মিত্র হয় নাহিক সংশয়॥"

এই সময় হইতে রামেশ্বর ভট্ট সর্ব্বদা তুকারামের নিকট থাকিতেন এবং তিনি তুকারাম যে সমস্ত অভঙ্গরচনা করিতেন সেগুলি লিখিয়া রাখিতেন। তুকারামের প্রতি রামেশ্বরের কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি-ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত অভঙ্গ হইতে জানা যায়। রামেশ্বর এই অভঙ্গ রচনা করেন—

"বেদ আর ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত যারা।
তুকা সহ তুলনায় অতি নিম্নে তারা॥"

অতঃপর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তুকারামের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন মহারাজা শিবাজী পুনার অধিপতি। দুইজন সন্ন্যাসী শিবাজীর কর্ম্মচারী দাদাজী কাণ্ডাদেবের নিকট এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আনয়ন করিলেন যে, তুকারাম সন্ন্যাসী নহেন, এমন কি ব্রাহ্মণও নহেন, তথাচ তিনি বেদ ব্যাখ্যা করেন এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই প্রণাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অভিযোগ পাইবামাত্র দাদাজী তাহা শিবাজীর নিকট উপস্থাপিত করিলেন। শিবাজী বলিলেন, "তাই ত এইসমস্ত শূদ্র উপদেশককে জব্দ করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যে আর থাকে না। শিবাজীর আদেশে একটি সভা আহূত হইল। কথা হইল, সেই সভায় তুকারাম যদি সন্ন্যাসীদিগকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তুকারাম অব্যাহতি পাইবেন, নতুবা তাঁহার কঠোর শাস্তি হইবে। সভা বসিল, সন্ন্যাসিগণ আসিয়া আপনাদের বাহ্যিক জটাজুটের স্পর্দ্ধায় অহঙ্কৃত বপু লইয়া সভা জাঁকাইয়া বসিলেন, কিন্তু তুকারাম এমন প্রাণমনস্পর্শী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহারা সকলে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। আর কেহ তুকারামের সহিত বিচার-বিতর্ক না করিয়া সকলেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। কোন সন্ন্যাসীই আর তুকারামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না।

শিবাজীমহারাজ ও তুকারাম

তুকারামের ভক্তির মহিমা অতঃপর শিবাজীমহারাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি এই অলোকসামান্য মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য অতি-

মাত্রায় ব্যস্ত হইলেন। তিনি তুকারামের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ-দরবারে আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তুকারাম এক দীর্ঘ প্রত্যুত্তরে শিবাজীমহারাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই পত্রে তুকারাম লিখিলেন, মহারাজ ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী, রাজ-চক্রবর্ত্তী; আমি দীন-দরিদ্র ভিখারী; ধনীর প্রাসাদে ধনীর অবস্থানই শোভা পায়, কদাচ দরিদ্রের নহে। অতএব মহারাজ এ বিষয়ে আমাকে অব্যাহতি দিবেন। আর মহারাজের প্রতি আমার এই উপদেশ যে, সর্ব্বদা ধর্ম্মের দিকে মতিগতি রাখিবেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিবেন। কদাচ প্রজার উপর অযথা অত্যাচার করিবেন না—ইত্যাদি। শিবাজীমহারাজ তুকারামের এই চিঠি পাইয়া তুকারামের উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি এবার স্বয়ং মণি-মুক্তা ও বহুমূল্য রত্ন লইয়া লোহাগাভা নামক স্থানে তুকারাম-দর্শনে আসিলেন। তুকারাম শিবাজীর এই সমস্ত উপহারের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। শিবাজী রামদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন, সাধু-সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তুকারামের ত্যাগ দেখিয়া তাঁহার উপর তাঁহার শ্রদ্ধার ভাব আরও বাড়িয়াই উঠিল, তিনি নতমস্তকে তুকারামের উপদেশসমূহ গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনায় আমাদের মনে পড়ে, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও রাজা প্রতাপ রুদ্রের কথা। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিবার জন্য রামানন্দ রায়, বাসুদেব সার্ব্বভৌম দ্বারা কত প্রকারে মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"হেন কথা কভু মুখে নাহি আনি আর।
আনিলে হেথায় মোরে দেখিবে না আন।"

তার পর রাজা প্রতাপ রুদ্র যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু যখন একাকী আলালনাথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে রাজা প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর চরণে নিপতিত হন।

তুকারাম প্রথম জীবনে পরিবারবর্গের দুঃখ-কষ্টে অথবা স্ত্রীর অত্যাচারে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এখন যে তিনি একেবারে খাঁটি ত্যাগী মহাপুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজা শিবাজী-প্রদত্ত উপহার-প্রত্যাখ্যানেই তাহা দেদীপ্যমান।

সুন্দরী যুবতী ও তুকারাম

তুকারাম ধন ও ঐশ্বর্য্যের লোভ পরাজিত করিলেন, এইবার আর একটা মহাপ্রলোভন আসিয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। একটি অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী যুবতী প্রায়ই তুকারামের কীর্ত্তনে যোগদান করিত। সেই যুবতী তুকারামের রূপলাবণ্য-দর্শনে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সে প্রতিনিয়ত আপন অসদভিপ্রায় তুকারামকে জানাইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিত। একদিন তুকারামকে নির্জ্জনে পাইয়া সে তুকারামকে আপন অসদভিপ্রায় জানাইল। তুকারাম তখন দুই হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন এবং সেই যুবতীকে বলেন :—

“পরনারী জ্ঞান করি রুক্মিণীর প্রায়।
অন্যথা হবে না ইহা করিয়াছি পণ।
তাই বলি জননী গো কেন ক্লেশ পাও।
বিষ্ণুর সেবকগণ ব্যভিচারী নয়॥
সহিতে না পারি হেন হীনতা তোমার।
এরূপ কুৎসিত কথা এন না গো মুখে॥”

বাস্তবিক মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা সকলেই কামজয়ী ছিলেন। কাম লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। রক্তের চরম ভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়, এই সার ভাগ যদি দেহে না থাকে তবে তাহার দেহ গজভুক্ত কপিত্থের মত হয়। শুধু তপস্যা করিলেই তপস্বী হওয়া যায় না। যে কামজয়ী, ঊর্দ্ধরেতা সেই প্রকৃতপক্ষে তপস্বী। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ—

"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।"

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা, তিনি দেবতা, মানুষ নহেন। যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী হইবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক সবল, শরীর শক্তিমান্, মন ও মুখশ্রী সুন্দর ও স্নিগ্ধ হইবে। স্ত্রীলোক-মাত্রকেই মাতৃভাবে দর্শন করা কামদমনের প্রকৃষ্ট উপায়। যত বড়ই সুন্দরী নারী উপস্থিত হউক না কেন, তাহাকে "মা" বলিতে পারিলে সমস্ত কামভাব মন হইতে দূরীভূত হয়।

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে
কলেবরে মূত্রপুরীষ ভাবিতে রমন্তি
মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ॥
—যোগোপনিষৎ।

অর্থাৎ অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ, কৃমিজালসংকুল, হে স্বভাবদুর্গন্ধি মূত্রপুরীষপূর্ণ এই কলেবরে মূর্খগণই ভোগের লালসা করিয়া থাকে; পণ্ডিতগণ তাহা হইতে নিরস্ত হন।

ভগবানকে দেখিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে কাম-দমন আবশ্যক। নারদ যখন তাঁহার মৃত্যুর পরে ভগবদন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন,

নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এক দিবস এক অরণ্যের মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে তাঁহার ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ ভগবানের রূপ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অমনি অন্তর্হিত হইল। ভগবান্ তখন তাঁহাকে বলিলেন—

"হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্নমাং দ্রষ্টুমিহার্হতি
অবিপক্ক কষায়ানাং দুর্দ্দশোঽহং কুযোগিনাম্।

—ভাগবত।

হায় এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার যোগ্য হও নাই, যাহারা কামাদিকে দগ্ধ করে নাই, সেই কুযোগিগণ আমাকে দেখিতে পায় না। তবে এই যে একবার দেখা দিলাম, সে কেবল আমার প্রতি তোমার কাম জন্মাইবার জন্য।

তুকারামের অলৌকিক ক্রিয়া

তুকারাম কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। একদা তুকারাম লোহাগাভাগ্রামে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক তাহার পুত্রের মৃত দেহ তুকারামের সমক্ষে স্থাপন করিয়া বলিল, "ঠাকুর, যদি সত্য সত্যই ভক্ত হন, তবে আমার পুত্র নিশ্চয়ই জীবনলাভ করিবে, আর যদি সাধু না হন তবে মৃত পুত্র আর বাঁচিবে না।" প্রবাদ আছে যে, সেই মৃত পুত্রটি কোলে করিয়া তুকারাম ভগবানকে ডাকিয়া বলেন, "ভগবন! যদি সত্য সত্যই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করা তোমার অভিপ্রায় হয়, যদি ভক্তের মহিমা রক্ষা করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে এই মৃত শিশুটীকে জীবন দান করিয়া আজ আমার মুখ রাখ।" প্রকাশ, শিশুটী তৎক্ষণাৎ পুনরায় জীবনলাভ করিয়াছিল।

তুকারামের জীবনদীপ কিরূপে নির্ব্বাপিত হইল, সে সম্বন্ধে অনেক

প্রকার কিম্বদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, তুকারাম একদা আলান্দীতে জ্ঞানেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে যান, তখন মন্দির-সংলগ্ন বৃক্ষতলে বসিয়া কতকগুলি পক্ষী গান গাইতেছিল। তুকারামকে দেখিয়াই তাহারা ইতস্ততঃ উড়িয়া যায়। ইহা দেখিয়া তুকারাম মনে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং ভাবিতে লাগেন, তবে কি এখনও তাঁহার মন হইতে হিংসা প্রবৃত্তি তিরোহিত হয় নাই যাহাতে তাঁহাকে দেখিয়া বনের পাখী পর্য্যন্ত ভয়ে উড়িয়া না যায়। এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি শ্বাস বন্ধ করিয়া সেই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পক্ষীসকল এবার তাঁহাকে নির্জীব মনে করিয়া তাঁহার দেহের উপর বসে এবং যদৃচ্ছা তাঁহাকে দেহ ঠোকরাইতে থাকে। বোধ হয়, এ সময় তুকারাম নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া থাকিবেন এবং সেই অবস্থাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৫৭১ শকে তুকারাম দেহু গ্রাম ত্যাগ করেন, ঐ দিনকেই তাঁহার তিরোধানের দিন বলিয়া মনে করা হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, তুকারাম দেহু গ্রাম হইয়া বাহির হইয়া তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করেন, তীর্থপর্য্যটনে গিয়া কি ভাবে তাঁহার তিরোধান হয় তাহা আর জানা যায় না। যে ভাবেই তাঁহার জীবনের অন্ত হউক না কেন, তিনি যে এখনও আধ্যাত্মিকভাবে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার অভঙ্গসমূহ আজিও দাক্ষিণাত্যের ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হইতেছে, কি রাজা, কি প্রজা, এখনও সাধু তুকারামের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভক্তিভরে মস্তক নত করিতেছে।

তুকারামের অন্তর্ধানের পর তাঁহার পুত্র নারায়ণ শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেহু গ্রামে বিঠোবার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ছত্রপতি শিবাজী নারায়ণের সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। শুধু তাহাই নহে, নারায়ণের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাকে

তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন। এই গ্রাম তিনটীর উপস্বত্বে আজিও তুকারামের বংশধরগণ দেবসেবা, অতিথিসেবা ও ব্রাহ্মণসেবা করিতেছেন। তুকারামের বংশধরগণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগকে সকলে চৈতন্য-সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন। আজিও দক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবেরা পাণ্ডারপুর, আলান্দী ও দেহুকে তাঁহাদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। পাণ্ডারপুরকে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন বলিয়া জ্ঞান করে। নিম্নলিখিত অভঙ্গ হইতে তুকারামের ধর্ম্মমত কি সে পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"ঈশ্বর পাইতে যদি চাও ওরে মন।
সহজ উপায় বলি করহ শ্রবণ॥
প্রথমে পবিত্র করি আপনার মন।
ভক্তি সহ নাম গান গাও অনুক্ষণ॥
আপনি বিনম্রভাব করিয়া ধারণ।
সাধুর পায়ের ধূলি করহ গ্রহণ।
বিতর্ক করো না ল'য়ে অপরের কথা।
থেকো না তথায় হয় পরনিন্দা যথা॥
তুকা বলে, সার কথা অন্তরেতে ধর।
সাধ্যমত অপরের উপকার কর॥"

নিম্নে তুকারামের অভঙ্গ হইতে দুই চারিটী উদ্ধৃত করা হইল :—

"নিজ ক্ষমতায় কারো সরে না বচন।
আছেন বাক্যের মূলে দেব নারায়ণ।
যেজন বিরাগী হয় ত্যজিয়া সংসার।
ঈশ্বরের তার প্রতি করুণা অপার॥"

* * * *

'নম্রভাব অতি ভাল ওহে ভগবান।
তা হ'লে অন্তরে হিংসা নাহি পায় স্থান॥
প্রবল বন্যাতে কত বৃক্ষ ভেসে যায়।
থাকিবার স্থান কিন্তু তৃণ আদি পায়॥"

* * * *

"স্থির জেনো এই দেহ হইবে পতন।
তবে কেন তাঁর নাম না কর গ্রহণ?"

* * * *

"যে ভাবে মানুষ তাঁরে করয়ে চিন্তন।
সেই ভাবে তিনি তারে দেন দরশন॥"

* * * *

"ক্ষমা ধৈর্য্য আর শান্তি এই তিন যথা।
সেইখানে ভগবান থাকেন সর্ব্বথা॥"

* * * *

"অন্তর পবিত্র আর মিষ্টভাষী যেই,
প্রকৃত ধার্ম্মিক ব'লে গণ্য হয় সেই।
পরুক বা না পরুক গলদেশে হার।
তার পক্ষে নাহি চাই এরূপ বিচার।"

স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের শাসনকালে রাজা রামমোহন রায় যখন আপন প্রতিভাবলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যখণ্ডে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতেছিলেন, তখন রাখালদাস হালদার মহাশয় হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে, ফরাসী-চন্দননগরের বিপরীত কূলে জগদ্দল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন জগদ্দল বহু শিল্প-শালা-পরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ এই গ্রামে বাস করিতেন। জনার্দ্দন হালদার মহাশয় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভট্টনারায়ণের বংশ হইতে এই বংশের উৎপত্তি। জনার্দ্দন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে বেনিয়ালি গ্রামে নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এই নিত্যানন্দ হইতেই এই হালদার-বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকালে কর-সংগ্রাহকদিগকে সমাদ্দার, মজুমদার, পাকড়াশী প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইত, হালদার উপাধিও বোধ হয় ঐরূপে মুসলমান শাসনের সৃষ্টি। কেহ কেহ অনুমান করেন, "হাওলাদার" কথা হইতেই "হালদার"-পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

জনার্দ্দনের পুত্র রাধাবল্লভ নাকি পিরালী ব্রাহ্মণের এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সমাজে পতিত হন। রাধাবল্লভ অথবা তাঁহার দুই পুত্র হরিনারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ ২৪ পরগণা মূলাজোড়ের নিকট জগদ্দলে বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। হরিনারায়ণের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, রামপ্রসাদ ও নীলকমল। দুর্গাপ্রসাদ পঞ্জাবে ৪০ বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ সরকারে চাকুরী করেন, তাঁহার দুই পুত্র ছিল—জ্বালাপ্রসাদ ও রাধাকৃষ্ণ। দুর্গাপ্রসাদের ভ্রাতা রমাপ্রসাদের অসাধারণ শারীরিক শক্তি ছিল। তাঁহার পুত্রদের নাম বৃন্দাবনচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও অন্য একজন। রাধাবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের এক কন্যা ও ছয় পুত্র হয়।

ইন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র বেচারাম হালদার ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বেচারাম বহুদিন কমিশরিয়টে কার্য্য করিয়া অবশেষে জগদ্দলে প্রত্যাগমন করেন এবং সুন্দরবন পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে রত থাকায় হঠাৎ আহত হইয়া খঞ্জ হইয়া যান। সরকার হইতে তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা পেনসন প্রাপ্ত হইতেন। তিনি ৩৫ বৎসর কাল সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যদি তিনি অসাধু হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাইতে পারিতেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস হালদার তাঁহার পিতার সহিত বালেশ্বরে যান। তখন তিনি বালকমাত্র। তিনি প্রথমে বালেশ্বর স্কুলে ও তৎপরে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার চণ্ডীপুর গ্রামের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কেনারাম রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কিরণকুমারীর বিবাহ হয়। বিবাহকালে কিরণকুমারীর বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর ছিল। ঐ বৎসরে রাখালদাসের প্রথম বাঙ্গালা কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত "সাধু-রঞ্জন" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৮—৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয় ও সাধুরঞ্জন পত্রে লিখিতে থাকেন, তাহার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নিজেই "দূরবীক্ষণিক" নামক মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি না লইয়া উক্ত পত্র প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের নামে গ্রেপ্তারী পারোয়ানা বাহির হয়; তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইলিয়ট সাহেবের এজলাসে উপস্থিত হন, ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি দেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভবিষ্যতে আবার কোন বিপদে পড়েন, এই ভয়ে পত্রিকাখানি আর প্রকাশ করিবেন না বলিয়া স্থির করেন। রাখালদাসের বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে পড়েন। দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্দলে ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। বেচারাম উক্ত শাখার জন্য নিজ বাটীর একটি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহার তিন মাস পরে রাখালদাস যথারীতি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। তদবধি তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি উপবীত ত্যাগ করেন।

নিজের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা উঠিয়া যাইবার পর রাখালদাস বাঙ্গালা ভাষায় একখানি দার্শনিক পুস্তক লিখিতে প্রযত্ন করেন, কিন্তু তাঁহার পুস্তকখানির লেখা শেষ হয় নাই। "পূর্ণচন্দ্রোদয়" পত্রে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে Lamb's tales from Shakespere গ্রন্থের ছয়টি গল্পের অনুবাদ শেষ করেন। এই গ্রন্থ-স্বত্ব বিক্রয় করিয়া তিনি মাত্র ১৮৲টি টাকা প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তিকা লেখেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি খিদিরপুর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে বাসকালে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "শ্রীরামচরিত" প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা-সম্বলিত হইয়া উক্ত পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের "Precepts of Jesus" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাখালদাসবাবু "ব্রাহ্মসমাজের অবনতির কারণ" নির্দ্দেশ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহা ১৯১৪ সালের Indian Mirror পত্রের ২০শে সেপ্টেম্বর ও ১৬ই অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রাখালদাসের

বয়ঃক্রম যখন সবে মাত্র ২৪ বৎসর তখন তিনি গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, নানক, রামমোহন, শিবনারায়ণ, কবীর, দাদু, শঙ্করাচার্য্য ও মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের ধর্ম্মমতসমূহের অধ্যয়ন শেষ করেন। তাহা ছাড়া থিয়োডোর পার্কার, ফ্রানসিস্ নিউম্যান, রুসো, টমাস্ পেন, ভলটেয়ার, জেনিস, ডিক, ব্রাউন, হিউম প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার আত্মীয় কৈলাসনাথ চক্রবর্ত্তী ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহাকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে বলেন, কিন্তু রাখালদাস তদুত্তরে তাঁহাকে লেখেন যে, তাঁহার মনের গতি সাহিত্যের দিকে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে নহে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বিধবা শ্যালিকা মোক্ষদার সহিত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে আনন্দিত হইয়া রাখালদাসবাবুকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের শেষে নানা কারণে রাখালদাস ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহাকে কটকের স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্স্পেকটর নিযুক্ত করা হয়। কটকে গিয়া তিনি নূতন নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। কিন্তু সরকার ইহাতে আপত্তি করায় তিনি কেবল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহ বাড়াইতে থাকেন। অবশেষে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় রাখালদাসবাবু শিক্ষাবিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বন্ধু মিশনারী মিঃ ডালের সহিত ইংলণ্ডে যান। তাঁহার পিতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ বেচারাম ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হন এবং একমাত্র পুত্রের সহিত এইভাবে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছেদ হওয়ায় তিনি জীবন্মৃত হইয়া পড়েন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রাখালদাস লণ্ডনে উপস্থিত হন। লণ্ডনে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পরে অধ্যাপক মোক্ষমুলার তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। মোক্ষমুলার তাঁহাকে অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার

বেদের অনেক মন্ত্র পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর রাখালদাস ব্রিষ্টলে রামমোহন রায়ের সমাধি পরিদর্শন করেন। রাজার অন্তিমকালে যে মিস্ ইষ্টলিন রাজা রামমোহনের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, সেই মিস্ ইষ্টলিন রাজার মাথা হইতে যে চুল কাটিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা রাখালদাসকে উপহার দেন। অতঃপর তথা হইতে তিনি রাজা যে ষ্ট্যাপেলটন-কুঞ্জে মারা যান তথায় গমন করেন। ব্রিষ্টল হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবার পর তাঁহার সহিত মিঃ জেম্‌স্ মার্টিনো, প্রফেসর ডে মরগ্যান, মিঃ মাজ প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের পরিচয় হয়। আগষ্ট মাসে তিনি মিঃ ও মিসেস্ হগসন প্ল্যাটের সহিত আয়র্লণ্ডে যান। অতঃপর ডাবলিনের ন্যাশনাল এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি Education in Bengal and its results শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মিঃ জে টেলার তাঁহাকে এতদূর শ্রদ্ধা করিতেন যে, প্রায়ই তাঁহার বাটীতে তাঁহার আমন্ত্রণ হইত এবং তিনি তথায় বসিয়া অনেক বড় বড় অধ্যাপকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার সুযোগ পাইতেন। ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রিটিস জনসাধারণের নিকট যে আপীল করেন হালদারমহাশয় মিঃ নিউম্যানের সহিত একযোগে সেই আপীল যাহাতে ব্রিটিস সর্ব্বসাধারণের নিকট পৌছে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে এই চিঠিখানি লেখেন—I am happy you are co-operating with our worthy friend Mr. Newman in the matter of our appeal to the British public for the promotion of education in India and I hope you will devote yourself to it with adequate earnestness, as on its success India's real progress mainly depends. The diuff-

sion of education amongst the females and the masses of the people of our country will tend, it is needless to tell, to bring about not only an intellectual but a social and moral reformation."

রাখালদাস ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অনেক উপাসনা-মন্দিরে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি নিজের উপার্জ্জনে ইংলণ্ডে বাস করিতেন। সংবাদপত্রে লিখিয়া তিনি প্রতি কলমে এক গিনি, বক্তৃতা দিবার জন্য রেল ভাড়া ও তিন গিনি এবং কলেজে এক ঘণ্টা পড়াইয়া পাঁচ শিলিং পাইতেন। ইহাতেই কোন রূপে সেই বিলাসিতা ও ব্যয়বহুল দেশে কোন রূপে তাঁহার চলিয়া যাইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস বাবু ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি "উমিচাঁদ" এই ছদ্মনামে অনেক সময় সংবাদপত্রে লিখিতেন। দেশে ফিরিয়াই তিনি হিন্দু পেট্রিয়টে ট্রিলানির পার্লামেন্টে উপস্থাপিত বিলের সমর্থন করিয়া লেখেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি "সোমপ্রকাশে" নিয়মিতভাবে "উমিচাঁদ" এই ছদ্মনামে ইউরোপের বিষয়ে অনেক লেখা পাঠাইতেন।

স্বদেশে ফিরিয়া তিনি আর পৈতৃক বাটীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই চন্দননগরে তিনি একখানি বাড়ী ভাড়া লন। চণ্ডীপুর হইতে তাঁহার স্ত্রীকে আনিয়া তিনি তাঁহার সহিত চন্দননগরে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করিলে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সরকারী চাকুরার অনুসন্ধান করেন এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তিনি বর্দ্ধমানের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটি কালেক্টর হন। অতঃপর তথা হইতে মানভূমের জরিপ বিভাগের ডেপুটী কলেক্টর হইয়া যান। সেই সময়ে মানভূমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, রাখালদাস ক্ষিপ্রতার সহিত সেই দুর্ভিক্ষ দমন করেন। ১৮৬৭ সালে ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনারের নিকট

ডেপুটী কমিশনার যে রিপোর্টে দেন, তাহাতে লেখা হয়—"The result of Babu Rakhaldas Haldar's inquiries is most valuable and the efficient manner he has performed his duty has been of material assistance to me."

এইরূপ গুরুতর সরকারী কার্য্যের মধ্যেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রকৃত কার্য্য করিতে ভুলেন নাই। অতঃপর মানভূম হইতে তিনি রাঁচিতে সেণ্টেলমেণ্ট কার্য্যের স্পেশাল কমিশনার হইয়া যান। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে রাখালদাসবাবুকে গবর্ণমেণ্ট একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (A Certificate of Honour) প্রদান করেন। অতঃপর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ছোটনাগপুর ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ছুটী লইয়া রাখালদাসবাবু সমুদ্রপথে সিংহলে যান। তথায় অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তিনি অনেক বৌদ্ধমন্দির পরিদর্শন করেন।

রাজনীতিবিষয়ে রাখালদাসবাবু এই মত পোষণ করিতেন যে, ব্রিটিস রাজশক্তির নিকট ধন্না দিয়া কখনই ভারতে স্বরাজ মিলিবে না, আপন চেষ্টায় ভারতে স্বরাজ আনিতে হইবে। এদেশে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গে বিচার-বৈষম্য দর্শন করিয়া তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন —One Weedon kicks and kills a native and the jury lets him off. Such an event occurs not infrequently, and because a native's life is not worth a straw."

অতঃপর তিনি গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট যে একই ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত করেন। শিক্ষা-প্রচার ও জ্ঞানান্বেষণ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সরকারী-কার্য্য করিবার সময় তিনি

অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডভেটন কলেজের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের মধ্যে একজনকে একটি স্বুবর্ণ পদক পারিতোষিক দিয়া তাঁহার সার্ব্বজনীন প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে তিনি কুমারী কার্পেণ্টারকে বিশেষ সহায়তা করিতেন। মিস্ কার্পেণ্টার যে National Indian Association প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি তাহার আজীবন সদস্য হইয়াছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান-সভারও তিনি আজীবন সদস্য হইয়াছিলেন। ছোটনাগপুরে থাকা কালে তিনি অনেক প্রস্তর, শিলালিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি Asiatic Society of Bengal-পত্রে সে সমস্ত শিলালিপির পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চেনীরামের হিন্দী কবিতা-গ্রন্থ "নাগবংশাবলী" সম্পাদন করেন। কর্ণেল ডালটনকে তিনি "Descriptive Ethnology of Bengal" লিখিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি শিল্পের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। গ্রীক্ ও রোমান শিল্পই তাঁহার অধিকতর প্রীতিপ্রদ ছিল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের রাখালদাসবাবুর বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হয়, সেই সময় তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে বারাসতের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তথায় যাইবার পূর্ব্বে ২৩শে নবেম্বর তারিখে মস্তিষ্কঘটিত জ্বরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ৺শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত Reis and Rayat পত্রে তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। রাখালবাবুর জীবনীর উপকরণ আমরা তাঁহার স্বুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত স্বুকুমার হালদার বি-এ, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে পাইয়াছি।

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নদীয়া জেলার কাঁচকুলী গ্রাম-নিবাসী পণ্ডিত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রনাথ ১৮৫৫ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। (বংশ-পরিচয় ষষ্ঠ খণ্ড ২৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।)

হাওড়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সি, এম্, এস কলেজ হইতে এল-এ পাশ করেন। তৎপর ক্রমে বি-এল্ পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করেন। অল্প দিন তথায় ও তৎপর বর্দ্ধমানে ওকালতি করিবার পর রায় বাহাদুর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৮৭৯ সনের মার্চ্চ মাস হইতে দার্জ্জিলিঙে সরকার-পক্ষে উকীল (Government Pleader) নিযুক্ত হয়েন এবং তথায় যাইয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্রনাথ অল্প সময়েই বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি কুচবেহার, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অনেক রাজা-মহারাজাদের পক্ষেও উকিল ছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্তও তিনি সেই পদেই নিযুক্ত ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ কলিকাতা, ভবানীপুর, বকুলবাগানের স্বনামধন্য রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের তৃতীয়া-কন্যা কাশীশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথের ৫ পুত্র ও ২ কন্যা। পুত্র পাঁচটীই পিতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কন্যা দুইটীও সৎপাত্রে অর্পিত হইয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথ ওকালতি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তাহার অধিকাংশই পুত্রগণের শিক্ষা ও নানাপ্রকার সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া যান। মহেন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিঙে অনেক ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। পিতার মত তাঁহারও পরোপকার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি তাঁহার কর্ম্মস্থল দার্জ্জিলিঙে অনেক লোক-হিতকর কার্য্য করিয়া

গিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ সাধারণের সুবিধার্থ দার্জ্জিলিঙের বর্ত্তমান হিন্দু-শবদাহ স্থান (Hindu Burning Ground) প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৮৯৭ সনে তথায় তাঁহার উদ্যোগে Hindu Public Hallএর বাড়ী তৈয়ার করেন। ঐ বাড়ী ১৯০৬ সনে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইবার পর ১৯০৮ সনে পুনরায় ঐ বাড়ী তাঁহার অর্থসাহায্যে ও অন্যান্য লোকের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দার্জ্জিলিঙ হাঁসপাতালের গরম ও ঠাণ্ডা জলের কলও মহেন্দ্রনাথই ১৯০৮ সনে স্থাপন করেন। দার্জ্জিলিঙের Central Municipal Market তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। ইহা ব্যতীত ছোট বড় অনেক দাতব্য কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সকল প্রকার সৎকার্য্যেই মহেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন। বঙ্গের সকলের নিকটই মহেন্দ্রনাথ সুপরিচিত ছিলেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকমাত্রই দার্জ্জিলিঙ যাইলে মহেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন এবং মহেন্দ্রনাথও তাঁহাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। এমন কি, বঙ্গের তদানীন্তন লাট বাহাদুর স্যার এডওয়ার্ড বেকার, বরদার গুইকুয়ার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, কুচবিহারের মহারাণী মহেন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাইয়া পান-ভোজন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। যেসমস্ত গুণ থাকিলে লোকের শ্রদ্ধা-ভাজন হওয়া যায় সেইসকল গুণই মহেন্দ্রনাথে বিদ্যমান ছিল।

১৯১১ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে দার্জ্জিলিঙেই মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পত্নী কাশীশ্বরী দেবী ১৯১৯ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন।

মহেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র,—বলেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, শৈলেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র ও

(ক) বলেন্দ্র ১৮৭৯ সনের অক্টোবর মাসের শেষভাগে (৺কালী-পূজার দিনে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবপুর (হাওড়া)-নিবাসী

দ্বারিকানাথ রায় চৌধুরীর কন্যা সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। বলেন্দ্রনাথও আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া দার্জ্জিলিঙেই ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনিও পিতার নিকট থাকিয়া বেশ পসার করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে বলেন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া হৃদ্‌রোগে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। বলেন্দ্রনাথের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই।

১৮৮১ সনের ১২ই অক্টোবর ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সনে বেঙ্গল পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে ভূপেন্দ্রনাথ এখন কলিকাতা পুলিশ-বিভাগে ডেপুটী-কমিশনার হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য ও সাহসী কর্ম্মচারী পুলিশ বিভাগে অতি বিরল। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় ভূপেন্দ্রনাথ যেরূপ অসীম সাহসের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে “রায়-সাহেব” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথ ২৪পরগণার অন্তর্গত পাণিহাটীর জমীদার বিখ্যাত রায় চৌধুরী বংশের অর্দ্ধচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা ব্রজবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথের এক পুত্র ও দুই কন্যা। কন্যা দুইটীই সৎপাত্রে অর্পিত হইয়াছে। পুত্র মৃণীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে বি-এ পড়িতেছে।

শৈলেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া ইনি বিলাত গমন করেন এবং ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৯০৬ সালের ২৭শে জুলাই হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন ও দার্জ্জিলিঙে প্রাকৃটিস্ আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। বর্ত্তমানে শৈলেন্দ্রনাথ কলিকাতায় একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। তাঁহার একটী বিশেষ গুণ এই যে, নিজের আর্থিক ক্ষতি করিয়াও মক্কেলের মোকদ্দমা যাহাতে আপোষে নিষ্পত্তি হয় তাহারই চেষ্টা করেন। শৈলেন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে

কলিকাতা মিউজিয়ামের কিউরেটার (Curator) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পরিবালা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই কন্যা; জ্যেষ্ঠা বিবাহিতা, কনিষ্ঠার এখনও বিবাহ হয় নাই।

১৮৮৭ সালের ১৭ই এপ্রিল দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এফ-এ পাশ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। তৎপর হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার জন্য আমেরিকা গমন করেন এবং চিকাগো হেরিং কলেজ হইতে ১৯০৯ সালে এম-ডি উপাধি লাভ করিয়া ১৯০৯ সনে ডবলিনের রোটাণ্ডা হাঁসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ধাত্রীবিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং ১৯১১ সালের জুন মাস হইতে কলিকাতাতে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে দ্বিজেন্দ্রনাথ কলিকাতাতে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে বরিশাল জেলার অন্তর্গত লাখুটিয়ার বিখ্যাত জমীদার ৺ বিহারীলাল রায় মহাশয়ের পৌত্রী হিরণবালাকে বিবাহ করেন। হিরণবালা দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। অপরটীর এখনও বিবাহ হয় নাই। পুত্র যাদবেন্দ্র ও বিমলেন্দ্র ছোট, স্কুলে পড়িতেছে। তৎপর দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতীয় ডাক-বিভাগের অন্যতম উচ্চ কর্ম্মচারী রায় পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যা প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথের মাত্র একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

১৮৯২ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথও ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিঙে প্রাকটিস করেন। তৎপর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। এই অল্প দিনেই তিনি বেশ যশঃ লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ

স্বর্গীয়া কাশীশ্বরী দেবী।

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়া জিলার উলা গ্রাম-নিবাসী ৺ কুসুমকুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শেফালিকা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের কোন সন্তান হয় নাই।

মহেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান চারিটী পুত্রই পিতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। সকলেই বেশ উপার্জ্জনশীল ও নানা সদ্‌গুণে ভূষিত। পিতার ন্যায় তাঁহারাও পরোপকারে মুক্তহস্ত।

গত ১৯২৭ সনে মহেন্দ্রনাথের পুত্রগণ স্বর্গীয় পিতামাতার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অস্ত্রোপচার বিভাগে "মহেন্দ্রকাশীশ্বরী ওয়ার্ড" নামে একটী ওয়ার্ড করিয়া দিয়াছেন। এই ওয়ার্ডের একতলা বাড়ী ও ১২টী রোগীর ব্যবহারোপযোগী শয্যা আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি সমস্তই তাঁহারা দিয়াছেন।

মহেন্দ্রনাথের ৪টী পুত্রই এখন কলিকাতায় আছেন এবং অল্পদিন হইল বালিগঞ্জ (পার্ক সার্কাস) অঞ্চলে এক মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। ভগবান তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবি করিয়া তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুন।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

সমগ্র মোদক জাতির গৌরব, স্বদেশহিতৈষী, নীরব কর্ম্মী কার্ত্তিকচন্দ্র ইং ১৮৫৯ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর সূত্রগড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গণেশচন্দ্র দাস বর্দ্ধমান জেলার বাকৃতা গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া শান্তিপুর সূত্রগড় গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রায় ৬০০ বৎসর ইঁহারা সূত্রগড়ে বাস করিতেছেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতার নাম মাণিকচন্দ্র; মাতা কেদারেশ্বরী। মাণিকচন্দ্র স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে ভাগ্যদেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি যে সম্পদ ও বিত্ত অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা সামান্য নহে। যশোহর জেলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর গ্রামে তাঁহার কয়েকটী দেশী চিনির কারখানা ছিল। বাঙ্গালার বাজারে তখন জাভা বা বিদেশীয় অন্য কোন চিনির প্রচলন হয় নাই। মাণিকচন্দ্র তাঁহার এই স্বদেশী চিনির কারখানাগুলি হইতেই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের প্রথম সূত্র লাভ করিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতামাতার পরিণত বয়সের সন্তান। ধনী পিতা-মাতার গৃহের একমাত্র দুলাল হইয়াও কার্ত্তিকচন্দ্র বাল্য ও কৈশোর অসৎসঙ্গে অতিবাহিত করেন নাই। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। কার্ত্তিকচন্দ্র বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালাতেই বিদ্যারম্ভ করেন। পরে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই। পিতার বহুবিধ বৈষয়িক কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র আর অধ্যয়নের দিকে
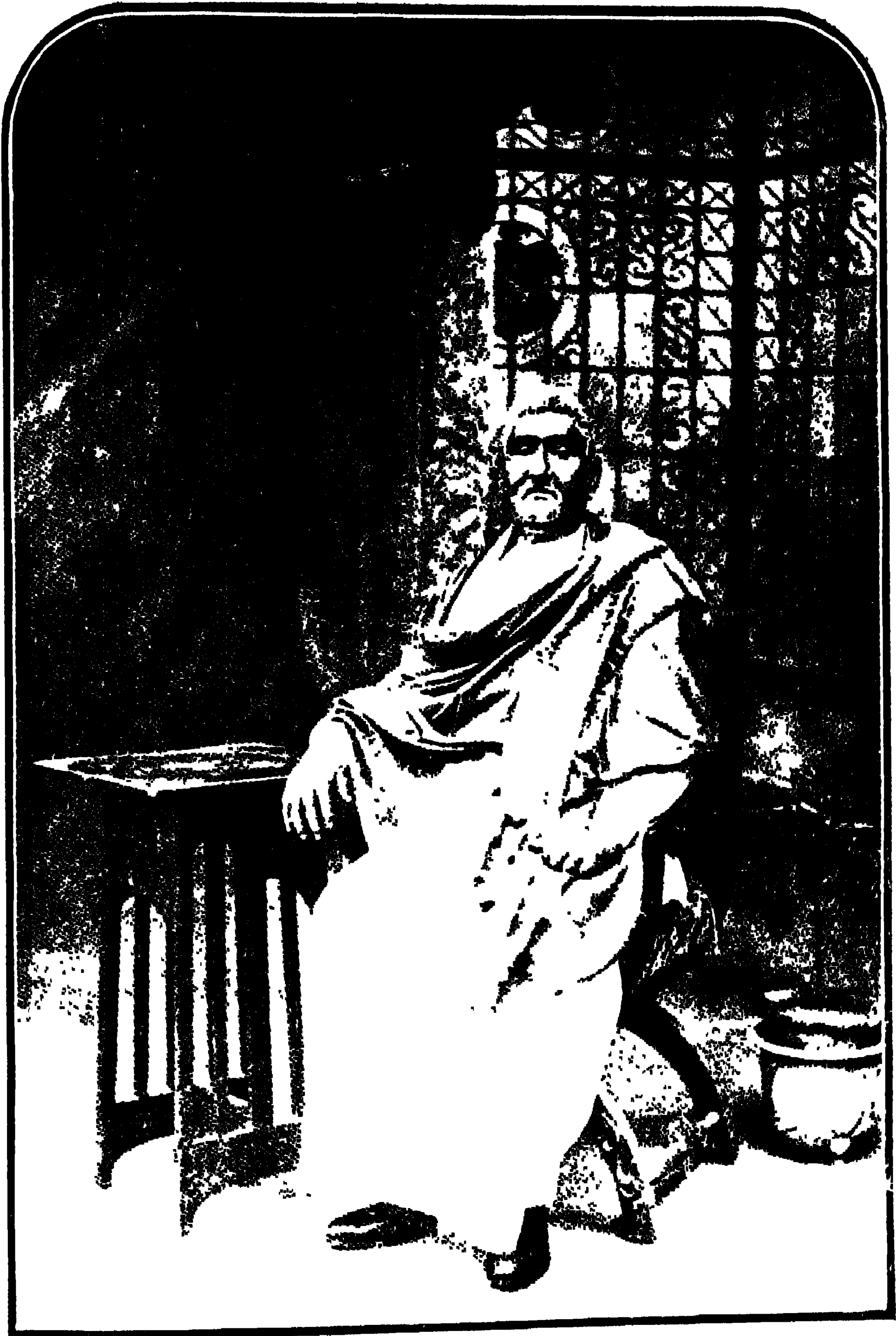
শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস

মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। বৈষয়িক ব্যাপারে কার্ত্তিকচন্দ্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পিতার অর্থসম্পদ তাঁহার তত্ত্বাবধানে উত্তরোত্তর যথেষ্টপরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে কার্ত্তিকচন্দ্র সমগ্র নদীয়া জেলার শ্রেষ্ঠ ধনবানদিগের অন্যতম। ১৩১৮ সালে তিনি কলিকাতা বড়বাজারে একটী চিনির কারবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার নাম সুপরিচিত। বাঙ্গালার অন্যান্য বিভিন্ন স্থানেও তাঁহার আরও কয়েকটী কারবার চলিতেছে। কার্ত্তিকচন্দ্র বিলাসী নহেন। ভদ্রজনোচিত সামান্য বসন-ভূষণেই তিনি পরিতৃপ্ত। তাঁহার সরল ও অমায়িক প্রকৃতি এবং বিনম্র স্বভাব পরিজন ও আত্মীয়বর্গের নিকট তাঁহাকে চিরপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ব্যবহার এতই সুন্দর যে, এ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মচারী বা সামান্য সেবকও তাঁহার নিকট হইতে রূঢ় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মচ্যুত হয় নাই। সমাজ ও স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যে কার্ত্তিকচন্দ্র চিরদিনই মুক্তহস্ত।

তিনি ১৮৮৭ সাল হইতে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর গভর্ণমেণ্ট মনোনীত কমিশনার। ১৮৮৬ সাল হইতে তিনি শান্তিপুর বেঞ্চে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপেও কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ১৯০৯ সালে কার্ত্তিকচন্দ্র "সূত্রগড় মহারাজ অব নদীয়াস্ হাই ইংলিস স্কুলের" সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ ১৯১০ সালে "মাণিকচন্দ্র দাস দাতব্য চিকিৎসালয়" নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটীর যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন। চিকিৎসালয়ের বাটী প্রস্তুতকল্পে তাঁহার অন্যূন ১৫০০০৲ ব্যয় হইয়াছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে উহার পরিচালন জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে কার্ত্তিকচন্দ্র ৩৩,০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং এই সৎকার্য্যের জন্য তাঁহার অন্যূন ৪৮,০০০৲ টাকা ব্যয়

হইয়াছে। গত বৎসর ম্যালেরিয়ার সময় এই ঔষধালয় হইতে দৈনিক ১৫০ রোগী বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। ১৯১৫ সালে প্রায় ৫০০০৲ ব্যয়ে "কার্ত্তিকচন্দ্র দাস লাইব্রেরী" নামে একটী সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই পুস্তকাগারটীরও সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিয়া থাকেন। সূত্রগড় গ্রামে সুন্দর জলাশয়ের অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে কার্ত্তিকচন্দ্র ১৯২৪ সালে ৪৫,৩৮০৲ ব্যয়ে তাঁহার স্বর্গীয় মাতৃদেবীর নামে একটী বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান আছে।

ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটী ও সূত্রগড় স্কুলে যথেষ্ট দান করিয়াছেন। পানীয় জলের জন্য রাস্তার পার্শ্বে কয়েকটী নলকূপ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। শান্তিপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী এবং মিউনিসিপালিটীকেও নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ১৯১১ সালের দিল্লী-দরবার উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট কার্ত্তিকচন্দ্রের সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত একখানি সম্মান-সূচক প্রশংসাপত্র দান করিয়াছেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সাধুভক্ত। জনৈক মৌনী সাধুর আদেশে তিনি ৺গণেশ জিউর একটী মন্দির নির্ম্মাণ ও ৺গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৺গণেশ জিউর নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি মাসের চতুর্থী তিথিতে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যার পর প্রত্যহ মন্দিরে খোল-করতাল-সহযোগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। উক্ত মৌনী সাধুর উদ্দেশে কার্ত্তিকচন্দ্র প্রতি বৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে গঙ্গাতীরে একটী মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন। তাঁহার বাটীতে দুর্গোৎসব, দোল, শ্যামাপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

মাণিকচন্দ্র দাস দাতব্য চিকিৎসালয়।

কার্ত্তিকচন্দ্র জাতিতে মোদক। মোদক সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাও প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা ও শান্তিপুর উভয় সমাজেরই সভাপতি। তাঁহার এবং অন্যান্য মহাত্মাগণের যত্নে কলিকাতা সমাজ হইতে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশিত হইতেছে এবং উক্ত পত্রিকার যাবতীয় ব্যয়ভারের অর্দ্ধাংশ তিনি বহন করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তির অভাব নাই। প্রথম স্ত্রীর কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় তাঁহার পিতার আদেশে কার্ত্তিকচন্দ্র পর পর তিনবার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের সন্তানগণের মধ্যে এক কন্যা ও দুই পুত্র জীবিত আছেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরকালী, ইনি এক্ষণে বৈষয়িক কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছেন এবং কনিষ্ঠ সাধুসিদ্ধেশ্বর এখনও স্কুলের ছাত্র।

কার্ত্তিকচন্দ্র কর্ম্মী পুরুষ। সৎকার্য্যের জন্য তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর কিন্তু তথাপি সামাজিক বা অন্য প্রকার সাধারণ-হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত তিনি যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন তাহা যুবকগণের পক্ষেও প্রশংসনীয়। তাঁহার প্রাণে এখনও আরও অনেক সদনুষ্ঠানের সঙ্কল্প আছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া তাঁহার সদুদ্দেশ্যসমূহের সিদ্ধির অবসর প্রদান করুন।

স্বর্গীয় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন

কলিকাতা কুমারটুলীর স্বনামখ্যাত কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নাম না জানেন, বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ও প্রাচীনাগণের মধ্যে এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন। এক সময়ে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের গৃহ বহুদূর-দেশাগত রোগিগণে প্রপূরিত হইত। গঙ্গাপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী উত্তরপাড় কোমরপুর গ্রামে। তথা হইতে তাঁহারা প্রথমে ঢাকা ও পরে কলিকাতা কুমারটুলীতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতার নাম ৺নীলাম্বর সেন।

নীলাম্বর সেন।

১২৪৭ সালে কবিরাজ নীলাম্বর সেন মহাশয় পুণ্যতোয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন এবং নিত্য গঙ্গাস্নানের সুবিধা হইবে ভাবিয়া কুমারটুলীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্ববঙ্গে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিভার সর্ব্বত্রই জয় হইয়া থাকে, সুতরাং তিনি প্রধানতঃ পূতসলিলা সুরধুনীর তীরে বাস করিতে অভিলাষী হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতা কলিকাতার মধ্যে আশুপ্রচারিত হয়। নীলাম্বর এরূপ ধন্বন্তরি-কল্প চিকিৎসক ছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে এইরূপ প্রবাদ বাক্য ছিল ;—

"নীলাম্বরের বড়ি
গণি মিঞার ঘড়ি।"

নীলাম্বর যে সময়ে কলিকাতায় আগমন করেন, সে সময়ে ইংরাজী

স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসন্ন সেন।

চিকিৎসার প্রতিই স্থানীয় লোকের সমধিক আগ্রহ ছিল। উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার অভাবে এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত যথাবিহিত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতীকৃত ঔষধের অভাবে লোকে তৎকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি একেবারে বীতরাগ ছিল। এমন কি স্মরণাতীত কাল হইতে সেই মহামনা মহর্ষিগণের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যে কোন রোগ আরোগ্য হইতে পারে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যে আমাদিগের পক্ষে উপকারী, ইহাও বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইতেন না। এইরূপ সময়েই কবিরাজ নীলাম্বর সেন মহাশয় কলিকাতায় পদার্পণ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিভার জয় সর্ব্বত্র, সুতরাং তিনি অচিরেই নগর, উপনগর এবং সুদূর মফঃস্বলবাসীদিগের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আদর পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও তাঁহার দ্বারা প্রস্তুতীকৃত অকৃত্রিম ঔষধসমূহ অচিরেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলিকাতায় আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা-প্রণালীর অভ্যুদয়ের সূত্রপাত তাঁহা দ্বারাই হয়।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন।

এই নীলাম্বরেরই নিকট তদীয় পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, ঘৃত, তৈল প্রস্তুতকরণ-প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া ১২৪৯ সালে স্বয়ং চিকিৎসারম্ভ করেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, বহুদর্শিতা, বিচক্ষণতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সমুজ্জ্বল-প্রতিভা অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে কেবল কলিকাতা ও উপনগরে নহে, কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চিকিৎসকশ্রেণীর কিরূপ অগ্রণী করিয়াছিল, তাহা দেশের আপামর-সাধারণের অবিদিত নাই। কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও অনেকে তাঁহার ঔষধ সেবন করিত। সুতরাং সে বিষয়ের কোন প্রকার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ১২৪৯ সাল

হইতে ১৩০২ সাল পর্য্যন্ত কুমারটুলী ভবনে কৃতিত্বের সহিত কবিরাজী করিবার পর গঙ্গাপ্রসাদ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

ভগবতীপ্রসন্ন সেন।

গঙ্গাপ্রসাদের তিন পুত্র। তন্মধ্যে ৺ভগবতীপ্রসন্ন সেন সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি দমদমা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর ছিলেন। ৫১ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

হরিপ্রসন্ন সেন।

মধ্যম হরিপ্রসন্নও প্রতিভাসম্পন্ন কবিরাজ ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর ছিলেন। মাত্র ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

হরিপ্রসন্নের পুত্র বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেন কুমারটুলী ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কলিকাতার বহু সভা-সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। লোকপ্রিয় চিকিৎসক এবং দাতা বলিয়াও তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ইনি ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে ভিষগ্রত্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৺বিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন ৪৪ বৎসর বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসন্ন সেন কবিরাজ এবং ডাক্তার উভয়ই। ইনি ডাক্তারী পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া বৃত্তি ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি একজন সুসাহিত্যিক।

গঙ্গাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন সেন সরস্বতী মহাশয়ও সুচিকিৎসক ও সুপণ্ডিত।

গঙ্গাপ্রসাদের দৌহিত্র কবিরাজ রাজমোহন সেন বাঁকীপুরে থাকেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "বৈদ্যরত্ন" উপাধি দিয়া যোগ্যতার সমাদর করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন।

গঙ্গাপ্রসাদের নিজ ভাগিনেয় মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই গঙ্গাপ্রসাদের সংসারে প্রতিপালিত এবং তাঁহারই নিকট আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

গঙ্গাপ্রসাদের মধ্যম ভ্রাতা ৺দুর্গাপ্রসাদ সেন। প্রায় ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। ইঁহার পুত্র ৺নিশিকান্ত সেন। নিশিকান্ত বাগভট্ট, সুশ্রুত, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। নিশিকান্তও অতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিশিকান্তের পুত্র শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন। কালীভূষণ আয়ুর্ব্বেদ-সভার সম্পাদক।

গঙ্গাপ্রসাদের অন্যতম ভ্রাতা ৺অন্নদাপ্রসাদ সেন। ইনিও বহুবিধ সংস্কৃতশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ভগবতীপ্রসন্ন সেন, হরিপ্রসন্ন সেন, নিশিকান্ত ও বিজয়রত্ন সেন—ইঁহারা সকলেই "আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী" পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে ইহাই প্রথম মাসিক পত্র। এই পত্র বঙ্গদর্শনের সমসাময়িক। এই পত্রে যেরূপ সারগর্ভ প্রবন্ধনিচয় প্রকাশিত হইত, আধুনিক কালের কোন আয়ুর্ব্বেদীয় পত্রে সেরূপ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না।

নীলাম্বরের ভ্রাতা রামলোচন সেন। তাঁহার "রাজা" উপাধি ছিল।

গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ভগবতীপ্রসন্ন সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন। ইনি লোকপ্রিয়, মিষ্টভাষী, সদালাপী, সহৃদয় ও সুপুরুষ।

শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

ইনি একাধারে সুবক্তা, সুলেখক ও সুকবি সাহিত্য-জগতে ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি সাহিত্য-সভার সহযোগী সম্পাদক, পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ও উহার মুখপত্র সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদক ছিলেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদ-সভার সহঃ সভাপতি ও পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বহু সভাসমিতির সম্পাদক, সভাপতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য। ইনি বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত ও

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত। এতদ্ব্যতীত ইনি প্রাচীন ইতিহাস বিশেষরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইনি নিষ্ঠাবান্, আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু। অপিচ ইনি তেজস্বী, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তর্কশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অধিকার। অনেক মাসিক পত্রে—ইঁহার অনেক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইনিই এখন গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ও অধ্যাপনায় ইনি পিতা ও পিতামহের শূন্য স্থান পরিপূরণ করিয়াছেন। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রসাল প্রবন্ধাদি লেখায় ইনি সিদ্ধহস্ত। দুঃস্থ, দরিদ্র ও নিঃস্ব রোগীদিগকে ইনি বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দান করিয়া থাকেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় শাস্ত্রেরই ইঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি নানা সভাসমিতি ও প্রতিষ্ঠান হইতে বহু উপাধি লাভ করিয়াছেন।

নিম্নে ইঁহাদের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল—

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই শাহবণিক শঙ্খনিধি

ঢাকার জমিদার, ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌর-নিতাই শাহবণিক শঙ্খনিধি ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা ও বদান্যতা প্রভৃতি গুণে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে থাকিতেন। পরে আসিয়া ঢাকায় বাস করিতে থাকেন। জাতিতে ইঁহারা বৈশ্য গন্ধবণিক, ইঁহারা আগরওয়ালা বণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত, পদ্ম-পুরাণোক্ত শাহ সদাগরের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ঢাকার শঙ্খনিধি বংশ বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী, রায় সাহেব ও তাঁহার স্বর্গীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের বদান্যতার কথা পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাদবাক্যস্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। সহর ও মফঃস্বলে এমন কোন জনহিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান নাই, যাহাতে ইঁহারা সাহায্য করেন নাই কিংবা করেন না। ঢাকা জেলার উয়ারীতে শ্রীশ্রী৺রাধাবিনোদদেবের মন্দিরের মত জাঁকজমক-শালী, চিত্তবিনোদন, দেব-মন্দির আর সমগ্র বঙ্গদেশে নাই। এই মন্দির শঙ্খনিধি পরিবারের অতুল কীর্ত্তি। দার্জ্জিলিংয়ে শঙ্খনিধি হাসপাতাল, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে শঙ্খনিধি ওয়ার্ড, ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনের বিপরীত দিকে ভিক্টোরিয়া ধর্ম্মশালা, শঙ্খনিধি বংশের বদান্যতার গুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই শাহ বণিক শঙ্খনিধি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন ঢাকা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় গঙ্গারাম শাহ বণিক প্রথমে একজন ধনী ব্যবসায়ীর অধীন শূন্য

অংশীদার ছিলেন, পরে তিনি মুর্শিদাবাদে নিজ নামে একটী বেণেতী দোকান খুলেন। রায় সাহেবের মাতা গঙ্গাস্নানে যান এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গর্ভবতী হয়েন, ঐ গর্ভেই রায় সাহেবের জন্ম হয়। তাঁহারা তিন ভাই ছিলেন। (১) ভজহরি, (২) লালমোহন (৩) গৌরনিতাই তন্মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। ভজহরি ও লালমোহনের কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় তাঁহারা স্বজাতীয় দুইটী বালককে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে গৌরনিতাইবাবুর শ্রীগৌরগোপাল শাহ শঙ্খনিধি নামে একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। গৌরগোপালের বয়স বর্ত্তমানে ১৬ বৎসর মাত্র। সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। এই বৎসর সে ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থী। এই বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী বালকই এখন শঙ্খনিধি পরিবারের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা-স্থল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, শ্রীমান্ গৌরগোপাল যেন দীর্ঘজীবন ও উন্নতিলাভ করিয়া শঙ্খনিধি পরিবারের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবান্বিত নাম চিরস্থায়ী করিতে পারে। সামান্য বেণেতী ব্যবসা হইতে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিন ভাই এখন ঢাকা নগরীতে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের মাতৃশ্রাদ্ধের সময় কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানা দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে একটি করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য শঙ্খ প্রণামী দেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সেই সময় ইঁহাদিগকে "শঙ্খনিধি" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি বংশানুক্রমে এই উপাধি ইঁহাদের পরিবারে চলিয়া আসিতেছে। অন্য দুই ভ্রাতার পরলোকগমন হইলে রায় সাহেব গৌরনিতাই শাহ বণিক নিজ পক্ষে এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের ষ্টেটের একজিকিউটার-স্বরূপ সমস্ত এজমালী এষ্টেট ও প্রসিদ্ধ মেসার্স এল্ এম্ সাহা এণ্ড কোংর একাদশ বৎসর কাল পরিচালনার-ভার গ্রহণ করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের এষ্টেট ও ফার্ম্মের একজিকিউটর-স্বরূপ বিশেষ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই শাহ শঙ্খনিধি।

কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিবার পর তিনি উক্ত পদ ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বজ্বরগজসিংহ, সর্ব্বদদ্রুহুতাশন ও কণ্ডুদাবানল প্রভৃতি পেটেণ্ট ঔষধের আবিষ্কার-কর্ত্তা স্বর্গীয় লালমোহন সাহা শঙ্খনিধি মহা-শয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় সাহেব গৌরনিতাই শাহবণিক শঙ্খনিধির ব্যবসায়-বুদ্ধি অতি প্রখর এবং তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তিও অতীব আশ্চর্য্য ওঅনন্য-সাধারণ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বাবুর বাজারে তিনি "গৌরনিতাই আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের একটি মস্ত অভাব দূরীভূত করিয়াছেন। এই ঔষধালয়ে অতি সুলভ মূল্যে অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। "ঔষধ খাঁটী ও অকৃত্রিম না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে", একথা গৌরনিতাইবাবুই সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞাপনের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার "গৌরকান্তি সালসা", "গৌরকান্তি মোদক", "কৃমিকুলান্তক বটিকা" "শ্বাসারি বটিকা" প্রভৃতি দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত অতি উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ। রায় সাহেবের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধালয়ের চ্যবনপ্রাশ সের ২॥০ টাকা, স্বর্ণসিন্দূর ৩৲ টাকা তোলা, মকরধ্বজ ৪৲ টাকা তোলা হিসাবে বিক্রয় হয়।

বাজারে এই সমস্ত ঔষধ অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইলেও তাঁহার ঔষধালয়ের এই সমস্ত ঔষধ কোন অংশে কম উপকারী নহে। তাঁহার ঔষধালয়ের চ্যবনপ্রাশ কাশীর আমলকী হইতে প্রস্তুত। মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর তাঁহার ঔষধালয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত হয়। ঢাকা বাবুর বাজারে তাঁহার একটি হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানও আছে। তিনি আমেরিকা, জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের বিশ্বস্ত দোকানসমূহ হইতে সরাসরি হোমিওপ্যাথিক ঔষধসমূহ আনয়ন করেন।

যতদূর সম্ভব সস্তাদরে বিক্রীত হওয়ায় দরিদ্রসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকার হইতেছে।

শঙ্খনিধি বংশের দান সর্ব্বত্র বিদিত। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ইঁহারা সকল দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সহরে এমন কোন স্কুল,ক্লাব ও সভাসমিতি নাই যাহাতে তিনি সদস্য নহেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই তিনি আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন। গৌরনিতাই-বাবুকে যেমন দেশীয় লোকে তেমনি ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরাও বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ঢাকা নগরীর তিনি একজন বিশিষ্ট গণ্য-মান্য অধিবাসী। ঢাকা-মিটফোর্ড হাসপাতালে ও হিন্দু অনাথ আশ্রমের তিনি একজন আজীবন গভর্ণর, সাহিত্য পরিষদের সদস্য, হিন্দু-মুসলমান সেবাশ্রম ও ফ্রি বোর্ডিং ইনষ্টিটিউসনের সহযোগী সভাপতি, স্থানীয় পাগলা-গারদের পরিদর্শক এবং দায়রা আদালতের এসেসর। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে, সলিমুল্লা অনাথাশ্রমে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের তিনি অন্যতম সদস্য। স্থানীয় মূক ও বধির বিদ্যালয়ে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের সদস্য প্রজা, জমিদার সমিতি নর্থব্রুক হল ও জনসন্ হল ক্লাবের তিনি সদস্য। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় সৈন্য-সরবরাহ-কল্পে অর্থদান করিয়াছিলেন, ডাফরিণ ফণ্ডে ও ঢাকা ইডেন ও মালীটোলা বালিকা-বিদ্যালয়ে তিনি যথেষ্ট টাকা দান করিয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গ বন্যার সময় তিনি বন্যা-পীড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। স্থানীয় মেডিকেল স্কুলে তিনি রোণাল্ডসে স্বর্ণ পদক দান করিয়াছেন। এইরূপ নানা প্রকার জন হিতকর কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ব্যাজ, সার্টিফিকেট ও পদক পুরস্কার দিয়াছেন। ১৯২০ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড তাঁহাকে “রায় সাহেব” উপাধি প্রদান করেন। কিছুদিন হইল, তিনি

শ্রীমান গৌরগোপাল শাহ শঙ্খনিধি

"গৌরনিতাই ডাইরেক্টারী পঞ্জিকা"প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ দিনপঞ্জী ছাড়া ঢাকা নগরীর সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রের একটি অধ্যাপক-পদ-সৃষ্টি-কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ষষ্ঠ কন্যার বিবাহে তিনি ঢাকার নানা প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ও সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ২০৮ হরিশ মুখোপাধ্যায় রোড, কলিকাতা হইতে লিখিতেছেন—

আপনার প্রণীত বংশ-পরিচয় কয়েক খণ্ড দেখিয়াছি, দেশের বিখ্যাত লোকের এবং প্রাচীন বংশের পারিবারিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া আপনি জাতীয় ইতিহাসের কতক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। পুস্তকখানি সুপাঠ্য এবং সাধারণের অজ্ঞাত অনেক কথা ইহাতে আছে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২১শে জুলাই, ১৯২৭।